

তাবি'ঈদের জীবনকথা

চতুর্থ খণ্ড



ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

তারিখদের জীবনকথা

[চতুর্থ খণ্ড]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : dhakabic@gmail.com



গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৭

অগ্রহায়ণ ১৪৩২

ডিসেম্বর ২০২৫

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত আশি টাকা মাত্র।

Tabieeder Jiban Katha (Vol. IV) : Umar Ibn Abdil Aziz

Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by Dr. Md. Samiul Haque Faruqi, Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205, Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 34/1 Northbruk Hall Road, Bangla Bazar, Dhaka-1100, 1st Edition September 2014, 2nd Edition December 2025, Price Taka 380.00 only.

সূচীপত্র

১. আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ (রহ) ॥ ৭
২. আবু রাজা' আল-'আতারুদী (রহ) ॥ ১০
৩. যিররু ইবন হুবাযশ (রহ) ॥ ১২
৪. কা'ব ইবন সূর (রহ) ॥ ১৫
৫. দাউদ ইবন আবী হিন্দ দীনার (রহ) ॥ ১৭
৬. আবুয যিনাদ (রহ) ॥ ২০
৭. 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (রহ) ॥ ২৩
৮. 'আলী ইবন 'আবদিব্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ॥ ২৮
৯. আল-'আ'মাশ [সুলায়মান ইবন মিহরান] (রহ) ॥ ৩২
১০. রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) ॥ ৩৮
১১. 'আবদুর রহমান ইবন গান্ম (রহ) ॥ ৪৪
১২. 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিব্লাহ (রহ) ॥ ৪৭
১৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ (রহ) ॥ ৫২
১৪. আবু 'আবদির রহমান আস-সুলামী (রহ) ॥ ৫৪
১৫. 'আবদুর রহমান ইবন আল আসওয়াদ (রহ) ॥ ৫৭
১৬. আল হাকাম ইবন 'উতায়বা আল কিন্দী (রহ) ॥ ৫৯
১৭. যায়দ ইবন আসলাম (রহ) ॥ ৬২
১৮. 'আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ (রহ) ॥ ৬৫
১৯. ছাবিত ইবন আসলাম আল-বুনানী (রহ) ॥ ৬৮
২০. হারিম ইবন হায়্যান আল 'আবদী (রহ) ॥ ৭২
২১. নারি' মাওলা 'আবদিব্লাহ ইবন 'উমার (রা) ॥ ৮২
২২. মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান (রহ) ॥ ৮৮
২৩. নারি' ইবন জুবাযর (রহ) ॥ ৯১
২৪. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল কুরাজী (রহ) ॥ ৯৬
২৫. মানসূর ইবন যায়ান আল-ওয়াসিতী (রহ) ॥ ১০০
২৬. সুলায়মান ইবন তুরখান আত্ তায়মী (রহ) ॥ ১০৪
২৭. সাফওয়ান ইবন সুলাইম আয-যুহরী (রহ) ॥ ১১০

২৮. 'আমর ইবন মুররা আল মুরাদী (রহ) ॥ ১১৭
২৯. সাফওয়ান ইবন মুহরিয আল-মায়িনী (রহ) ॥ ১২০
৩০. 'আমর ইবন শুরাহবীল আল-হামদানী (রহ) ॥ ১২৪
৩১. বাকর ইবন 'আবদিব্লাহ আল-মুযানী (রহ) ॥ ১২৭
৩২. বুসর ইবন সাঈদ আল মাদানী (রহ) ॥ ১৩০
৩৩. 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) ॥ ১৩৪
৩৪. আন-নাজাশী (রহ) ॥ ১৪৬
৩৫. সিল্লা ইবন আশইয়াম আল-'আদাবী (রহ) ॥ ১৭৫
৩৬. আবু হানীফা আন-নু'মান ইবন ছাবিত (রহ) ॥ ১৮২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ :

আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীনের অশেষ রহমতে “তাবি’ঈদের জীবনকথা” ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমি “রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষাদান পদ্ধতি” শীর্ষক আরেকটি বই লেখার কাজে জড়িয়ে পড়ি। বইটি ২০১১ সনে প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে আমি শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দৌড়াতে শুরু করি এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। মূলত: এসব কারণে বইটি লেখার কাজ শেষ করতে দেরী হয়ে যায়।

২০১৩ সালের মাঝামাঝি বইটির লেখার কাজ শেষ করে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের তৎকালীন পরিচালক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদের নিকট জমা দেই। ছাপানোর প্রস্তুতি চলছিলো এরই মধ্যে তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যান। একাধারে প্রায় একত্রিশ বছর আমি তাঁর সাহচর্য পেয়েছি। মূলত: আমার গবেষণা ও লেখালেখির পেছনে তাঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমরা তাঁর জন্য দু’আ করবো, আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

বইটির এ খণ্ডে অতি প্রসিদ্ধ মোট ছত্রিশজন মহান তাবি’ঈর সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থান পেয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুব সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় ও অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যে তথ্যগুলো আমি উপস্থাপন করেছি তা সবই অতি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আশাকরি পাঠক-পাঠিকাগণ, বিশেষ করে হাদীছ শাস্ত্রের ছাত্র-শিক্ষকগণ বইটি দ্বারা উপকৃত হবেন।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এর ভুল-ত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর করেন। আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জি মত কাজ করার তাওফীক দান করুন!

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ (রহ)

আবু ইসহাক ডাকনাম এবং আসল নাম 'আমর। ডাকনামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। মূলত: তাঁরা হামদানের অধিবাসী ছিলেন।' হামদানে তাঁদের একটা বিখ্যাত ও অভিজাত খান্দান ছিলো। ইসলামী যুগে এ খান্দান কূফায় এসে বসতি স্থাপন করে। হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে আবু ইসহাকের দাদা 'উবাইদ মদীনায়ে আসেন। খলীফা হযরত 'উছমান (রা) তাঁদের খান্দানী আভিজাত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর জন্য পনের হাজার পাঁচশ' এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একশ' করে ভাতা নির্ধারণ করেন।^১ আস-সাবী' নামক স্থানে আবাসন গড়ে তোলার কারণে "আস-সাবী'ঈ" বলা হয়।^২

আবু ইসহাক সম্ভবত: হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের শেষভাগে মাত্র দুই বছর বাকী থাকতে জনম্রহণ করেন।^৩ উমাইয়া যুগেও তাঁর খান্দানী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে তিনি ও তাঁর পিতা তিনশ' করে ভাতা লাভ করতেন।^৪

জ্ঞান ও মনীষা

তৎকালীন জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র কূফায় আবু ইসহাক বেড়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্বভাবগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা ছিলো। একারণে কূফার আলিমগণের নিকট থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করেন এবং শ্রেষ্ঠ আলিমগণের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, মহত্ব ও প্রশংসার উপর সকলে একমত।^৫ ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক।^৬ ইবন নাসির উদ্দীন তাঁকে ইসলামের ইমাম ও হাদীছের বড় হাফিযগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।^৭

কুরআন

তিনি আল কুরআনের একজন বিখ্যাত কারী ছিলেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) ছাত্র ও সংগী-সাথীগণ তাঁর নামের শেষে "আল কারী" যোগ করে বলতেন, "আমর

-
১. তাহযীব আল-কামাল- ১৪/২৬৫
 ২. আত-তাবাকাত- ৬/২১৯
 ৩. তাহযীব আল-কামাল- ১৪/২৬৫
 ৪. প্রাগুক্ত
 ৫. তাযকিরাতুল হুফাজ- ১/১১৪
 ৬. তাহযীব আল- আসমা' ওয়াল লুগাত- ১/১৭২
 ৭. তাযকিরাতুল হুফাজ- ১/১১৪
 ৮. শাযারাত আয- যাহাব- ১/১৭৪

আল-কারী”। এ বিষয়ের শিক্ষা এই শাস্ত্রের বিখ্যাত ‘আলিম আবু ‘আবদির রহমান সুলামী ও আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের (রহ) নিকট থেকে গ্রহণ করেন।^৯

হাদীছ

তিনি হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিযগণের মধ্যে ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ‘আলিমদের একজন ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।^{১০} তিনি সাহাবীদের মধ্যে হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার, ‘আবদুল্লাহ ইবন যুবার, মু‘আবিয়া, ‘আমর ইবন ইয়াযীদ আল খুতামী, নু‘মান ইবন বাশীর, ‘আমর ইবন আল হারিছ, ‘আমর ইবন আল হুরায়িছ, যাদ ইবন আল-আরকাম, বারা’ ইবন আল-‘আযিব, সুলায়মান ইবন সুরাদ, হারিছা ইবন ওয়াহাব, ‘আদী ইবন হাতিম, জাবির ইবন সামুরা, রাফী’ ইবন খাদীজ, ‘উরওয়া আল-বারিকী, আবু হুজায়ফা, খালিদ ইবন ‘আরফাতা, জারীর ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-বাজালী, আশ‘আছ ইবন কায়স, মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা) এবং বিশাল সংখ্যক তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।

ইবনুল মাদীনী তাঁর শায়খদের (হাদীছের শিক্ষক) সংখ্যা তিনশ’, মতান্তরে চারশ’ উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আটত্রিশজন ছিলেন সাহাবী।^{১১} ইমাম আশ-শা‘বী তাঁর থেকে দু’বছরের বড় ছিলেন।^{১২}

আবু হাতিম বর্ণনার আধিক্য এবং ‘ইলমুর রিজাল তথা হাদীছের বর্ণনাকারীদের জীবন-ইতিহাস বিষয়ে গভীর জ্ঞানে তাঁকে ইমাম যুহরীর (রহ) সমপর্যায়ের মনে করতেন।^{১৩} তায়ালিসী বলেন, আমরা চার ব্যক্তির নিকট হাদীছের ভাণ্ডার পেয়েছি। সেই চারজনের একজন হলেন আবু ইসহাক। হযরত ‘আলীর (রা) হাদীছ এবং হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদের (রা) বর্ণনাসমূহ তাঁর নিকট বেশি ছিলো। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দু’হাজার (২০০০) বলা হয়ে থাকে।^{১৪}

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর শায়খদের মতো ছাত্রদের গণ্ডিও অনেক বিস্তৃত ছিলো। ছাত্রদের তালিকায় অনেক বড় বড় তাবি'ঈ ও তাবি'তাবি'ঈর নাম দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো :

সুলায়মান আত-তায়মী, আ‘মাশ, কাতাদা, ইসমা‘ঈল ইবন আবী খালিদ, গুরাইক ইবন

৯. তাহযীব আত- তাহযীব - ৮/৫৯

১০. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৫

১১. তাহযীব আল- আসমা’- ১/১৭২; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৫

১২. তাহযীব আল- কামাল- ১৪/২৭০

১৩. তাহযীব আত তাহযীব- ৮/ ৬৫

১৪. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৫

‘আবদিল্লাহ, ‘আম্মারা ইবন যুরায়ক, মানসূর ইবন মু‘তামির, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, মিস‘আর, মালিক ইবন মাগূল, সুফইয়ান ইবন ‘উয়ায়না, যুবায়র ইবন মু‘আবিয়া, যায়িদা, হাসান ইবন সালিহ, আবু বকর ইবন ‘আব্বাস (রহ) ও আরো অনেকে।’^৫

ইবাদাত

তাঁর বিশাল জ্ঞানের সাথে ‘আমলও ছিলো সমপর্যায়ের। একজন উচুমানের তাপস ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) লিখেছেন, **كَانَ صَوَامًا قَوَامًا** তিনি ছিলেন, ‘অধিক পরিমাণে সিয়াম সাধনাকারী, রাতের বেলা সালাত আদায়কারী এবং পার্থিব বিষয়ে নির্লিপ্ত ব্যক্তি।’ তিনি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন।^৬ শেষ জীবনে যখন দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কষ্টকর ইবাদত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে তখন তাঁর কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু তখনো মাসে তিনদিন, প্রত্যেক জুমআবারে, সোমবারে এবং হারাম মাসসমূহে নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। এক রাক‘আতে সূরা বাকারা শেষ করতেন।^৭

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর প্রতি দারুণ উৎসাহ ছিলো। জানা যায় যে, তিনি হযরত মু‘আবিয়ার (রা) সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালিত হয় তাতে যোগদান করেন।^৮

হিজরী ১২৭, মতান্তরে ১২৮ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। আবু বাকর ইবন আবী শায়বা বলেন, তিনি ৯৬ বছর জীবন লাভ করেন।^৯

১৫. তাহযীব আল- আসমা’- ১/১৭১; তাহযীব আল- কামাল- ১৪/২৬৮

১৬. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৫

১৭. প্রাপ্তক; তাহযীব আত তাহযীব- ৮/ ৫৯

১৮. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৫

১৯. প্রাপ্তক; তাহযীব আল- কামাল- ১৪/২৭০

আবু রাজা' আল-আতারুদী (রহ)

হযরত আবু রাজা' এবং তাঁর পিতার নামের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনামতে আবু রাজা'র আসল নাম 'ইমরান এবং পিতার নাম মিলহান। আরেকটি বর্ণনামতে পিতার নাম তায়ম এবং তৃতীয় বর্ণনামতে তাঁর নাম 'আতার এবং পিতার নাম 'আবদুল্লাহ।' অধিকাংশ সীরাতে বিশেষজ্ঞের মতে প্রথম বর্ণনাটি সঠিক। ইমাম যাহাবী (রহ) ও ইবন হাজার আল- 'আসকিলানী (রহ) এটাকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আবু রাজা' তাঁর ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।^১ তিনি আরবের বিখ্যাত "তায়ম" গোত্রের লোক।

তিনি ছিলেন একজন "মুখাদরাম" অর্থাৎ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত মানুষ।^২ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগ তিনি লাভ করেন। তবে তখন তিনি একজন তরুণ। নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবের পর তাঁর গোত্র দীর্ঘদিন পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াতে থাকে এবং অবশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে। এ ঘটনাকে আবু রাজা' বর্ণনা করেছেন এভাবে : রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আমরা আমাদের বর্ণার পাশে উটের রাখালী করছিলাম। এসময় আমরা খবর পেলাম আরবে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যারা তাঁর আনুগত্য করেনা তাদেরকে তিনি হত্যা করেন। একথা শুনে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন সংগে নিয়ে বানু সা'দার প্রান্তর পাড়ি দিয়ে পালিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম এ ব্যক্তির হাত থেকে বাঁচার উপায় হলো মুখে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"- এই কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি এধরনের স্বীকৃতি দেয় তার জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। এ তথ্য জেনে আমরা ফিরে আসি এবং ইসলাম গ্রহণ করি।^৩ মূলত: এ ধরনের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। তখন ছিলো মক্কা বিজয়ের সময়। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :^৪ "أُسْلِمَ زَمَنَ الْفَتْحِ"- "তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।" আবু রাজা' রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর দীদার ও লিকা' অর্থাৎ দর্শন ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যান।^৫

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত আবু রাজা'র সময়ে বহু সাহাবী জীবিত ছিলেন। একারণে জ্ঞানগত উৎকর্ষ লাভের পূর্ণ

১. তাহযীব আত-তাহযীব- ৮/১২৪; তাহযীব আল-কামাল- ১৪/৪০০
২. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৬৬
৩. প্রাপ্ত
৪. আত-তাবাকাত- ৭/১০১-১০২
৫. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৬৬
৬. তাহযীব আল-কামাল- ১৪/৪০০; তাবি'ঈন- ৫৩০

সুযোগ লাভ করেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :^৭

من كبار علماء التابعين... كان ثقة عالماً عاملاً.

তিনি শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈদের একজন। ... তিনি একজন বিশ্বস্ত, দৃঢ়, মহান আলিম ও 'আমলকারী ব্যক্তি।

তিনি কুরআনের একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। এ জ্ঞান অর্জন করেন হযরত আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) ও মুফাসসিরুল কুরআন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। তাঁদের শিক্ষা তাঁকে একজন বড় 'আলিমে পরিণত করে।^৮

হাদীছ

তিনি হযরত 'উমার, 'আলী, 'ইমরান ইবন হুসায়ন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, সামুরা ইবন জুনদুব ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকার (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

আইউব আস-সিখতিয়ানী, জারীর ইবন হাযিম, 'আওফ আল-আ'রাবী, ইমরান আল- কাসীর, মাহদী ইবন মায়মুন, আবুল আশহাব, হাম্মাদ ইবন নাজীহ, সা'ঈদ ইবন আবী রাবী'আ, আবু 'উছমান, হাসান ইবন যাকওয়ান, আবু 'আমর ইবন আল-'আলা' আন-নাহবী (রহ) ও আরো অনেকে।^৯

ইবাদাত বন্দেগী

দুনিয়া বিরাগী মন-মানস এবং ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। ইবনুল আ'রাবী বলেন :^{১০}

كان شجاعاً عابداً كثير الصلاة و التلاوة.

তিনি ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি, 'আবিদ, প্রচুর সালাত আদায়কারী।

রমযানে তারাবীহর মধ্যে তিনবার কুরআন খতম করতেন।^{১১} 'ইলম ও দীনদারীতে পূর্ণতার কারণে নিজ গোত্রের ইমাম ছিলেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন।^{১২}

ওফাত

তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। এছাড়া হিজরী ১০৫, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি ১২০ বছর জীবন লাভ করেন।^{১৩}

৭. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৬৬

৮. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত- ৭/১০১

৯. তাহযীব আত-তাহযীব- ৮/১৪০; তাহযীব আল-কামাল- ১৪/৪০১

১০. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৬৬

১১. প্রাগুক্ত

১২. তাহযীব আল-কামাল- ১৪/৪০১

১৩. প্রাগুক্ত; তাহযীব আত-তাহযীব- ৮/১৪০; তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৬৬

যিররু ইবন হুয়ায়শ (রহ)

হযরত যিররু'র ডাকনাম আবু মারযাম, মতান্তরে আবু মুতাররিফ। পিতা হুয়ায়শ ইবন হুবাশা ইবন আওস ইবন বিলাল। বানু আসাদ গোত্রের সন্তান। তিনি একজন 'মুখাদরাম' অর্থাৎ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। এ কারণে উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাহচর্য লাভের সুযোগ পান এবং তাঁদের কল্যাণ ও অনুগ্রহে তিনি একজন অতি মর্যাদাবান তাবি'ঈর আসন লাভ করেন। কূফার অধিবাসী ছিলেন।^১ ইমাম নাওবী লিখেছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।^২ ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।^৩

আল কুরআন

তিনি আল কুরআনের বিশিষ্ট কারী এবং 'আলিম ছিলেন। হাফিজ ইবন 'আবদিল বার লিখেছেনঃ^৪

كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً.

তিনি আল কুরআনের একজন 'আলিম ও বিশিষ্ট কারী ছিলেন।

তিনি আল কুরআনের দারসও দিতেন। 'আসিম ইবন বাহদালা তাঁর হালকায়ে দারসের অনুগ্রহভোগী ব্যক্তি ছিলেন।^৫ প্রখ্যাত সাহাবী উবায় ইবন কা'ব ও 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফের (রা) সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। মদীনায়ে গেলে তাঁদের সাথেই ওঠা-বসা করতেন।^৬

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন,

كان ثقة كثير الحديث.

তিনি ছিকা তথা বিশ্বাসযোগ্য ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী ছিলেন।^৭

-
১. তাহযীব আল-কামাল- ৬/২৯৪
 ২. তাহযীব আল- আসমা'- ১/১৯৭
 ৩. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৫৭
 ৪. আল- ইসতী'আব- ১/২১২
 ৫. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/৫৭
 ৬. তাহযীব আল-কামাল- ৬/২৯৫
 ৭. আত- তাবাকাত- ৬/৭১

তিনি কৃষ্ণবাসী তাবি'ঈদের প্রথম তাবকায় (স্তরে) তাঁকে সন্নিবেশ করেছেন।^৮ ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের হাফিজদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত 'উমার, 'উছমান, 'আলী, আবু যার, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ, 'আব্বাস ইবন মুত্তালিব, সা'ঈদ ইবন যায়দ, হুযায়ফা ইবন আল ইয়ামান, উবায় ইবন কা'ব, আম্মার ইবন ইয়াসির, আবুযার আল-গিফারী, 'আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) প্রমুখের মতো শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।^৯

ইবরাহীম নাখা'ঈ, 'আসিম ইবন বাহদালা, মিনহাল ইবন 'আমর, 'ঈসা ইবন 'আসিম, 'আদী ইবন ছাবিত, ইমাম শা'বী, যুবায়দ- আল- ইয়ামানী, আবু ইসহাক আশ-শায়বানী (রহ) প্রমুখ ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র।^{১০} দীনী 'ইলম ছাড়াও তিনি আরবী সাহিত্যেরও একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) মতো মহান ব্যক্তিও এ বিষয়ে তাঁর মনীষার ফায়দা গ্রহণ করতেন।^{১১}

মতবিরোধ সত্ত্বেও কর্মের ক্ষেত্রে ঐকমত্য

যে সকল ব্যক্তি সামান্য মতপার্থক্যের কারণে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, শুধু তাই নয় বরং সংঘাত-সংঘর্ষেও লিপ্ত হন তাদের জন্য যির ইবন হুযায়শের (রহ) জীবনধারা আদর্শ হতে পারে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত না হলে মতপার্থক্যের কারণে সামান্য গালমন্দ তো দূরের কথা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়তো না এবং পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধের ব্যাপারে সামান্য পার্থক্যও পরিলক্ষিত হতো না।

যির ছিলেন হযরত 'আলী (রা) পত্নী এবং আরেকজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ আবু ওয়ায়িল ছিলেন হযরত 'উছমান (রা) পত্নী। অথচ দু'জন একসাথে উঠা-বসা করতেন। তাঁরা তাঁদের ভিন্নমত নিয়ে আলোচনা করতেন না। দু'জন একই মসজিদে নামায আদায় করতেন। আবু ওয়ায়িল যিরকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন।^{১২}

তবে কারো কোন আচরণে যদি দীনী কর্মকাণ্ডে বা প্রতীকের প্রতি সামান্যতম তুচ্ছভাব প্রকাশ পেত তবে তার এই উপেক্ষা ও আপোষ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতো। তাঁর ধৈর্য-সহনশীলতা ক্রোধ ও উত্তেজনায় পরিণত হতো। একবার যির আযান দিচ্ছেন। পাশ দিয়ে একজন আনসারী ব্যক্তি যাচ্ছিলো। সে বললো : আবু মারযাম! আমি তোমাকে এর চেয়েও

৮. তাহযীব আল- কামাল- ৬/২৯৫

৯. প্রাপ্ত- ৬/২৯৪; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫৭

১০. তাহযীব আত-তাহযীব- ৩/৩২১

১১. তাহযীব আল- কামাল- ৬/২৯৫; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫৭

১২. আত তাবাকাত- ৬/৭১

বড় কাজের লোক বলে মনে করতাম। আযান সম্পর্কে এমন অমাননামূলক উক্তি শুনে তিনি দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তাকে বলেন, আমি যতদিন জীবিত থাকব তোমার সাথে একটি কথাও বলবো না।^{১৩}

হযরত যির (রহ) দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শেষ জীবনে হাত-পা কাঁপতো। মৃত্যু সন ও বয়স নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হিজরী ৮১, ৮২ অথবা ৮৩ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো- ১২০ মতান্তরে ১২২ বছর।^{১৪}

১৩. তাহযীব আত-তাহযীব- ৩/৩২২; তাহযীব আল- কামাল- ৬/২৭৯

১৪. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত- ৬/৭১

কা'ব ইবন সূর (রহ)

হযরত কা'ব ইবন সূর (রহ) তেমন খ্যাতিমান লোক ছিলেন না। রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাঁর বিষয়ে তেমন কিছু বিবরণ লেখেন নি। তাঁর থেকে কোন হাদীছও বর্ণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি একজন উঁচু স্তরের তাবি'ঈ ছিলেন। হযরত 'উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) সঙ্গী ছিলেন, তাঁর সাথে উঠা-বসা করেছেন। প্রখর মেধাবী ও সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এ কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

তাঁর এই নিয়োগের ঘটনা ইতিহাসে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : একদিন তিনি খলীফা 'উমারের (রা) নিকট বসে আছেন। এমন সময় একজন মহিলা খলীফার সামনে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি আপনার নিকট দুনিয়ার একজন উত্তম ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। 'আমলে কোন ব্যক্তি তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে না এবং তাঁর মতো ভালো 'আমলও কেউ করতে পারবে না। সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করে এবং সারা বছর সাওম পালন করে। এতটুকু বলার পর তাকে লজ্জায় পেয়ে বসে এবং সে শুধু একথাটি ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনা যে, "আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে মাফ করুন।" আমীরুল মু'মিনীন বলেন, আল্লাহ তোমাকে ভালো প্রতিদান দিন। তোমার প্রশংসাটি বড় চমৎকার। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর মহিলাটি চলে যায়।

এবার কা'ব হযরত 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই মহিলাটি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলংকৃত ভাষায় তাঁর অভিযোগ উপস্থাপন করেছে। তিনি বলেন, কেমন এবং কিসের অভিযোগ? কা'ব বলেন, তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। সে রাত-দিন ইবাদাতে মশগুল থাকে এবং তার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করে না। এ কথা শুনে তিনি মহিলাকে ডেকে আনেন এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য কা'বকে নির্দেশ দেন। বিনয়ের সাথে কা'ব বলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার উপস্থিতিতে আমি মীমাংসা করবো। 'উমার (রা) বললেন, যে বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো, অথচ আমি বুঝতে পারিনি তার মীমাংসা তোমাকেই করা উচিত। অতপর কা'ব কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে দুই,

তিন এবং চারজনকে তোমরা বিয়ে করো। (সূরা আন-নিসা : ৩)

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, কুরআন চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তার অর্থ এই যে, প্রতি চারটি রাতের মধ্যে একটি রাতের অধিকার লাভ করবে প্রত্যেক স্ত্রী। যার একজন মাত্র স্ত্রী থাকবে সেও কমপক্ষে একটি রাতের অধিকার ভোগ করবে। অতপর তিনি এই মহিলার স্বামীকে সাওম পালন করার, একদিন স্ত্রীর জন্য সাওম পালন না করার এবং তিনরাত ইবাদাতে কাটানোর এবং একরাত স্ত্রীর নিকট থাকার নির্দেশ দেন।

হযরত 'উমার (রা) তাঁর এমন ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেখে দারুণ মুগ্ধ হন।

তিনি মন্তব্য করেন : পূর্বে তোমার মেধার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তার চেয়ে তোমার এই ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমার কাছে বেশি বিস্ময়কর মনে হয়েছে। অতঃপর তখনই তাঁকে বসরার কাজী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন।^১

গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দূরে অবস্থান

তিনি বসরায় যাওয়ার পর হযরত 'উমার (রা) ও হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে অতি চমৎকারভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। হযরত 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর হযরত 'আলী (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) মধ্যে মতবিরোধ ও বিবাদ দেখা দিল। এক পর্যায়ে হযরত 'আয়িশা (রা) হযরত 'আলীকে (রা) প্রতিহত করার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে হযরত 'তালহা (রা) ও হযরত যুযায়রকে (রা) সংগে নিয়ে বসরায় উপস্থিত হলেন। কা'ব এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে থাকার জন্য একটি ঘরে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। ঘরের সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন। কেবল পানাহারের সামগ্রী গ্রহণের জন্য একটি ছিদ্র রাখেন। লোকেরা হযরত 'আয়িশাকে (রা) বুঝালো, যদি কা'ব আপনার পক্ষ অবলম্বন করেন তাহলে সমগ্র আয়দ গোত্র আপনার পক্ষে এসে যাবে। এ কথা শুনে তিনি কা'বের বাড়িতে গেলেন এবং বাইরে থেকে চেষ্টা করে তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, কা'ব! আমি কি তোমার মা নই এবং তোমার উপর কি আমার কোন অধিকার নেই? এ কথা শোনার পর কা'বের জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে কথা বললেন। 'আয়িশা (রা) বললেন, আমি চাই তুমি মানুষকে বুঝিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করো। এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা কা'বের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি কুরআন হাতে নিয়ে মানুষকে বুঝানোর জন্য বের হলেন। যখন 'আয়িশা (রা) ও 'আলী (রা) উভয়ের বাহিনী মুখোমুখি হলো তখনো তিনি তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুরআন খুলে উভয় পক্ষকে বুঝাতেন এবং তাঁদেরকে কুরআনের দিকে আহ্বান জানাতেন।

শাহাদাত

বিষয়টি তখন বুঝাবুঝির সীমার মধ্যে ছিলো না। অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছিলো। এ কারণে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তিনি দু'দলের মাঝখানে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ অবস্থায় কোন এক হতভাগার তীর তাঁকে শহীদ করে দেয়।^২

তাঁর জীবনের বেশি কিছু জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি একজন সংকর্মশীল মানুষ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন : তিনি সং ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।^৩

১. আত-তাবাকাত- ৭/১৬৫; তারি'ঈন- ৩৯৩-৩৯৪

২. প্রাগুক্ত- ৭/৬৫-৬৬

৩. প্রাগুক্ত- ৭/৬৬

দাউদ ইবন আবী হিন্দ দীনার (রহ)

হযরত দাউদের (রহ) ডাকনাম ছিলো আবু বাকর, মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা আবু হিন্দ দীনার ছিলেন কুশা'য়র গোত্রের এক মহিলার দাস। জন্মভূমি খোরাসানের 'সারাখ্‌স'; কিন্তু বসরায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন।^১

জ্ঞান ও মনীষা

দাউদ ছিলেন একজন সূচীকর্মজীবী মানুষ।^২ কিন্তু এ পেশা তাঁর জ্ঞান অর্জন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি সূচীকর্মের পাশাপাশি কুরআন, হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়ে এতো পারদর্শিতা লাভ করেন যে, ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হাফিজ ও মুফতী বলে উল্লেখ করেছেন।^৩

কুরআন শিক্ষা

কুরআনের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। আর এর পশ্চাতে একটি ঘটনা ছিলো যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি “তাউন” (প্লেগ) রোগে আক্রান্ত হলাম। অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলাম, আমার নিকট দু'জন লোক এলো। তাদের একজন আমার জিহ্বার মূল এবং অন্যজন পায়ের গোঁড়ালীতে চাপ দিয়ে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলো : কি জিনিস বুঝা যায়? অন্যজন জবাব দিলো : তাসবীহ, তাকবীর এবং কিছু মসজিদের দিকে চলা এবং সামান্য কুরআন তিলাওয়াত। আমি সে সময় কুরআন শিক্ষা করিনি। রোগ মুক্তির পর প্রাণ-পণ চেষ্টা করে কুরআন শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হলাম এবং তা অর্জন করলাম।^৪

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন :^৫

كان ثقة كثير الحديث

তিনি ছিলেন বিশ্বাসভাজন, বহু হাদীছের ধারক ও বাহক।

ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হাফিজ ও বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।^৬ তিনি আবুল

১. তাহযীব আল- কামাল- ৬/৫৩
২. তাহযীব আত- তাহযীব- ৩/২০৪
৩. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৪৬
৪. আত-তাবাকাত- ৭/২০
৫. প্রাগুক্ত
৬. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৪৬

‘আলিয়া, সা’ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবু ‘উছমান নাহদী, শা’বী, ‘ইকরিমা, ‘আযরা ইবন ‘আবদির রহমান, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, আবুয যুবায়র, মাকহুল আশ-শামী, আল হাসান আল-বাসরী, বিশ্ব ইবন নুমায়র, ‘আতা’ আল-খুরাসানী, আবু কিলাবা আল-জুরমী আল-বাসরী (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। শু’বা, ছাওরী, মাসলামা ইবন ‘আলকামা, ইবন জুরায়জ, হাম্মাদ, উহাইব ইবন খালিদ, ‘আবদিল ওয়ায়িছ ইবন সা’ঈদ, ‘আবদুল আ’লা ইবন আল-আ’লা, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইয়াযীদ ইবন যুরাই’, ইয়াযীদ ইবন হারুন, ইয়াহইয়া ইবন সা’ঈদ আল আনসারী, আবু মু’আবিয়া আদ-দারীর, আবু শিহাব আল হান্নাত (রহ) প্রমুখ তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় দুইশত।^৭ তাঁর বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে কয়েকজন হাদীছ বিশারদের মন্তব্য ও মতামত এখানে উপস্থাপন করা হলো :

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলতেন, তিনি বিশ্বস্ত ও দৃঢ়পদ। একবার জনৈক ব্যক্তি দাউদের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, দাউদের মতো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে? ইবন হিব্বান বলেন, তিনি বর্ণনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। আল ‘ইজলী বলেন, তিনি বিশ্বস্ত, চমৎকার দীনদার ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।^৮

হাদীছের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণনাসমূহ সংকলিত হয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার বড় প্রমাণ এই যে, তিনি বসরার মতো একটি জ্ঞান-চর্চা কেন্দ্রের মুফতী ছিলেন।^৯ আবু হাতিম ও আন-নাসা’ঈ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।^{১০}

যুক্তিবাদী মানুষ

জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মন-মস্তিষ্ক ছিলো অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। এমন শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করতেন যে, বড় বড় প্রতিপক্ষকেও মাত্র দু’টি বাক্যে চূপ করিয়ে দিতেন। একবার শামে গেলেন। সেখানে কাদরিয়া মতবাদের প্রবক্তা গায়লান আদ-দিমাশকীর দেখা পেলেন। তিনি দাউদকে বললেন, আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জানতে চাই।

তিনি বললেন, একটি কেন পঞ্চাশটি বিষয়ে জানতে পারেন। তবে আমাকে মাত্র দু’টি প্রশ্ন করার অনুমতি দিন।

গায়লান বললেন, ঠিক আছে করুন।

তিনি প্রশ্ন করলেন : আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে ভালো কোন জিনিসটি দিয়েছেন?

গায়লান বললেন : ‘আকল বা বুদ্ধি।

৭. তাহযীব আত- তাহযীব- ৩/২০৪; তাহযীব আল- কামাল- ৬/৫৩, ৫৪

৮. তাহযীব আত- তাহযীব- ৩/২০৪;

৯. তায়কিরাতুল হুফযাজ- ১/১৪৬

১০. তাহযীব আল- কামাল- ৬/৫৫

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, এই 'আকল কি এমন কোন ঐচ্ছিক বিষয় ছিলো যে, যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে না অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে বণ্টিত হয়?

গায়লান গভীর মনোযোগ সহকারে এই ক'টি বাক্য শুনে নীরবে উঠে চলে যান। কোন জবাব তিনি দিতে পারেন নি। তখন দাউদ বললেন, 'আকলের মতোই আল্লাহ ঈমান, দীন-ধর্মসহ প্রত্যেকটি জিনিস বণ্টন করেছেন। আল্লাহর শক্তিই হলো মূল।'^{১১}

হযরত দাউদ (রহ) ইলম (জ্ঞান) এর সাথে 'আমলেও (কর্ম) ঋদ্ধ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি 'ইলম ও 'আমলে চূড়া স্বরূপ ছিলেন।'^{১২} ইবন হাজার (রহ) বলেন, তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন।'^{১৩} পথ চলার সময়ও আল্লাহর যিকর থেকে বিরত হতেন না। একাধারে চল্লিশ বছর রোযা রাখেন কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি। সকালে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে দোকানে চলে যেতেন, কিন্তু পথে তা অন্যকে দিয়ে দিতেন এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই ইফতার করতেন।'^{১৪} হিজরী ১৪০ সনে হজ্জ থেকে ফেরার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৭৫ বছর।'^{১৫}

১১. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৪৭; তাবি'ঈন- ১০৫-১০৬

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহযীব আত- তাহযীব- ৩/২০৪;

১৪. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৪৭

১৫. প্রাগুক্ত; তাহযীব আল-কামাল- ৬/৫৫

আবুয যিনাদ (রহ)

‘আবুয যিনাদ’ হযরত ‘আবদুল্লাহর কুনিয়াত বা ডাকনাম। আর তিনি এই ডাকনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর আরেকটি ডাকনাম আবু ‘আবদির রহমান। পিতার নাম যাকওয়ান।’ আবুয যিনাদ কুরায়শদের দাসত্বে ছিলেন। কিন্তু কার দাস ছিলেন সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। অনেকে বলেছেন, হযরত ‘উছমানের (রা) স্ত্রী রামলা বিনত শায়বা ইবন রাবী‘আর দাস ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি হযরত ‘উছমানের (রা) সন্তানদের দাস। আবু ‘উবায়দ আল-আজিরী বলেছেন, আবুয যিনাদের পিতা যাকওয়ান ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা ‘উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) ঘাতক আবু লু‘লু-এর ভাই।’^১

জ্ঞান ও মনীষা

দাস হলেও আবুয যিনাদ জ্ঞানের জগতের মুকুটধারী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের পরে যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ জ্ঞানের উচ্চাসনে আসীন হন তাঁদের মধ্যে আবুয যিনাদ নামটিও আছে। ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিলো। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানর প্রাচুর্য, মুখস্ত শক্তি, মহত্ব, বিভিন্ন জ্ঞানে তাঁর দক্ষতা, বিশ্বস্ততা এবং সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।^২

হাদীছ

তিনি বহু সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন : হযরত আনাস ইবন মালিক, আয়িশা বিন্ত সা'দ, আবু ইমাম ইবন সাহল ইবন হুন্সায়ন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবু সালামা ইবন ‘আবদির রহমান, আবান ইবন ‘উছমান, খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত, ‘উবায়দ ইবন হুসায়ন, ‘উরওয়া ইবন যুবায়র, ‘আলী ইবন হুসায়ন, ‘আমর ইবন ‘উছমান, ‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আবদিলাহ ইবন ‘উতবা, মুহাম্মাদ ইবন হামযা আসলামী (রা) ও আরো অনেকে।^৩

উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবর্গের অগাধ জ্ঞান তাঁকে হাদীছের একজন অত্যাচ্চ সম্মানের অধিকারী হাফিজে পরিণত করে। হাদীছের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) তাঁকে أمير

১. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৩৪

২. তাহযীব আল-কামাল- ১০/১১৮

৩. তাহযীব আল আসমা'- ১/২৩৩

৪. তাহযীব আত তাহযীব- ৫/২০৩; তাহযীব আল কামাল- ১০/১১৮

المؤمنين في الحديث 'হাদীছের জগতের আমিরুল মু'মিনীন' বলেছেন।^৫ ইবন সা'দ তাঁকে বিশ্বস্ত, সুদৃঢ় ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন।^৬

ছাত্রবৃত্ত

তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান ও আল-কাসিম, সালিহ ইবন কায়সান ইবন আবী মুলায়কা, আ'মাশ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আজলান, হিশাম ইবন 'উরওয়া, শু'আয়ব ইবন আবী হামযা, ইবন ইসহাক, মূসা ইবন 'উকবা, সা'ঈদ ইবন আবী বিলাল, যায়িদা ইবন কুদামা, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, আল-লায়ছ (রহ) প্রমুখ তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তাঁরা আবুয যিনাদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।^৭

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ স্থান ছিলো। মদীনার ফকীহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। এ শাস্ত্রে তাঁকে মদীনার বিখ্যাত ফকীহ তাবি'ঈ রাবী'আতুর রায়-এর সমকক্ষ মনে করা হতো। ইমাম আবু হানীফা তাঁকে রাবী'আর উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলেন,

رأيت ربيعة و أبا الزناد و أبو الزناد أفقه الرجلين.

আমি রাবী'আ ও আবুয যিনাদ উভয়কে দেখেছি। দু'জনের মধ্যে আবুয যিনাদ ফিক্‌হ বিষয়ে বেশি দক্ষ।^৮

তবে রাবী'আর মুসনাদ হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবুয যিনাদের দারসের আসর খালি হয়ে যায় এবং তাঁর ছাত্ররা রাবী'আর কাছে ভীড় করে। একথা আল-লায়ছ ইবন সা'দ বলেছেন।^৯

বহুমুখী জ্ঞান ও দারসের আসরের প্রশস্ততা

আবুয যিনাদের বহুমুখী জ্ঞানের কারণে তাঁর দারসের আসরটিও অত্যন্ত প্রশস্ত ছিলো। বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রের অসংখ্য শিক্ষার্থীর ভীড় সেখানে সব সময় থাকতো। 'আবদি রাব্বিহি ইবন সা'ঈদ বলেন, আমি আবুয যিনাদকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এমনভাবে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে দেখেছি, যেমন রাজা-বাদশাহরা জনগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। এই ভীড়ের মধ্যে ফারাসেদ, অংক, কবিতা, হাদীছ এবং অন্যান্য জটিল বিষয়সমূহের শিক্ষার্থীরা থাকতো।

৫. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩৫; তাহযীব আল কামাল- ১০/১১৯

৬. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩৫

৭. প্রাগুক্ত; তাহযীব আত তাহযীব- ৫/২০৩, ২০৪

৮. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩৫; তাহযীব আল কামাল- ১০/১২০

৯. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩৫

আল-লায়ছ ইবন সা'দ বলেন,^{১০}

رأيت خلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه و طالب شعر و صنوف

আমি আবুয যিনাদের পিছনে একই সময় ফিক্হ, কবিতা ও বিভিন্ন বিষয়ের তিনশো শিক্ষার্থী দেখেছি।

দীনী ইল্ম ছাড়াও ভাষা, সাহিত্য, রচনা, অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন :^{১১}

كان فصيحاً بصيراً بالعربية

তিনি ছিলেন বিগুহ ও প্রঞ্জলভাষী এবং আরবী ভাষা বিষয়ে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ।

অংক শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিলো। আর এ কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতরের অডিটের দায়িত্ব কখনো কখনো তাঁর উপর অর্পিত হতো। একবার এরই ধারাবাহিকতায় শামে হিশামের নিকট যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে কুফার বায়তুলমাল এর দায়িত্ব প্রদান করেন।^{১২}

এই জ্ঞানের সাথে সাথে বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞানও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিলো।^{১৩} হিজরী ১৩০ মতান্তরে ১৩১ সনের রমাদান মাসে আকস্মিকভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৬৬ বছর জীবন লাভ করেন।^{১৪}

মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আল জুমাহী বলেছেন, একবার আবুয যিনাদকে বলা হলো : আপনি দিরহাম ভালোবাসেন কেন? দিরহামতো মানুষকে দুনিয়ার নিকটবর্তী করে দেয়।

জবাবে তিনি বললেন,

إنها و إن أدتني منها فقد صانتني عنها

দিরহাম আমাকে দুনিয়ার নিকটবর্তী করলেও তা আমাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়।^{১৫}

১০. তাহযীব আল আসমা'- ১/২৩৩; প্রাণ্ড

১১. প্রাণ্ড; তাহযীব আল কামাল'- ১০/১২১

১২. প্রাণ্ড

১৩. তাহযীব আল আসমা'- ১/২৩৪

১৪. তাহযীব আল কামাল'- ১০/১২১; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৩৫

১৫. তাহযীব আল কামাল'- ১০/১২১

‘আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (রহ)

হযরত ‘আবদুর রহমানের ডাকনাম আবু ‘ঈসা। পিতার নাম ইয়াসার, যিনি আবু লায়লা ডাকনামে প্রসিদ্ধ। তিনি মদীনার বিখ্যাত আওস গোত্রের ‘আমর ইবন ‘আওফ শাখার সন্তান। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে অনেক স্থানে এই ‘আবদুর রহমানকে কেবল ইবন আবী লায়লা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হযরত ‘উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) খিলাফাতের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।^১

জ্ঞানের দিক দিয়ে আবী লায়লা একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর মহান পিতা আবু লায়লা ছিলেন একজন সাহাবী এবং বিভিন্ন অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। কূফা শহর পত্তনের পর সেখানে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন। সিফফিন যুদ্ধে হযরত ‘আলীর (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন।^২

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে ‘আবদুর রহমান উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন একটা সময় লাভ করেন যখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) বিশাল একটি সংখ্যা জীবিত ছিলেন। তিনি একশ’ বিশজন মহান সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। ‘আতা ইবন আস-সায়িব বলেন : ‘আবদুর রহমান বলতেন,^৩

أدركت عشرين و مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كلهم من
الأَنْصار

আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২০ জন সাহাবীকে পেয়েছি, তাদের সকলে আনসার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

তাঁদের অনেকের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।^৪ কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

কুরআন

কুরআনের কিরাআত শাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিলো। তাঁর নিকট সব সময় কারীদের ভীড় লেগে থাকতো। মুজাহিদ বলেন, ‘আবদুর রহমানের একটি বিশেষ ঘরে

১. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৬০
২. প্রাগুক্ত ১/৩০৪
৩. আত তাবাকাত- ৬/৭২
৪. তাহযীব আল আসমা'- ১/৩০৪

অনেকগুলো মাসহাফ অর্থাৎ কুরআনের কপি রাখা ছিলো। সেখানে সব সময় কারীদের সমাবেশ থাকতো। কেবল খাবার সময় তাঁরা সেখান থেকে উঠতেন।^৫

হাদীছ

তিনি ছিলেন হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজদের অন্যতম। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।^৬পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বহু সাহাবীর (রা) সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়েছেন। তবে যাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শুনছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো :

পিতা আবু লায়লা, 'উমার, 'আলী, সা'দ, হুযায়ফা, মু'আয ইবন জাবাল, মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবু যার আল-গিফারী, উবায় ইবন কা'ব, বিলাল ইবন রিবাহ, সাহ্ল ইবন হনায়ফ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবদুর রহমান ইবন আবী বাকর, কায়স ইবন সা'দ, আবু আইউব আল আনসারী, কা'ব ইবন আজরা, 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, আবু মুসা আল-আশ'আরী, আনাস ইবন মালিক, বারা' ইবন 'আযিব, যায়দ ইবন আল-আরকাম, সামুরা ইবন জুনদুব, সুহাইব, 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা, 'আবদুল্লাহ ইবন হাকাম, উসাইদ ইবন হুদায়র (রা) ও আরো অনেকে। তবে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কারো কারো নিকট থেকে তাঁর হাদীছ শোনার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।^৭

দারসের আসর

হাদীছে তাঁর জ্ঞান এতো ব্যাপক এবং এতো স্বীকৃত ছিলো যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) পর্যন্ত তাঁর দারসের আসরে বসে তাঁর বর্ণিত হাদীছ শুনতেন। 'আবদুল মালিক ইবন 'উমায়র বলেন, আমি 'আবদুর রহমানের দারসের আসরে একাধিক সাহাবীকে (রা) দেখেছি, তাঁদের একজন হলেন, বারা' ইবন 'আযিব (রা)। তাঁরা চুপ করে 'আবদুর রহমানের মুখ থেকে হাদীছ শুনতেন।^৮

পারম্পরিক হাদীছ আলোচনা

হাদীছ মুখস্ত করার জন্য তিনি পারম্পরিক আলোচনা অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন। তাঁর নিজের আসরে এ আলোচনা সব সময় চালু ছিলো। তিনি অন্যদেরকেও বলতেন, হাদীছের জীবন হলো তার পারম্পরিক আলোচনার মধ্যে।^৯

৫. আত- তাবাকাত- ৬/৭৫

৬. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫০

৭. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৬০, তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৫২

৮. প্রাগুক্ত

৯. আত-তাবাকাত- ৬/৭৬, তাবি'ঈন-২৫৫

ফিক্হ

ফিক্হতেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞ। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।^{১০}

কাজীর পদে আসীন

ফিক্হতে তাঁর বিজ্ঞতা এতো স্বীকৃত ছিলো যে, যখন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ কৃফায় কাজী নিয়োগ করতে চাইলেন তখন তাঁর দৃষ্টি এই 'আবদুর রহমানের উপর গিয়ে পড়ে। তাঁর পুলিশ কর্মকর্তা হাওশাব বিরোধিতা করে বলেন, যদি আপনি 'আলী ইবন আবী তালিবকে (রা) কাজী বানাতে চান তাহলে তাঁকে বানান। অর্থাৎ এ ব্যক্তি তাঁর মতোই আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবেন। হাওশাবের আপত্তি সত্ত্বেও হাজ্জাজ 'আবদুর রহমানকে কাজী নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর মতপার্থক্যের কারণে হাজ্জাজ তাঁকে অপসারণ করেন।^{১১}

সতর্কতা

ফাতওয়া প্রদানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। বলতেন আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একশ' বিশ জন সাহাবীকে দেখেছি। যখন তাঁদের কারো নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি নিজেকে বাঁচিয়ে চাইতেন যে, অন্য কেউ জবাব দিক। আর এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ কে কার আগে জবাব দেবে সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।^{১২}

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের গণি অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে বেশি উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর পুত্র 'ঈসা, পৌত্র 'আবদুল্লাহ এবং 'আমর ইবন মায়মুন, শা'বী, ছাবিত আল নাবানী, হাকাম ইবন 'উতবা, হুসায়ন ইবন 'আবদির রহমান, 'আমর ইবন মুররা, মুজাহিদ ইবন জুবায়র, ইয়াহইয়া ইবন আল জাযযার, হিলাল আল ওয়াযযান, ইয়াযিদ ইবন আবী যিয়াদ, আবু ইসহাক আশ-শায়বানী, মিনহাল ইবন 'আমর, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমায়র, আ'মাশ, ইসমাইল ইবন আবী খালিদ (রহ) প্রমুখ।^{১৩}

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন

স্বভাবগত ভাবেই তিনি ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির। কোন রকম ভনিতা, কৃত্রিমতা

১০. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫০

১১. প্রাগুক্ত

১২. আত-তাবাকাত- ৬/৭৬, তাহযীবুল কামাল- ১১/৩৫২

১৩. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৬১; তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৫২

ছিলো দারুণ অপহৃদ। একবার ওয়ু করার পর এক ব্যক্তি তাঁর দিকে একটি তোয়ালে এগিয়ে দেয়। তিনি সেটা ছুড়ে ফেলেন।^{১৪} তবে এতো সরলতা সত্ত্বেও মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি একটা সশ্রদ্ধ ভীতি বিরাজ করতো। ফলে মানুষ তাঁকে আমীর-উমরার মতো সম্মান ও ভক্তি করতো। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন,

جلست إليه و أصحابه يعظمونه كأنه أمير

আমি তাঁর নিকট বসে দেখেছি, তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে এমন সম্মান করে, যেন তিনি একজন আমীর।^{১৫}

একটি পরীক্ষা

কাজীর দায়িত্ব পালনকালে তাঁকে একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) প্রবল সমর্থক। পিতা আবু লায়লা (রা), হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে সিয়ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন।^{১৬} উটের যুদ্ধেও তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে একটা বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে ছিলো।^{১৭} খারিজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধেও তিনি 'আলীর (রা) সঙ্গে ছিলেন। এজন্য হাজ্জাজ 'আলীকে (রা) গাল-মন্দ করার জন্য তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তা না করে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করতেন। এতে হাজ্জাজ ক্রিষ্ট হয়ে তাঁকে কাজীর পদ থেকে অপসারণ করে বেত্রাঘাত করেন।^{১৮}

একটি উত্তম আদর্শ

হযরত 'আবদুর রহমান 'আলাবী অর্থাৎ হযরত 'আলীর (রা) অনুসারী ছিলেন। 'আলাবীরা হযরত 'উছমানের (রা) বিপরীতে হযরত 'আলীর (রা) গুণ-মহত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। 'আবদুর রহমানের সমকালীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন হাকীম এবং তিনি ছিলেন 'উছমানী। কিন্তু আকীদাগত দিক দিয়ে দু'জনের অবস্থান দু'মেরুতে হওয়া সত্ত্বেও একই মসজিদে তাঁরা নামায আদায় করতেন এবং কখনো তাঁরা হযরত 'আলী ও হযরত 'উছমানের (রা) গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব-মর্যাদা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতেন না।^{১৯}

১৪. আভ-তাবাকাত- ৬/৭৫

১৫. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫৮

১৬. তাহযীব আল-আসমা'- ১/৩০৪

১৭. ইবন খালিকান, ওয়াকফইয়াত আল আ'ইয়ান- ১/২৭৫

১৮. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫৮

১৯. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, আভ-তারীখ- ১০/২০১

ওফাত

হাজ্জাজের এমন অন্যায় আচরণে বিরক্ত হয়ে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডায়নকারী ইবনুল আশ-আছের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন, মতান্তরে দুজাইল নামক স্থানে পানিতে ডুবে মারা যান। আবু 'উবায়দ উল্লেখ করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ও 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা আল-জামাজিম যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। আর এ যুদ্ধটি হয় হিজরী ৮৩ সনে। আবু নু'আইম, খলীফা ইবন খায়্যাতি ও আবু মূসা মুহাম্মাদ আল-মুহান্নাও ৮৩ সনের কথা বলেছেন।^{২০}

‘আলী ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাসের (রা) পুত্র ‘আলী। তাঁর ডাক নাম আবু মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবু ‘আবদিল্লাহ এবং উপাধি সাজ্জাদ। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে সাহাবী। পিতামহ ‘আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মানিত চাচা এবং পিতা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচাতো ভাই। ‘আলী তাঁর পিতা-মাতার কনিষ্ঠ সন্তান। মায়ের নাম যুর'আ বিনত মুশরিহ। তাঁর পিতৃকূলের বংশধারা এরকম :

‘আলী ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন ‘আব্বাস ইবন ‘আবদিল মুত্তালিব আল কুরাশী আল হাশিমী। ‘আলী ছিলেন ১৩২/৭৫০ সনে বাগদাদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত ‘আব্বাসীয় খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলীফা আবুল ‘আব্বাস আস- সাফ্ফাহ'র দাদা। তাঁর মায়ের দাদা মা'দিকারিব আল-কিন্দী ছিলেন কিন্দার রাজ্য চতুষ্ঠয়ের একজন।^১

জন্ম

হিজরী ৪০ সনের রামাদান মাসে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ‘আলী (রা) যে রাতে আততায়ীর হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন সেই রাতে ‘আলী ইবন ‘আবদিল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। এ কারণে হযরত ‘আলীর (রা) নামে ‘আলী নাম এবং ডাকনাম আবুল হাসান রাখা হয়। কিন্তু চরম ‘আলী (রা) বিদ্বেষী উমাইয়্যা খলীফা ‘আবদুল মালিক তার খিলাফতকালে বললেন, আমি ‘আলী নাম এবং আবুল হাসান ডাকনাম দু'টো একসাথে মোটেই সহ্য করতে পারিনে। এর একটি পরিবর্তন কর। উল্লেখ্য যে, আবুল হাসান ছিলো আমীরুল মু'মিনীন ‘আলীর (রা) কুনিয়াত বা ডাকনাম। যাইহোক খলীফা ‘আবদুল মালিকের রোমানল থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এই আলোচ্য ‘আলী তাঁর ডাকনাম আবুল হাসান বাদ দিয়ে আবু মুহাম্মাদ রাখেন।^২

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে তিনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। আসলে তাঁর আমল-আখলাকের জন্য এতো প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যে, জ্ঞানের জগতে তাঁর যতটুকু বিচরণ ছিলো তা ঢাকা পড়ে যায়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ‘আলিম সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাসের (রা) সন্তান। সুতরাং জ্ঞানের জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। হযরত রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশ কিছু হাদীছ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিলো। তিনি তা বর্ণনা করেছেন। ইবন সা'দ তাঁকে স্বল্পসংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে

১. তাহযীব আল-কামাল- ১৩/৩৪৫; তাবি'ঈন-৩১৩

২. প্রাণ্ডক্ত; আত তাবাকাত- ৫/১৬২; তাহযীব আত তাহযীব- ১৩/৩৪৮

উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ছিলেন একজন ‘ছিকা’ রাবী তথা অতি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।^৩ তিনি তাঁর পিতা হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আবু হুরাইরা, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন আল-আস, ‘আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা), ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার ইবন আল-খাত্তাব ও ‘আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।

আর তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ, ‘ঈসা, ‘আবদুস সামাদ, সুলায়মান, দাউদ, মিনহাল ইবন ‘আমর, সা‘দ ইবন ইবরাহীম, ইমাম যুহরী, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, আবান ইবন সালিহ, ‘আবদুল্লাহ ইবন তাউস, মানসুর ইবন মু‘তামির (রহ) ও আরো অনেকে।^৪

‘ইবাদত-বন্দেগী ও দুনিয়ার প্রতি নির্গীর্ণতা

তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো মসজিদ ও ইবাদতের হজরা কেন্দ্রিক। তিনি তাঁর সময়ের একজন সম্মানিত ‘আবিদ ও আল্লাহ নির্ভর মানুষ ছিলেন। ইবাদতের আধিক্যের কারণে মানুষের নিকট থেকে ‘সাজ্জাদ’ উপাধি লাভ করেন। সাজ্জাদ অর্থ অধিক সাজদাকারী। একরাত ও একদিনে মোট একহাজার রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। ইবাদতের প্রতি এই আগ্রহ ও মনোযোগ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো।^৫ যুবার ইবন বাককার বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।^৬

কখনো কখনো অতি তুচ্ছ কোন ঘটনা একজন মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ‘আলীর জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। প্রথম জীবনে তিনি তেমন কোন ‘আবিদ ও দুনিয়াবিরাগী মানুষ ছিলেন না। আবান ইবন ‘উছমানের (রা) পুত্র ‘আবদুর রহমানের ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা দেখে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। তিনি মনে মনে বলেন, আমি তো তাঁর চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আত্মীয়। সুতরাং আমার তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা উচিত। আর তখন থেকেই তিনি ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় একান্তচিন্তে আত্মনিয়োগ করেন।^৭ তাঁর এমন ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্মিক সাধনা, দুনিয়ার প্রতি নির্গীর্ণতা, ‘আমল-আখলাকের উৎকর্ষতা তাঁকে কুরায়শদের মধ্যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে। একারণে যখন তিনি মক্কায যেতেন তখন গোটা কুরায়শ খান্দানের লোকেরা ভক্তি-শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে তাঁর নিকট হুমড়ি খেয়ে পড়তো।^৮

৩. আত তাবাকাত- ৫/২০৩; তাহযীব আল কামাল- ৭/৩৪৬

৪. তাহযীব আত তাহযীব- ৭/৩৫৭; তাহযীব আল কামাল- ১৩/৩৪৫

৫. আত তাবাকাত- ৫/২২৯; তাহযীব আল কামাল- ১৩/৩৪৭

৬. তাহযীব আল আসমা’ ওয়াল লুগাত- ২/৩১৫

৭. তাহযীব আত- তাহযীব- ৭/৩৫৮; তাহযীব আল কামাল- ১৩/৩৪৬

৮. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৪৯

তঁার প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধার একটা চিত্র আমরা পাই হিশাম ইবন সুলায়মান আল-মাখযুমীর বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন :^৯

إن علي بن عبد الله بن عباس كان إذا قدم مكة حاجاً أو معتمراً عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام وهجرت مواضع حلقتها ولزمت مجلس علي بن عبد الله إعظاماً وإجلالاً وتبجيلاً فإن قعد قعدوا، وإن نهض نهضوا معه، وإن مشى مشوا جميعاً حوله وكان لا يرى لقرشي في المسجد الحرام مجلس ذكر يجمع إليه فيه حتى يخرج علي بن عبد الله من الحرم.

‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) হজ্জ অথবা ‘উমরা উপলক্ষ্যে মক্কায় আগমন করলে কুরায়শরা মসজিদে হারামে তাদের সকল মজলিস-মাহফিল বন্ধ করে দিত। তারা তাদের আসরের স্থানসমূহ ছেড়ে ‘আলী ইবন ‘আবদিল্লাহর মজলিসে অবস্থান নিত। তারা এমনটি করতো তঁার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি বসলে তারা বসতো, উঠলে তারা উঠতো এবং হাঁটলে তারাও তঁার সাথে হাঁটতো। যতক্ষণ ‘আলী ইবন ‘আবদিল্লাহ মসজিদুল হারাম ত্যাগ না করতেন ততক্ষণ মসজিদে কুরায়শদের যিক্রের কোন মজলিস দেখা যেতো না।

খলীফা ওয়ালিদের সাথে বিরোধ

তিনি খলীফা ‘আবদুল মালিকের তালাক দেওয়া স্ত্রী লুবাবাকে বিয়ে করেন। এ কারণে খলীফা ওয়ালিদ ইবন ‘আবদিল মালিকের সাথে তঁার প্রচণ্ড বিরোধের সৃষ্টি হয়। ওয়ালিদ তাঁকে বেত্রাঘাত করে বালকায় নির্বাসন দেন।^{১০} তবে খলীফা হিশামের সাথে তঁার হৃদয়তার সম্পর্ক ছিলো। হিশাম তাঁকে দারুণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। একবার ‘আলী যখন তঁার সাথে দেখা করতে যান তখন তিনি ‘আলীকে নিয়ে রাজকীয় আসনে নিজের পাশে বসান এবং বিদায় বেলা ৩০ হাজার দিরহাম সম্মানী দেন।^{১১}

ওফাত

মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইবন সা‘দের বর্ণনায় ১১৭ অথবা ১১৮ সনের কথা এসেছে।^{১২} তবে ১১৪ সনের কথাও কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়। মৃত্যুকালে তঁার বয়স

৯. তাহযীব আল-কামাল- ১৩/৩৪৭

১০. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৪৮

১১. প্রাণ্ডু

১২. আত-তাবাকাত- ৫/২৩১

হয়েছিলো ৭৭, ৭৮ অথবা ৭৯ বছর। শামের আল-বালকা'তে তাঁর মৃত্যু হয়।^{১৩} তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদেহী ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন, ভূ-পৃষ্ঠে কুরায়শ বংশের এতো সুন্দর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। লম্বা দাড়ি ছিলো। শেষ বয়সে দাড়িতে খিজাব লাগাতেন।^{১৪}

সন্তানাদি

তিনি বহু সন্তানের জনক ছিলেন। তারা হলেন : দাউদ, ঈসা, মুহাম্মাদ, আহমাদ, বিশর, মুবাশ্শির, ইসমাঈল, আবদুস সামাদ, আবদুল্লাহ আল আকবর, আবদুল্লাহ আল আসগার, উবায়দুল্লাহ, আবদুল মালিক, উছমান, সুলায়মান, সালিহ, আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ আল আওসাত, ইয়াহইয়া, ইসহাক, ফাতিমা, উম্মু ঈসা কুবরা, উম্মু ঈসা সুগরা, লুবাবা, বুরায়হা কুবরা, বুরায়হা সুগরা, মায়মূনা, উম্মু আলী, আলিয়া, উম্মু হাবীবা। তাঁর পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের সংখ্যাও অনেক। পরবর্তী আব্বাসীয় খলীফাগণ তাঁরই অধস্তন বংশধর।^{১৫}

১৩. তাহযীব আল-কামাল- ১৩/৩৪৭

১৪. প্রাপ্তক

১৫. আত-তাবাকাত- ৫/২৩০; তাবিঈন-৩১৫

আল-আ'মাশ [সুলায়মান ইবন মিহরান] (রহ)

আবু মুহাম্মাদ সুলায়মানের উপাধি আল-আ'মাশ। ইতিহাসে তিনি এ উপাধিতেই প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম মিহরান এবং তিনি অনারব বংশোদ্ভূত। তাঁর পৈত্রিক দেশ তাবারিস্তান। একটি বর্ণনা মতে, মিহরান দায়লামের কোন একটি যুদ্ধে বন্দী হন। আরেকটি বর্ণনা মতে, আল আ'মাশকে কূফার বানু কাহিলের এক ব্যক্তি ক্রয় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়। যাই হোক, এ কথা স্বীকৃত সত্য যে, আল-আ'মাশ তাঁর প্রথম জীবনে দাস ছিলেন, আর এই দাসত্বের সূত্রে তাঁকে কাহিলী এবং আসাদী বলা হয়।^১

জন্ম

আল-আ'মাশ (রহ) হযরত হুসায়নের (রা) শাহাদাতের দিন অর্থাৎ হিজরী ৬১ সনের 'আশরার দিন জন্মগ্রহণ করেন।^২ অপর একটি বর্ণনা মতে হযরত হুসায়নের (রা) শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়।^৩

জ্ঞান ও মনীষা

যদিও তাঁর জীবনের শুরু দাসত্বের মাধ্যমে, তবে তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্বভাবগত যোগ্যতা ছিলো। সৌভাগ্যবশত: তৎকালীন জ্ঞান চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কূফায় তিনি বেড়ে ওঠেন। এ কারণে পরবর্তীতে কূফায় ইল্ম ও ইফতার মসনদের শোভায় পরিণত হন। তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মনীষার ব্যাপারে সকল সীরাতে বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেছেন। ইবন হাজার ও ইমাম আয যাহাবী (রহ) তাঁকে “আবিদ, ‘আলামাতুল ইসলাম ও শায়খুল ইসলাম” অভিধায় উল্লেখ করেছেন।^৪ ঈসা ইবন ইউনুস বলতেন, আমরা এবং আমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা আল- আ'মাশের সমতুল্য কাউকে দেখিনি।^৫ সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর সমান দক্ষতা ছিলো। ইবন 'উয়ায়না বলেন, আল-আ'মাশ ছিলেন কিতাবুল্লাহর একজন বড় কারী, হাদীছের একজন বড় হাফিজ এবং ইল্মে ফারায়জের সবচেয়ে বড় আলিম।^৬

কুরআন

কুরআনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও যৌক ছিলো। তাঁকে ‘উলুমুল কুরআন (কুরআন

১. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৫৪; তাহযীব আল-কামাল- ৮/১০৬

২. আত-তাবাকাত- ৬/২২৯

৩. তাহযীব আত-তাহযীব- ৪/২২৩

৪. প্রগুক্ত; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৫৪

৫. আল খাতীব আল বাগদাদী, আত-তারীখ- ৯/৮

৬. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৫৪; তাহযীব আল-কামাল- ৮/১১১

বিষয়ক জ্ঞান)-এর নেতৃত্বানীয় 'আলিম গণ্য করা হতো।^৭ হায়ছাম বলেন, আমি কুফায় আল-আ'মশের চেয়ে কুরআনের বড় কোন কারী দেখিনি।^৮ পৃথকভাবে তিনি কুরআনের দারস (পাঠদান করা) দিতেন, কিন্তু বার্ষিকের কারণে শেষ জীবনে তা ছেড়ে দেন। তবে শা'বান মাসে কিছু কুরআন অবশ্যই শোনাতে। কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) অনুসারী ছিলেন। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত এতই বিশুদ্ধ ছিলো যে, মানুষ তা শুনে নিজেদের পাঠ ঠিক করে নিত।^৯

হাদীছ

হযরত রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর জানার পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত ছিলো। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে 'শয়খুল ইসলাম' বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন আল-মাদীনী বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে ছয় ব্যক্তি 'ইল্মে হাদীছ সংরক্ষণ করেছিলেন। মক্কায় 'আমর ইবন দীনার, মদীনায় যুহরী, কুফায় আবু ইসহাক সুবাই'য়ী ও আল-আ'মশ, বসরায় কাতাদা ও ইয়াহইয়া ইবন আবী কাহীর (রহ)। আবু বাকর 'আয্যাশ বলেন, আমরা আল আ'মশকে সায়িদুল মুহাদ্দিহীন (মুহাদ্দিছগণের নেতা) বলতাম।^{১০}

তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত পৌঁছায়। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, ইবন মাদীনীর বর্ণনা মতে সে সংখ্যা ১ হাজার ৩শ'।^{১১} কিছু বর্ণনা মতে সে সংখ্যা ৪ হাজার।^{১২} ইমাম যুহরী (রহ) ইরাকীদের জ্ঞানের কথা স্বীকার করতেন না। একবার ইসহাক ইবন রাশীদ তাঁকে বলেন, কুফায় বানু আসাদের একজন দাস আছেন যাঁর ৪ হাজার হাদীছ মুখস্ত আছে। বিস্ময়ের সাথে যুহরী (রহ) জিজ্ঞেস করলেন : ৪ হাজার?

ইসহাক বললেন : হাঁ, ৪ হাজার। যদি আপনি চান তবে তার কিছু অংশ এনে আপনার সামনে উপস্থাপন করবো।

অতপর তিনি আল-আ'মশের বর্ণিত হাদীছের কিছু অংশ তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন। যুহরী (রহ) তা পড়তে থাকেন এবং বিস্ময়ে তাঁর চেহারার রং পাল্টাতে থাকে। সবটুকু পাঠ শেষ করে তিনি মস্তব্য করেন- একেই বলে 'ইল্ম'। আমার এ জ্ঞান ছিলো না যে, কারো নিকট এতো 'ইল্ম সংরক্ষিত থাকতে পারে।^{১৩} শু'বা বলতেন, হাদীছের ক্ষেত্রে আমার যে

৭. তাহযীব আত-তাহযীব- ৪/২৫৩

৮. আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/৬

৯. আত-তাবাকাত- ৬/৩৩৮

১০. আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/১১; তাহযীব আল কামাল- ৮/১১১

১১. শাযারাত আয-যাহাব- ১/২২১; তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১৫৪

১২. তাহযীব আল কামাল- ৮/১১১, ১১৩

১৩. আত-তাবাকাত- ৬/২৩৯; আল-মিযযীর "তাহযীব আল-কামাল" গ্রন্থে ঘটনাটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। (খণ্ড-৮, পৃ : ১১১-১১২)।

পরিভূক্তি আ'মাশের নিকট থেকে হয়েছে তা আর কারো নিকট থেকে হয়নি।^{১৪} 'আবদুদ্বাহ ইবন মাস'উদের (রা) হাদীছসমূহ বিশেষভাবে তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিলো। কাসিম ইবন 'আবদির রহমান বলতেন, কুফায় আল-আ'মাশের চেয়ে বেশি 'আবদুদ্বাহ ইবন মাস'উদের (রা) হাদীছ জানা লোক আর কেউ নেই।^{১৫}

তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান

অবস্থাগত দিক দিয়েও তাঁর বর্ণিত হাদীছ উঁচু পর্যায়ে ছিলো। তাঁর সংগ্রহের বিশুদ্ধতা এবং বর্ণনাসমূহের উঁচু মানের কারণে তাঁকে মাসহাফ বলা হতো।^{১৬} ইবন 'আম্মার বলতেন, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে আল-আ'মাশের চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ নেই।^{১৭}

'আমর ইবন 'আলী বলেন : সততা ও সত্যবাদিতার কারণে আল-আ'মাশকে মাসহাফ বলা হতো। শু'বার সামনে আল-আ'মাশের আলোচনা উঠলেই বলে উঠতেন : আল-মাসহাফ, আল-মাসহাফ।^{১৮}

সতর্কতা

এতো জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্ক ছিলেন। বেশি বেশি হাদীছ বর্ণনা করা ভালো মনে করতেন না। মানুষকে তিনি বলতেন যখন তোমরা হাদীছ শোনার জন্য কারো নিকট যাও তখন তাকে মিথ্যা বলার জন্য উৎসাহিত করে থাকো। আব্বাহর কসম এই লোকেরা নিকৃষ্ট মানুষ।

তাঁর শিক্ষক ও ছাত্র

হাদীছে হযরত 'আবদুদ্বাহ ইবন মাস'উদের (রা) পরে যাঁদের নিকট থেকে বেশি ফায়দা উঠিয়েছেন তাঁরা হলেন : আনাস ইবন মালিক (রা), 'আবদুদ্বাহ ইবন আবী আওফা, ইবরাহীম আত-তায়মী, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, ইসমা'ঈল ইবন মুসলিম আল-মাক্কী, যায়দ ইবন ওয়াহাব, আবু ওয়ায়িল, আবু উমার আশ-শায়বানী, কায়স ইবন আবী হাযিম, ইসমা'ঈল ইবন রাজা, আবু সাখরা, জামি' ইবন শান্নাদ, আবু যীবান ইবন জুনদুব, ইমাম শা'বী, মুজাহিদ ইবন জুবায়র (রহ) ও আরো অনেকে।^{১৯}

তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে হাকাম ইবন 'উতবা, যুবায়দ আল- ইয়ামামী, আবু ইসহাক সুবায়'ঈ, সুলায়মান আত-তায়মী, সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি', শু'বা,

১৪. আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/১০

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১৫৪

১৭. তাহযীব আত-তাহযীব- ৪/২২৩

১৮. তাহযীব আল-কামাল- ৮/১১২

১৯. প্রাগুক্ত-৮/১০৭-১০৯; তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১৫৪

ইবরাহীম ইবন তাম্মান, জারীর ইবন হাযিম, আবান ইবন তাগলিব, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, 'আবদুল্লাহ ইবন আল মুবারকি (রহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{২০}

মুহাদ্দিছগণের মান সম্পর্কে তাঁর মতামত

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার আর একটি প্রমাণ এই যে, তিনি তাঁর সময়ের বড় বড় মুহাদ্দিছের জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারিত ছিলো। আবু বাকর ইবন আয়্যাশ বলেন, আমরা আল-আ'মাশকে সাযিয়দুল মুহাদ্দিছীন- মুহাদ্দিছগণের নেতা বলতাম। অন্য মুহাদ্দিছগণের দারসে বসার পর শেষে আ'মাশের নিকট যেতাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, কার নিকট থেকে এসেছো? আমরা বলতাম অমূকের নিকট থেকে। নাম শুনে তিনি বলতেন, সে তো ফাঁটা ঢোল। আবার জিজ্ঞেস করতেন, তারপর কোথায় গিয়েছিলে? আমরা বলতাম অমূকের নিকট। তিনি বলতেন, সে তো একটা উড়ন্ত পাখী। আবার জিজ্ঞেস করতেন, তারপর? আমরা নাম বলতাম। তিনি বলতেন, সে তো একটা তবলা।^{২১}

ফিক্হ ও ফারায়েজ

ফিক্হ ও ফারায়েজ শাস্ত্রেও তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিলো। ফকীহগণ তাঁকে নিজেদের নেতা মানতেন। ফারায়েজ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিলো। ইবন 'উয়ায়না বলেন, তিনি ফারায়েজের একজন বড় 'আলিম ছিলেন। তাঁর পূর্বে ইবরাহীমকে ফারায়েজের 'আলিম বলে মানা হতো এবং মানুষ এই শাস্ত্রের মাস'আলা জ্ঞানার জন্য তাঁর কাছেই যেতো। তাঁর ওফাতের পর আল-আ'মাশ তাঁর স্থান দখল করেন। মানুষ তাঁর কাছে যেতো।^{২২}

'ইবাদত-বন্দেগী

'ইল্মের সাথে তিনি 'আমলেও একই মানের অধিকারী ছিলেন। ইয়াহইয়া আল-কাস্তান বলেন, তিনি একজন 'আবিদ ও দুনিয়া বিরাগী-মাহিদ ছিলেন।^{২৩} ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ তাঁকে যুগের 'উবাদত তথা অত্যাধিক ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য করতেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল-আ'মাশ তাঁর পরে আর কাউকে তাঁর চেয়ে বড় ইবাদতকারী রেখে যান নি।^{২৪}

ইমাম যাহাবী (রহ) লিখেছেন, তিনি 'ইল্মে নাকি' ও আমলে সালিহ তথা কল্যাণকর জ্ঞান ও

২০. প্রাগুক্ত

২১. আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/১১; তাহযীব আল-কামাল- ৮/১১৪

২২. আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/৮

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাহযীব আত- তাহযীব- ৪/২২৪

সংকাজের নেতা ছিলেন।^{২৫} জামা'আতে নামায আদায়ের উপর এতো গুরুত্ব দিতেন যে, সন্তর বছরের মধ্যে তাঁর তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) জামা'আত থেকে ছুটে যায়নি।^{২৬}

বিস্তারীণ ও ক্ষমতার অধিকারীদের ব্যাপারে উদাসীন

আ'মাশ ছিলেন আদ্বাহর প্রিয় বান্দা এবং উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ মানুষের মতো একেবারেই বিস্তারীণ। জীবিকার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এতো দারিদ্র ও অভাব থাকা সত্ত্বেও আমীর-উমারা এবং রক্ষীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে অত্যন্ত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতেন। 'ঈসা ইবন ইউনুস বলেন, আ'মাশের অভাব ও দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর থেকে বেশি আর কাউকে আমীর-উমারা ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে দেখিনি।^{২৭} ইমাম শা'বানী লিখেছেন, আ'মাশের রুটিও জুটতো না, কিন্তু তাঁর মজলিসে আমীর ও ক্ষমতাসীল শাসকদেরকে সবচেয়ে বড় দরিদ্র মনে হতো।^{২৮}

তাঁর সাহসিকতার একটি ঘটনা

আমীর-উমারা ও ক্ষমতাসীনদের মুকাবিলায় তাঁর সাহসিকতা ও সত্য উচ্চারণের একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। একবার খলীফা হিশাম তাঁকে লেখেন যে, আপনি আমার জন্য 'উছমানের (রা) গুণ-বৈশিষ্ট্য ও 'আলীর (রা) দোষ-ত্রুটি লিখে পাঠান। তিনি শাহী দূতের সামনে চিঠিটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ছাগল দিয়ে খাইয়ে ফেলেন। তারপর পত্র-বাহক দূতকে বলেন, এই হলো তোমার চিঠির জবাব। দূত যখন একটি জবাবের জন্য বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, তখন তিনি লিখলেন : “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। অতপর এই যে, যদি 'উছমানের (রা) ব্যক্তি সন্তায় প্রথিবীর সকল মানুষের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে থাকে তাহলেও তা আপনার ব্যক্তি সন্তার কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি 'আলীর (রা) ব্যক্তি সন্তা সারা পৃথিবীর দোষ-ত্রুটির সমাবেশ স্থল হয়, তাহলেও তা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার উচিত শুধু নিজের খবর রাখা।”^{২৯}

নিজেকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করা

পূর্বে উল্লেখিত তাঁর জাহিরী ও বাতিনী তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তিনি নিজ সন্তাকে খুবই হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। এ কারণে তিনি মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে

২৫. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৫৪

২৬. প্রাগুক্ত; আল খাতীব আল বাগদাদী- ৯/৮

২৭. তাহযীব আত- তাহযীব- ৪/২২৪

২৮. আশ শা'বানী, আত তাবাকাত আল কুবরা- ১/৩৮

২৯. শায়রাতে আয বাহাব- ১/২২১

যান যে, “আমি যখন মারা যাবো তখন কাউকে আমার মৃত্যুর কথা জানাবে না এবং আমাকে আমার রবের (প্রভু) নিকট নিয়ে গিয়ে কবরে ফেলে দিবে। আমি তাঁর চেয়েও হেয় ও তুচ্ছ যে, মানুষ আমার জানাযায় অংশগ্রহণ করুক।”^{৩০}

হিজরী ১৪৮, মতান্তরে ১৪৭ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৭ অথবা ৮৮ বছর।^{৩১}

৩০. আত তাবাকাত আল কুবরা- ১/৩৮

৩১. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৫৪; তাহযীব আল-কামাল- ৮/১১৪

রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ)

আবু নাসর রাজা' তাঁর পূর্ণ নাম। পিতা হায়ওয়া ইবন জারওয়াল। কিন্দা গোত্রের সন্তান। তাঁর দাদা জারওয়াল (রা) একজন সাহাবী। রাজা'র ডাকনাম আবু নাসর, মতান্তরে আবুল মিকদাম।^১

হযরত রাজা' শামের ফিলিস্তিনের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন,^২

كَانَ ثَقَّةً عَالِمًا فَاضِلًا كَثِيرَ الْعِلْمِ

তিনি একজন বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী মানুষ ছিলেন।

ইমাম নাওবী বলেন : তাঁর মহত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।^৩

হাদীছ ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে তিনি তীক্ষ্ণ মেধা ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও শামের অধিবাসীদের শায়খ বলেছেন।^৪ মাতারুল ওয়াররাক বলতেন, রাজা' ইবন হায়ওয়ার চেয়ে উত্তম কোন শামবাসী এবং হাদীছের বর্ণনা বিষয়ে বেশি জানা কোন মানুষের সাথে আমি মিশিনি।^৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) ইবন আল-আস, আদী ইবন উমায়রা, উবাদা ইবন আস-সামিত (রা), আবদুর রহমান ইবন গানাম, মু'আবিয়া, তাওয়াস ইবন সাম'আন, আবুদ দারদা, আবু সাঈদ আল খুদরী, আবু উমামা, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, কুবায়সা ইবন যুওয়াইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, ওররাদ কাতিব (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। আদি ইবন আদি, ইবন আজলান, ছাওর ইবন ইয়াযীদ, ইবন আওন, মাতারুল ওয়াররাক, যুহরী, মুহাম্মাদ ইবন হাজাদা, হুমায়দ আত তাবীল (রহ) প্রমুখ তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র।^৬

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সেই সাহাবীদের সময় থেকেই দু'টি ধারা চালু ছিলো। একটি হলো শ্রুত শব্দ ও বাক্য যথাযথ বর্ণনা করা।

১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা' আর রিজাল- ৬/১৮০
২. আত তাবাকাত-৭/১৬১; তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১৮১
৩. তাহযীব আল আসমা'- ১/১৯০
৪. তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১১৮
৫. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/২২৯
৬. প্রাগুক্ত, তায়কিরাতুল হফফাজ- ১/১১৮

অপরটি হলো ভিন্ন শব্দ ও বাক্যে অর্থ ও ভাব বর্ণনা করা। হযরত রাজা' প্রথম ধারাটি কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। ইবন 'আওন বলেন, ইবরাহীম আল নাখাঈ, 'আল হাসান আল বাসরী ও আশ্ শাবী হাদীছের ভাব ও অর্থ নিজেদের ভাষায় বর্ণনা করতেন, তবে আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন ও রাজা' ইবন হায়ওয়া শ্রুত শব্দ ও বাক্যে হুবহু বর্ণনা করতেন।^৭

ফিক্‌হ

হাদীছের চেয়ে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর বেশি পাণ্ডিত্য ছিলো। মাতারুল ওয়াররাক বলতেন, শামের কাউকে তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ দেখিনি।^৮ ইবন হিব্বান তাঁকে শামের অন্যতম ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার একটি সনদ এই যে, তিনি কাজা' বা বিচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।^৯

সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে তাঁর স্থান

সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময়ে সকল 'আলিম তাঁর অগাধ জ্ঞান ও মনীষার কথা অকপটে স্বীকার করতেন। শামের একজন বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন মাকহুল। তিনি তাঁকে নিজের শায়খ, মনীব এবং সমগ্র শামের নেতা বলে অভিহিত করতেন।^{১০} তাঁর বর্তমানে মাকহুল নিজে কোন মাসয়ালায় জবাব দিতেন না। মুসা ইবন ইয়্যাসার বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে মাকহুলের নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ, আমাদের নেতা রাজা' ইবন হায়ওয়ার নিকট জিজ্ঞেস কর।^{১১} ইবন 'আওন বলতেন, শামে আমি রাজা'র সমকক্ষ কাউকে দেখিনি এবং ইরাকে ইবন সীরীনের মতো এবং হিজাযে কাসিমের মতোও কাউকে দেখিনি।^{১২}

ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীনতা

এতো গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন উঁচু মাপের 'আবিদ ও দুনিয়া বিরাগী মানুষ ছিলেন। ইবন হিব্বান লিখেছেন, তিনি শামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদ ও দুনিয়া বিরাগী মানুষদের একজন ছিলেন।^{১৩} তাঁর আল্লাহ ভীরুতা ও বৈরাগ্য জীবন ধারার কারণে মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক বলতেন, কিন্দার তিন মহান ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ বশত:

৭. আত তাবাকাত- ৭/১৬১; তাহযীব আল কামাল- ৬/১৮৩
৮. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/২৩০; তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/১১৮
৯. তাহযীব আল আসমা'- ১/১৯০
১০. প্রাগুক্ত
১১. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/২২৯
১২. তাজকিরাতুল হুফাজ- ১/১১৮; তাহযীব আল কামাল- ৬/১৮৩
১৩. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/২৩০

আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করেন। তাঁদের একজন হলেন, রাজা' ইবন হায়ওয়া।^{১৪}

তাঁর এমন তাকওয়া-পরহেযগারী ও দুনিয়া বিরাগী মন-মানসিকতার কারণে সর্বদা ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতেন এবং কখনো কারো কাছে কোন প্রয়োজনে যেতেন না। একবার জটনক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি বর্তমান খলীফার নিকট যান না কেন? জবাব দিলেন, আমার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সত্বাই যথেষ্ট। আমি তাঁর জন্যই এদেরকে ছেড়েছি।^{১৫}

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান

মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান এবং সবচেয়ে বড় দীনী খিদমত এই যে, তিনি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে পরামর্শ দেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে (রহ) পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের জন্য।^{১৬}

الداعي إلى الخير كفاعله

ভালো কাজের দিকে আহ্বানকারী সেই ভালো কাজটি যে করে তার মতোই ছাওয়াবের অধিকারী হয়।

-এ কথার আলোকে তিনিও এই মহৎ কাজের একজন অংশীদার হয়েছেন।

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন কেবল আইউব নামে এক পুত্র। অন্যরা সকলে ছিলো ছোট। সুলায়মান পরবর্তী খলীফা হিসেবে আইউবকে মনোনীত করেন। কিন্তু সুলায়মানের পূর্বেই তিনি মারা যান। অতঃপর তাঁর সন্তানদের কেউই খিলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত ছিলো না। হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের প্রথম জুমু'আর দিন খলীফা সুলায়মান 'দাবিক' নামক স্থানে ছিলেন। 'দাবিক' হলো হলবের নিকটবর্তী একটি সেনা শিবির, রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় বানু উমাইয়রা সেখানে অবস্থান করতো। এখানে অবস্থানকালে খলীফা সুলায়মান মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন সম্পর্কে যখন হতাশ তখন পরবর্তী খলীফা মনোনীত করার ইরাদা করেন। কিন্তু কাকে করবেন? পুত্র সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক তো কেউ নেই। অগত্যা জীবিত সন্তানদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় রাজা' ইবন হায়ওয়া ও উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। উল্লেখ্য যে, রাজা' ছিলেন খলীফা সুলায়মানের একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ও উপদেষ্টা। তাই তিনি রাজা'কে বলেন, আমার ছেলেটিকে খিলাফতের পোশাক 'আবা' ও

১৪. তাহযীব আল আসমা'- ১/১৯০

১৫. প্রাপ্ত

১৬. তাজকিরাতুল হফফাজ- ১/১১৮

চাদর পরিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাকে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে হাজির করা হলো। দেখলেন সে একেবারেই ছোট। পোশাকের ভার সে বইতে পারছেন, মাটিতে টেনে চলছে। তিনি রাজা'কে আবার বললেন, তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাই করা হলো। দেখলেন সে তা বহনের উপযুক্ত নয়। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নিম্নের চরণটি :

إِنْ بُنِيَ صِيَّةً صِغَارًا + أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ كِبَارًا

আমার সন্তানরা সকলে ছোট শিশু। সেই ব্যক্তিই সফলকাম যার বড় সন্তান-
সম্ভ্রতি রয়েছে।

পাশেই বসা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলে উঠলেন :^{১৭}

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাঁর
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা সুলায়মানের পুত্র আইউব জীবিত ছিলো। তবে তখনো খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের বয়স তাঁর হয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেছেন, দাবিকে সুলায়মান যখন অসুস্থ্য অবস্থায় শয্যাশায়ী তখন একদিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম তিনি কী যেন লিখছেন। বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! কী করছেন? জবাব দিলেন, আমার পুত্র আইউবকে খলীফা মনোনীত করার অঙ্গীকার পত্র লিখছি। আমি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! পরবর্তী খলীফা এমন একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বানিয়ে যান যার কারণে আপনি কবরেও নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকতে পারেন। সুলায়মান বললেন, এ আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বিষয়টি আরো একটু ভেবে দেখবো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাওফীক কামনা করবো। এরপর তিনি দু'দিন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর পূর্বের লেখা অঙ্গীকার পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর রাজা'কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : আমার আরেক পুত্র দাউদের ব্যাপারে আপনার মত কি? রাজা' বললেন : সে তো বর্তমানে কনস্টান্টিনোপলে, জীবিত আছে, না মারা গেছে তা আমাদের জানা নেই। তাহলে এই খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? রাজা' বললেন : সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক আপনি। আপনি কারো নাম বলুন আমি ভেবে দেখবো।

সুলায়মান বললেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমারের নামটি রাজা'ই উচ্চারণ করেন। যাই হোক রাজা' বললেন, আমি মনে করি তিনি একজন জ্ঞানী ও ভালো মুসলিম। সুলায়মান বললেন, আল্লাহর কসম!

সে এমনই। কিন্তু আমি যদি আবদুল মালিকের সন্তানদের একেবারে উপেক্ষা করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যাই তাহলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। যদি তাঁর পরে আবদুল মালিকের কোন ছেলের নাম প্রস্তাব না করে যাই তাহলে তারা তাঁকে খিলাফাতের মসনদে আসীন হতেই দেবে না। এ কারণে আমি 'উমারের পরে খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের নাম মনোনীত করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন :

لَا عَقْدَنَ عَقْدًا لَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبَ

আমি অবশ্যই এমন একটি অঙ্গীকার পত্র লিখে যাব যাতে শয়তানের কোন অংশ থাকবে না।^{১৮}

এতে তারা শান্ত থাকবে এবং তাঁকে মেনে নেবে। রাজা'ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। অতঃপর সুলায়মান নিজ হাতে একটি অঙ্গীকার পত্র লিখে তা সীল-মোহর করেন। তারপর খান্দানের সকলকে একত্রিত করেন। রাজা'কে নির্দেশ দেন অঙ্গীকার পত্রটি নিয়ে তিনি খান্দানের সমবেত লোকদের নিকট যাবেন এবং তাদেরকে বলবেন, খলীফার এই সীল-মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে তিনি যাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছেন তাঁরা যেন তাঁর অনুগত্যের শপথ তথা বাই'আত করেন। রাজা' খলীফার নির্দেশ পালন করেন। সমবেত সকলে সম্মুখে سَمِعْنَا وَ اطعْنَا (আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম) বলে ইতিবাচক সায দেন। তারপর তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা সুলায়মানের সাথে তাঁদের সাক্ষাতের অনুমতি দান করা হয়। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলে রাজা'র হাতে থাকা অঙ্গীকার পত্রটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, “এর মধ্যে আমি যাকে খলীফা মনোনীত করেছি তাঁর প্রতি বাই'আত কর এবং তাঁর আনুগত্য কর।” এভাবে দ্বিতীয়বার প্রত্যেকের নিকট থেকে পৃথক পৃথক ভাবে বাই'আত গ্রহণ করা হয়।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রবল ধারণা ছিলো, সুলায়মান তাঁকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। তিনি এই গুরু দায়িত্ব পালনে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ কারণে তিনি একাকী রাজা'র নিকট গিয়ে বলেন, আমার প্রতি সুলায়মানের যে পরিমাণ স্নেহ-মমতা আছে এবং আমাকে যে রকম অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আমার ধারণা হয়, তিনি আমাকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। যদি এমন হয় তাহলে আমাকে আগে ভাগেই বলে দিন যাতে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই আমি অব্যাহতি নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু রাজা' তা জানাতে অস্বীকার করেন। 'উমার ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান। হিশাম ইবন আবদিল মালিকও ঠিক একই রকম আবেদন জানান রাজা'র নিকট। রাজা' তাঁকেও জানাতে অস্বীকৃতি জানান।^{১৯}

খলীফা মনোনয়নের পর্ব শেষ হওয়ার পরেই সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক

১৮. ইবন 'আবদিল হাকাম; সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয- ২৯-৩০

১৯. আল কামিল ফী আত-তারীখ- ৫/৪০; আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয- ২০

ইত্তিকাল করেন। রাজা' অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে সুলায়মানের মনোনয়ন পত্রের বিষয়বস্তু এবং তাঁর মৃত্যুর কথা গোপন রাখেন। তিনি দ্বিতীয়বার দাবিকে জামি' মাসজিদে শাহী খান্দানের সদস্যদের সমবেত করেন। তারপর সকলকে লক্ষ্য করে বলেন : আমীরুল মু'মিনীনের এই মনোনয়ন পত্রে যাঁর নাম আছে তাঁর প্রতি আপনারা দ্বিতীয়বার বাই'আত করুন। উপস্থিত সদস্যদের অনেকে বললেন : আমরা তো একবার বাই'আত করেছি, আবার কেন? এর কোন প্রয়োজন আছে কি? রাজা' বললেন, এটা আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ।

তাঁরা একজন একজন করে সীল-মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে উল্লেখিত অজ্ঞাত খলীফার প্রতি বাই'আত করলেন। এভাবে রাজা' তাঁদের বাই'আত নিশ্চিত করে খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের মৃত্যুর ঘোষণা দেন। তারপর সেই মনোনয়ন পত্রটি খুলে সকলের সামনে পাঠ করে শোনান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নাম শুনেই সদ্য প্রয়াত খলীফা সুলায়মানের ছোট ভাই হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক বলে উঠেন : আমরা কখনো তাঁর বাই'আত করবো না। রাজা' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, চুপ করে বাই'আত করে নাও, নইলে ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তারাপর রাজা' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাত ধরে মিস্রের উপর বসিয়ে দেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিশাল দায়িত্বের বোঝা কাঁধে অর্পিত হওয়ায় তাঁর মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হয় :

إنا لله و إنا إليه راجعون.

(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)। আর এদিকে হিশাম রাজা'র এক ধমক খেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে “ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন” পাঠ করতে করতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর হাতে বাই'আত করেন।^{২০} এভাবে খলীফা নির্বাচনে রাজা' এক বিশাল দায়িত্ব পালন করেন।

হিজরী ১১২ সনে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ইত্তিকাল করেন।^{২১} শেষ বয়সে দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে যায়। মাথায় খিজাব লাগালেও দাড়ি সাদাই রেখে দেন।^{২২}

২০. আল কামিল ফী আত তারীখ- ৫/৪১; তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/৪৪-৪৯

২১. তাজকিরাতুল হুফফাজ- ১/১১৮; তাহযীব আল-কামাল- ৬/১৮৪

২২. তাবি'ঈন- ১৩৫

‘আবদুর রহমান ইবন গান্ম (রহ)

হযরত ‘আবদুর রহমানের পিতার নাম গান্ম। তাঁর বংশধারা এ রকম : ‘আবদুর রহমান ইবন গান্ম ইবন কুরায়ব ইবন হানী ইবন রাবী‘আ ইবন ‘আমির ইবন ‘আযার আ‘দী ইবন ওয়ায়িল ইবন নাজিয়া ইবন হুনাইক ইবন জামাহির ইবন আদ‘আম ইবন আশ‘আর আল-আশ‘আরী। কোন কোন ‘আলিমের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন।^১ তাঁদের মতের স্বপক্ষে তাঁরা এ ঘটনা উপস্থাপন করেন যে, তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আবু মূসা আল আশ‘আরীর (রা) সাথে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এসেছিলেন। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং সে সময় ইসলামও গ্রহণ করেন; তবে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দর্শন ও সাক্ষাৎ খেতে বঞ্চিত থেকে যান।^২ এ বর্ণনাটি প্রায় সর্বসম্মত।

তবে এ কথা সঠিক যে, তাঁর পিতা গান্ম আবু মূসা আল আশ‘আরীর সাথে মদীনায়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহচর্য লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পরে কোন একটি জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।^৩

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষার দিক দিয়ে ‘আবদুর রহমান বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্গত ছিলেন। আবু মাসহার আল-গাসসানী তাঁকে “رأس التابعين” তাবি'ঈদের মাথা বলতেন।

ইমাম যাহাবী বলেন :

كان كثير القدر صادقا فاضلا

তিনি অতি উঁচু মর্যাদাবান, সত্যবাদী ও জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।^৪

ইবন সা‘দ তাঁকে শামের তাবি'ঈদের প্রথম স্তরে তাঁর নামটি সন্নিবেশ করেছেন। আল ‘ইজলী তাঁকে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।^৫ ইবন হাজার বলেন, তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন।^৬ বলা হয়ে থাকে যে, শামের তাবি'ঈগণ তাঁর কাছেই ফিক্‌হের জ্ঞান লাভ করেন।

১. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩২

২. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫০; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫১

৩. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩২

৪. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫১

৫. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৩

৬. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫১

ইমাম আয যাহাবী তাঁকে شيخ أهل فلسطين “ফিলিস্তীনবাসীর শায়খ বা শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন।”^৭

হাদীছ

তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন। এ ধরনের ব্যক্তিকে “মুখাদরাম” বলা হয়। আর এ কারণে শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের বড় একটি দলের নিকট থেকে হাদীছ শোনার সুযোগ লাভ করেন। যেমন : হযরত ‘উমার, ‘উছমান, ‘আলী, আবু যার আল গিফারী, আবুদ দারদা’, আবু ‘উবায়দা ইবন আল জাররাহ, আবু মালিক আল আশ‘আরী, আবু মুসা আল আশ‘আরী, আবু হুরায়রা, ‘উবাদা ইবন আস সামিত, ছাওবান, মু‘আবিয়া (রা) ও আরো অনেকে।^৮ বিশেষত হযরত মু‘আয ইবন জাবালের (রা) সাহচর্য থেকে বেশি উপকার লাভ করেন। তাঁর সাথে বেশি ওঠা-বসা ও সাহচর্যের কারণে লোকেরা তাঁকে صاحب معاذ – “মু‘আযের সঙ্গী” উপাধি দেয়।^৯

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শোনে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদির রহমান, ‘আতিয়া ইবন কায়স, আবু সাল্লাম আল আসওয়াদ, মাকহুল শামী, শাহর ইবন হাওশাব, রাজা’ ইবন হায়ওয়া, ‘উবাদা ইবন নাসী, মালিক ইবন আবী মারযাম, সাফওয়ান ইবন সালীম (রহ) প্রমুখ।^{১০} ফিকহ ছিলো ‘আবদির রহমানের বিশেষ অধীত বিষয়। এতে তাঁর ছিলো ভীষণ পারদর্শিতা। তার রড় সনদ এই যে, ফিকহী বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য উমার (রা) তাঁকে শামে পাঠান। শামের প্রায় সকল তাবি'ঈ ফিকহের জ্ঞান তাঁর নিকট থেকেই অর্জন করেন।

তিনি ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ। মানুষ তাঁকে খুবই সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। তিনি আবু হুরায়রা এবং আবুদ দারদার (রা) মতো মহান সাহাবীদ্বয়কে একবার সত্য কথা গুনিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁরা যখন মু‘আবিয়ার (রা) দূত হিসেবে ‘আলীর (রা) নিকট যান এবং সেখান থেকে ফেরার পথে হিম্বে আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন :

عجبا منكما كيف جاز عليكما ما جئتما به تدعوان علياً أن يجعلا شوري
وقد علمتما أنه قديمايه المهاجرون والأنصار فأهل الحجاز والعراق وأن من
رضيه خير ممن كرهه ومن بايعه خير ممن لم يبايعه وأى مدخل لمعاوية في
الشورى وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لهم الخلافة وهو وأبوه رؤس
الأحزاب

৭. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫১

৮. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫০

৯. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩১; তাহযীব আল আসমা'- ১/৩০৩

১০. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫০

আপনাদের দু'জনের কর্ম-কাণ্ড বিস্ময়কর! আপনারা খিলাফাতের বিষয়টি যে শূরার উপর ন্যস্ত করার জন্য 'আলীর প্রতি আহ্বান জানালেন; তা সঙ্গত মনে করলেন কেমন করে? অথচ আপনারা জানেন মুহাজির ও আনসারগণ এবং হিজায় ও ইরাকের অধিবাসীগণ 'আলীর হাতে বাই'আত করেছেন। আর যারা তাঁকে মেনে নিয়েছেন তাঁরা ঐসব লোকদের চেয়ে ভালো যারা তাঁকে মেনে নেয়নি। তেমনিভাবে যারা তাঁর হাতে বাই'আত করেছেন তাঁরা ঐসব লোকদের থেকেও উত্তম যারা বাই'আত করেনি। আর শু'রার ক্ষেত্রে মু'আবিয়ার কি অধিকার আছে? তিনি তো তুলাকা' তথা ক্ষমাপ্রাপ্তদের একজন, যাদের খিলাফাতে কোন অধিকার নেই। কারণ আহযাব যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর তিনি ও তার পিতা ছিলেন অন্যমত নেতা।^{১১}

ওফাত

হিজরী ৭৮ সনে তিনি শামে ইনতিকাল করেন।^{১২}

;

১১. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৩

১২. তাহযীব আল আসমা'- ১/৩০৩; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৪৪

‘উবাইদুল্লাহ ইবন ‘আবদিল্লাহ (রহ)

হযরত ‘উবাইদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবু ‘আবদিল্লাহ। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদের (রা) ভাই ‘উতবার পৌত্র। তাঁর বংশধারা এরকম :

‘উবাইদুল্লাহ ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন ‘উতবা ইবন মাস‘উদ ইবন গাফিল ইবন হাবীব ইবন সামাখ ইবন ফার ইবন মাখযূম। তিনি বানু মাখযূমের সন্তান। জন্মাক্ষ ছিলেন।^১ ‘উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) খিলাফাতকালে মতান্তরে তার সামান্য কিছুদিন পরে ‘উবাইদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।^২

জ্ঞান ও মনীষা

‘উবাইদুল্লাহর বাড়ীটি ছিলো ‘ইলম ও ‘আমলের (জ্ঞান ও কর্মের) লালন কেন্দ্র। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে ‘ইলম ও ‘আমলের সাগর-সঙ্গমতুল্য করে দেয়। জ্ঞান ও মনীষায় তিনি শীর্ষ স্থানীয় তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য হতেন। হাদীছ, ফিকহ, কাব্যচর্চা এবং প্রচলিত অন্যান্য জ্ঞানে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। ইবন সা‘দ লিখেছেন :^৩

كان ثقة كثير الحديث والعلم، شاعرا

তিনি নির্ভরযোগ্য, বহু হাদীছ ও জ্ঞানের বাহক এবং কবি ছিলেন।

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠতা, ইমামত ও উঁচু মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।^৪

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস, আবু হুরাইরা, আবু সা‘ঈদ আল খুদরী, আবু ওয়াকিদ আল লায়ছী, যায়দ ইবন খালিদ, নু‘মান ইবন বাশীর, ‘আম্মার ইবন ইয়াসির, আবু তালহা আল আনসারী, উম্মুল মু‘মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিকা, ফাতিমা বিনত কায়স (রা) এবং তাবি'ঈদের বড় একটি দলের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন।^৫

তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিলো যে, একবার যে হাদীছ শুনতেন চিরদিনের জন্য তা স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যেত।^৬ এমন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে অত্যন্ত প্রশস্ত করে

১. তায়কিরাতুল হুফযাজ- ১/৭৮
২. ‘আসরুত তাবি'ঈন-৮৫
৩. আত-তাবাকাত- ৫/১৮৫
৪. তাহযীব আল আসমা'- ১/৩১২
৫. তাহযীব আল কামাল- ১২/২১৩
৬. তাহযীব আত তাহযীব- ৭/৪২২

দেয়। ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, 'আমি যে সকল 'আলিমের নিকট বসেছি তাঁদের নিকট যা কিছু ছিল সব অর্জন করেছি। কিন্তু 'উবাইদুল্লাহ ছিলেন জ্ঞানের অন্তহীন সাগর। তাঁর কাছে যখন যেতাম, প্রতিবারেই নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করতাম। আমি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করলাম। একটা পর্যায়ে পৌঁছে আমার মধ্যে প্রত্যয় জন্মালো যে, যতটুকু আমি অর্জন করেছি তা যথেষ্ট। কিন্তু যখন 'উবাইদুল্লাহর নিকট গেলাম তখন বুঝলাম আমার জ্ঞান অতি সামান্যই।'^৭

ছাত্র

হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্রদের গণি অনেক প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজনের নাম এখানে দেয়া হলো : 'আওন ইবন সা'দ ইবন ইবরাহীম, আবু যানাদ, সালিহ ইবন কায়সান, 'আররাক ইবন মালিক, মুসা ইবন আবী 'আয়িশা, আবু বকর ইবন আবিল জাহ্ম 'আদাবী, দামরা ইবন সা'ঈদ, তালহা ইবন ইয়াহইয়া, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদুলহু, 'আবদুল মাজিদ ইবন সুহায়ল (রহ) ও আরো অনেকে।'^৮ ইমাম যুহরী তাঁর দারসের আসরের একজন বিশিষ্ট শিক্ষার্থী ছিলেন। ঘনিষ্ঠতাও ছিলো। 'উবাইদুল্লাহর জ্ঞান থেকে ফায়দা হাসিলের এ ধারা সব সময় অব্যাহত ছিলো। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, ইবন শিহাব যুহরী (রহ) একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম হওয়ার পরেও 'উবাইদুল্লাহর নিকট আসা-যাওয়া করতেন। 'উবাইদুল্লাহ তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন এবং ইবন শিহাব তাঁর জন্য কূপ থেকে পানি উঠাতেন।'^৯

ফিকহ

ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষ করে তাঁর স্থান ছিলো অনেক উর্দে। ইমাম আবু জা'ফর আত-তাবারী বলেন, আহকাম ও হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর স্থান ছিলো অতি উঁচুতে। ফিকহ বিষয়ে তাঁর মনীষার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, তিনি মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহর একজন ছিলেন। হাফিজ ইবন 'আবদিল বার বলেন, তিনি মদীনার সেই দশজন এবং তারপর সেই সাতজন ফকীহর মধ্যে ছিলেন, যাঁদেরকে ফিকহ ও ফাতওয়ার কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য করা হতো। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং ফিকহতে ছিলো তাঁর অতি উঁচু স্থান।'^{১০}

কাব্য প্রতিভা

তিনি একজন কবিও ছিলেন। ইবন 'আবদিল বার বলেন, তিনি খুব ভালো কবি ছিলেন। তাঁর জানামতে সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগ থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত ফকীহদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কবি এবং কবিদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ আর কেউ ছিলেন না।'^{১১}

৭. প্রাগুক্ত; তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৭৯

৮. তাহযীব আল কামাল- ১২/২১৩

৯. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৭৯

১০. তাহযীব আত তাহযীব- ৭/২৪

১১. প্রাগুক্ত

‘উবাইদুল্লাহ (রহ) কবি ছিলেন। তবে তিনি অবশ্যই সেই কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের নিন্দা করে আল কুরআন বলেছে :

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.

এবং কবিগণকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা তো বলে যা তারা করে না।”^{১২}

বরং তিনি ছিলেন সেই কবিদের একজন যাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন এভাবে :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

কিন্তু তারা ব্যতিত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।^{১৩}

অর্থাৎ তারা বিপক্ষের সমালোচনার উত্তর কবিতার মাধ্যমে প্রদান করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে; যেমন কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) করেছিলেন।

তাঁর কাব্যচর্চার উদ্দেশ্য ছিলো দীনের প্রচার-প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন- ‘শা’য়িরুর রাসূল (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি) হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা)। তিনি তাঁর রীতি-পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন মহান খলীফা ‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযিযের (রহ) শিক্ষক। জীবনের সকল পর্যায়ে শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। এই ছাত্র যখন মুসলিম জাহানের খলীফা তখন একবার শিক্ষক তাঁকে একটি পত্র লেখেন এবং সেই পত্রটি ছিলো কবিতায়। তাতে তিনি প্রিয় ছাত্রকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দান করেন। সেই কবিতার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

بسم الذي أنزلت من عنده السور + والحمد لله أما بعد يا عمر
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر + فكن على حذر قد ينفع الحذر
واصبر على القدر المحتوم وارض به + وإن أذاك بما لاتشتهى القدر
فما صفا لامرئ عيش يسر به + الا سيتبع يوما صفوه كدر.

সেই সত্ত্বার নামে যাঁর নিকট থেকে সূরাসমূহ নাযিল হয়েছে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর হে 'উমার! তুমি জান না কি আসবে এবং কি আসবে না। অতএব তুমি সতর্ক হবে। সতর্কতা অবলম্বন উপকারে আসে। তুমি অবধারিত ভাগ্যলিপির উপর ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তা সে ভাগ্যলিপি তোমার অপ্রিয় জিনিসই নিয়ে আসুক না কেন। কোন মানুষের জীবন যত নির্বিঘ্ন ও খুশীর হোক না, কিন্তু তারপরেই এমন একদিন আসে যা তার স্বচ্ছ জীবনকে মলিন করে দেয়।'^{১৪}

তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যচর্চা শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ছিলো না, বরং অন্তর মাঝে যে তীব্র জ্বালা ও দুঃখবোধ ছিলো তাই তাঁকে কবিতা চর্চায় বাধ্য করতো। তাঁর কাব্যচর্চার ব্যাপারে আপত্তি করলে তিনি জবাব দিতেন, একটি ব্যাথা-কাতর ও রোগগ্রস্ত অন্তর যদি একটু শ্বাস গ্রহণ না করে তাহলে সে বাঁচবে কি করে?'^{১৫} আবু তাম্মাম তাঁর বিখ্যাত হামাসা গ্রন্থে তাঁর কিছু কবিতা সংকলন করেছেন। অনেকে তাঁর এমন আবেগধর্মী কবিতা চর্চার ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন, অন্তরের রুগীকে “লাদূদ (তিক্ত ঔষধ)” দিলে একটু উপশম হয়।'^{১৬}

ইবাদাত-বন্দেগী এবং দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্যভাব

হৃদয়ের এই দুঃখ ও যন্ত্রণাবোধ তাঁকে একজন বড় মাপের 'আবিদ ও মুত্তাকী মানুষ বানিয়ে দেয়। ইমাম নাওবী তাঁকে সত্যনিষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে এবং ইবন খাল্লিকান একজন 'আবিদ বলে উল্লেখ করেছেন।'^{১৭} তাঁর নামায ছিলো অত্যন্ত দীর্ঘ ও ঐকান্তিক। ইমাম মালিক বলেন, 'উবাইদুল্লাহ খুব দীর্ঘ নামায পড়তেন। কোন ব্যক্তির জন্য কখনো নামাযে তাড়াতাড়ি করতেন না। একবার ইমাম যায়নুল 'আবিদীন 'আলী (রহ) তাঁর কাছে আসেন। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে। তিনি তাঁর অভ্যাস মত নামায পড়েই চললেন, আর এদিকে 'আলী অপেক্ষা করতে লাগলেন। নামায শেষ হলে লোকেরা অভিযোগের সূত্র বললেন, আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র এসেছেন, আর আপনি এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন। বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন! কেউ জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে তাকে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে।'^{১৮}

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযিয (রহ) এই 'উবাইদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।'^{১৯} তাঁর চরিত্র ও আদত অভ্যাসের দ্বারা 'উমার দারুণ প্রভাবিত ছিলেন। জীবনের কোনো পর্যায়ে

১৪. সিয়রু আ'লাম আন নূবাল- ৪/৪৭৭; 'আসরুত তাবি'ঈন- ৮৪, ৮৯

১৫. আত তাবাকাত- ৫/১৮৪

১৬. তাবি'ঈন- ২৪৯

১৭. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল- আ'ইয়ান ১/২৭১; তাহযীব আল আসমা'- ৩১৩

১৮. সিয়রু আ'লাম আন নূবাল ৪/৪৭৮; তাযকিরাতুল হুফফাজ- ১/৭৯

১৯. তাহযীব আল কামাল- ১২/২১৩

তিনি 'উবাইদুল্লাহর কথা ভোলেন নি। খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনি বলতেন, 'উবাইদুল্লাহর একটি সাহচর্য এবং কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসা আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কসম! তাঁর একটি রাত আমি বাইতুলমালের একহাজার দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করতে প্রস্তুত। লোকেরা বললো : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি বাইতুলমালকে এতো কঠোরভাবে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এমন কথা বলছেন? জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর মতামত, সিদ্ধান্ত ও উপদেশের কল্যাণে একহাজারের পরিবর্তে হাজার হাজার দীনার বাইতুলমালে ঢোকাতে পারবো। তাঁর সাথে আলোচনায় বুদ্ধি সজীব হয়, অন্তরে প্রশান্তি আসে, দুঃখ-বেদনা দূর হয় এবং আচার-আচরণ পরিচ্ছন্ন হয়।^{২০}

মৃত্যু

তিনি হিজরী ৯৮ অথবা ৯৯ সনে মদীনায়ে ইত্তিকাল করেন।^{২১}

২০. ওয়াফাইয়াত আল- আ'ইয়ান ১/২৭১

২১. আত তাবাকাত- ৫/১৮৬; তাযকিরাতুল হুফফাজ- ১/৭৯

‘আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাস’উদ (রহ)

আবু ‘আবদির রহমান ‘আবদুল্লাহর পিতার নাম ‘উতবা ইবন মাস’উদ। এই ‘উতবা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদের (রা) ভাই। সুতরাং আমাদের আলোচ্য ‘আবদুল্লাহ এই মহান সাহাবী ‘আবদুল্লাহর (রা) ভতিজা। প্রখ্যাত তাবিঈ ‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আবদিল্লাহ ও ‘আওন ইবন ‘আবদিল্লাহর সম্মানিত পিতা।’

হযরত আবদুল্লাহ (রহ) রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। কিছু বর্ণনা এমনও আছে যে, সে সময় তাঁর বয়স এতোটুকু হয়েছিলো যে রাসূলে কারীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছিলেন এবং কিছু কিছু ঘটনা তাঁর স্মৃতিতেও ছিলো। এ কারণে ‘উকায়লী তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে এটা সঠিক নয়। তিনি রাসূলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এ কথা সত্য, তবে তখন একেবারেই শিশু ছিলেন। অধিকাংশ সীরাতে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত হলো, তিনি একজন তাবিঈ। এ কারণে ইবন সা’দ তাবিঈদের মধ্যে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন। ইবন ‘আবদিল বার যদিও আল ইসতি‘আব গ্রন্থে সতর্কতা হিসেবে সাহাবী হিসেবে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন, তথাপি তাঁর মতেও তিনি সাহাবী নন। তাই তিনি লিখেছেন : ‘উকায়লী তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটা একেবারেই ভুল। তবে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ তাবিঈদের একজন।’^১

আল মিয়যী বলেন,

أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأه وهو خا سي أو سداسي

তিনি নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেয়েছেন এবং দেখেছেন।

তখন তিনি পাঁচ অথবা ছয় বছরের শিশু।^২

অনেকে তাঁর সাহাবী হওয়ার স্বপক্ষে এ কথা বলেন যে, খলীফা হযরত ‘উমার (রা) তাঁকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। আর তিনি সাহাবী নন এমন কাউকে কোন পদে নিয়োগ দিতেন না। কিন্তু এ কোন অকাট্য দলীল নয়।

জ্ঞান ও মনীষা

মহান সাহাবী হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদের (রা) ব্যক্তি সত্ত্বার কল্যাণে তাঁদের গৃহটি ‘ইল্ম ও ‘আমলের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিলো। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উতবা এই পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। এ কারণে এ গুণের কিছু তিনিও লাভ করেন। তিনি মদীনার একজন

১. তাহযীব আল কামাল- ১০/৩১৭

২. আল ইসতী‘আব- ১/৩৯০

৩. তাহযীব আল কামাল- ১০/৩১৭

বিশিষ্ট আলিমে পরিণত হন। হাদীছ, ফিক্‌হ সহ বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞানে তাঁর শক্ত অধিকার ছিলো।

ইবন সা'দ বলেন,

كَانَ ثَقَفَهُ رَفِيعًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ وَالْفَتْيَا عَفِيفًا

‘তিনি উঁচু পর্যায়ের বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক ও প্রচুর ফাতওয়া দানকারী ফকীহ ছিলেন।’^৪

হাদীছ তিনি শোনেন ও বর্ণনা করেন তাঁর চাচা হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, হযরত ‘উমার, ‘আম্মার ইবন ইয়াসির, আবু যার, আবু হুরাইরা (রা) প্রমুখের নিকট থেকে। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : তাঁর ছেলে ‘উবায়দুল্লাহ, ‘আওন এবং হুমায়দ ইবন ‘আবদির রহমান, মু‘আবিয়া ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন জা‘ফার, আবু ইসহাক সুবায়ঈ, ‘আমির আশ-শা‘বী, ‘আবদুল্লাহ ইবন মু‘ঈদ যামানী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) ও আরো অনেকে।^৫

ওফাত

উমাইয়্যা খলীফা ‘আবদুল মালিকের খিলাফাতকালে বিশর ইবন মারওয়ান যখন ইরাকের ওয়ালী ছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। ইবন হিব্বানের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৭৪।^৬

সন্তানাদির দিক দিয়ে তিনি খুবই ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর এক ছেলে মদীনার একজন নামকরা আলিম এবং সাতজন ফকীহর অন্যতম ছিলেন। আরেক ছেলে ‘আওন তাকওয়া-পরহেযগারীতে বিখ্যাত ছিলেন।^৭

৪. আত তাবাকাত- ৫/৪২

৫. তাহযীব আত তাহযীব- ৫/৩১১; তাহযীব আল কামাল- ১০/৩১৮

৬. তাহযীব আল কামাল- ১০/৩১৮; আত তাবাকাত- ৫/১২৪

৭. তাহযীব আল আসমা’- ১/২৭৮

আবু ‘আবদির রহমান আস-সুলামী (রহ)

হযরত ‘আবদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবু ‘আবদির রহমান। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম হাবীব ইবন রুবাযিয় ‘আ আল-কুফী। বংশ সম্পর্ক বুঝানোর জন্য আল-সুলামী বলা হয়। তাঁর পিতা হাবীব সাহাবী ছিলেন।’

জ্ঞান ও মনীষা

কৃষায় শ্রেষ্ঠ কারী (কুরআন পাঠক) ও ‘আলিমের মধ্যে তিনি গণ্য ছিলেন।^১ কিতাবুল্লাহ আল কুরআন ছিলো তাঁর বিশেষ পঠিত বিষয়। কুরআনের একজন বিশিষ্ট কারী ও বড় ‘আলিম ছিলেন। কিরাআতের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন হযরত ‘উছমান, ‘আলী, ইবন মাস‘উদ (রা) ও নিজের পিতার নিকট থেকে। কুরআনের তাফসীরের জ্ঞান তিনি ঐ সকল ‘আলিমদের নিকট থেকে অর্জন করেন যাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ ও অধ্যাবসায়ের সাথে কুরআন অধ্যয়ন করেন। তাঁরা মাত্র দশটি আয়াত পাঠের পর সে সম্পর্কে সকল কথা না জানা পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতেন না। কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে সেই সকল আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ‘আমলও করতেন। তাই তিনি বলতেন, আমরা কুরআনের সাথে তার ওপর ‘আমল করাও শিখতাম। আমাদের পরে এমন সব লোক কুরআনের উত্তরাধীকারী হবেন যাঁরা কুরআনকে পানির মতো পান করবেন, কিন্তু তা তাঁদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছবে না।^২

কুরআনের দারস বা পাঠদান

তিনি কুরআনের দারসও দিতেন। কিন্তু সেজন্য কোন রকম বিনিময় গ্রহণ সমীচীন মনে করতেন না। ‘আমর ইবন হুরায়্যিছের ছেলেদেরকে তিনি কুরআন শিক্ষা দেন। ‘আমর হাওদাসহ একটি বাহনের উট তাঁর নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এই বলে ফেরত পাঠান যে, আমরা কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর গ্রন্থ) পাঠদানের বিনিময় গ্রহণ করিনে।^৩ একাধারে পূর্ণ ৪০ বছর মসজিদে কুরআনের দারস দিয়েছেন।^৪

ইমাম যাহাবী বলেন,

وتصَّدر للاقراء في خلافة عثمان إلى أن مات في سنة ثلاث وسبعين.

তিনি হযরত ‘উছমানের (রা) খিলাফাতের কাল থেকে নিয়ে হিজরী ৭৩

১. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৫৮; তাহযীব আল কামাল- ১০/৮০
২. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৫৮
৩. আত-তাবাকাত- ৬/১১৯
৪. প্রাগুক্ত- ৬/১২০
৫. তাহযীব আত তাহযীব- ৫/১৮৪

সালে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে কুরআনের পাঠ শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করেন।^৬

আবু ইসহাক আস-সুবায়'ঈ বলেন, “আবু আবদির রহমান চল্লিশ বছর মসজিদে কুরআন পাঠ শিক্ষা দেন।”^৭

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন হাফিজও ছিলেন।

ইবন সা'দ বলেন, **كان ثقة كثير الحديث**

“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের বর্ণনাকারী।”^৮

ইমাম যাহাবী বলেন, **كان ثقة رفيع المخل**

“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।”^৯

তিনি বহু শ্রেষ্ঠ সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত 'উমার, 'উছমান, 'আলী, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, হুযায়ফা, আবু মূসা আল আশ'আরী, আবুদ দারদা', আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{১০} আর যারা তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন ও তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম নাখা'ঈ, 'আলকামা ইবন মারছাদ, সা'দ ইবন 'উবায়দা, আবু ইসহাক আস-সুবায়'ঈ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, আবুল হুসায়ন আসাদী, 'আতা ইবন আস-সায়িব, ইসমা'ঈল ইবন 'আবদির রহমান আস-সুদী (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{১১}

ওফাত

উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের খিলাফাতকালে হিজরী ৭৩ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন। তবে তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। হিজরী ৭২, ৭৪, ৯২ ও ১০৫ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।^{১২}

মসজিদে তাঁর চাদর বিছানো ছিলো। অন্তিম রোগের সময় মসজিদেই অবস্থান করতেন। 'আতা' ইবন আস-সায়িব তাঁর নিকট গিয়ে বললেন : আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! যদি আপনি ঘরে আপনার বিছানায় যেতেন তাহলে ভালো হতো। তিনি বললেন : আমি এক

৬. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৫৮

৭. তাহযীব আল কামাল- ১০/৮০

৮. আত-তাবাকাত- ৬/১২০

৯. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/৫৮

১০. তাহযীব আল কামাল- ১০/৮০

১১. তাহযীব আত-তাহযীব- ৫/১৮৪; তাজকিরাতুল হুফফাজ- ১/৫৯

১২. তাহযীব আল কামাল- ১০/৮১

ব্যক্তির মুখে শুনেছি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন : বান্দা যতক্ষণ মসজিদে সালাতের অবস্থায় থাকে, সে যেন সালাতের মধ্যেই থাকে এবং ফেরেশতারা তাঁর জন্য দয়া-অনুগ্রহ কামনা করে দু'আ করতে থাকে। এজন্য আমি চাই মসজিদেই আমার মৃত্যু হোক।^{১৩}

‘আতা’ ইবন আস-সায়িব (রহ) বলেন, আবু আবদির রহমান যখন অন্তিম রোগ-শয্যায় তখন আমরা একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। আমাদের কেউ কেউ তাঁকে আশার বাণী শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট আশাবাদী। আশিটি রামাদান মাস আমি তাঁরই জন্য সাওম পালন করেছি।^{১৪}

১৩. আত তাবাকাত- ৬/১২১; তাৰি'ঈন- ৫৪৩

১৪. তাহযীব আল কামাল- ১০/৮০

‘আবদুর রহমান ইবন আল-আসওয়াদ (রহ)

হযরত ‘আবদুর রহমানের ডাকনাম আবু হাফস, মতান্তরে আবু বাকর। তাঁর পিতা হযরত আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (রহ) ছিলেন একজন বড় ‘আলিম, ‘আবিদ ও দুনিয়া বিরাগী তারি'ঈ। ‘আবদুর রহমানের বংশধারা নিম্নরূপ :

‘আবদুর রহমান ইবন আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ ইবন কায়স ইবন সালামান ইবন সাহ্ল ইবন বাকর ইবন ‘আওফ ইবন নাখা‘ঈ।’

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত ‘আবদুর রহমানের তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। তাই বলে জ্ঞান চর্চার সাথে যে তাঁর মোটেই সম্পর্ক ছিলোনা তা নয়। তাঁর পিতা হযরত আল-আসওয়াদ ছিলেন উম্মুল মু‘মিনীন হযরত ‘আযিশার (রা) একজন ভক্ত। ভক্তি-শ্রদ্ধার একটা গভীর সম্পর্ক ছিলো তাঁর সাথে। তাই এই সম্পর্কের সূত্রে শৈশবে ‘আবদুর রহমান হযরত ‘আযিশার (রা) কাছে যাওয়ার সুযোগ পান। তিনি নিজেই বলেন, যতদিন আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলাম, কোন অনুমতি ছাড়াই ‘আযিশার (রা) কাছে চলে যেতাম। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর অনুমতি নিতে থাকি।^১

হাদীছ

এই সম্পর্কের কারণে হযরত ‘আযিশার (রা) নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেতেন। সুতরাং হাদীছের জ্ঞান তিনি লাভ করেন এ সকল মনীষীর নিকট থেকে : হযরত ‘আযিশা, আনাস ইবন মালিক, ‘আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র, পিতা আল-আসওয়াদ, পিতার চাচা ‘আলকামা ইবন কায়স (রা); মুহাম্মাদ ইবন যায়দ ও আরো অনেকে। আর তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন : আবু ইসহাক সুবায়‘ঈ, আবু ইসহাক শায়বানী, মালিক ইবন মিজওয়াল, হারুন ইবন ‘আনতার, ‘আসিম ইবন কুলায়ব, আ‘মাশ, লায়ছ ইবন আবী মুসলিম, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ ব্যক্তি। হাদীছের চেয়ে তাঁর বেশি পাণ্ডিত্য ফিক্হ শাস্ত্রে। ইবন হাজার তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন সা‘দ তাঁকে কুফার ফহীহদের তৃতীয় তাবকায় (স্তরে) উল্লেখ করেছেন।^২

‘ইবাদাত বন্দেগী

জ্ঞানে যদিও পিতার মতো ছিলেন না, তবে কর্মে সত্যিকার অর্থে তাঁর উত্তরাধীকারী ছিলেন।

১. তারি'ঈন- ২৫১

২. আত-তাবাকাত- ৬/২০২

৩. তাহযীব আত-তাহযীব- ৬/১৪০; তাহযীব আল-কামাল- ১১/১০৬-১০৭

সারা রাত 'ইবাদাত করতেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন, 'আবদুর রহমান হজ্জ আদায় উপলক্ষ্যে আমাদের এখানে আসেন। তাঁর এক পায়ে কিছু কষ্ট ছিলো। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করতে থাকেন। 'ঈশার অজু দ্বারা ফযরের নামায পড়েন।^৪ সারা জীবন পৃথক পৃথক ভাবে ৮০ (আশি) বার 'উমরা আদায় করেন।^৫

ইমাম যাহাবী বলেন, এ কাজটি তিনি তাঁর পিতার মতোই করেন।^৬

রমযান মাসে নিজের গোত্রের ইমামাতি করতেন। তাদের সাথে তারাবীহ আদায় করতেন এবং তাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন শোনাতেন। 'ঈদুল ফিতরের রাতে গোত্রের লোকদের নিয়ে কিয়ামুল লায়ল করতেন। বলতেন : এটা হলো 'ঈদের রাত।^৭

কোন রকম পার্থক্য ছাড়াই সালাম প্রদান

তিনি সালাম দেওয়াকে ইসলামের নিদর্শন মনে করতেন। কোন রকম বাছ-বিচার ও পার্থক্য না করে মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সালাম দিতেন। সিনান ইবন হাবীব সুলামী বলেন, 'আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদের সাথে পুলের দিকে যাই। পথে যাদেরকে পান, তা ইহুদী হোক বা খৃস্টান সকলকে সালাম দেন। আমি বললাম, আপনি মুশরিককেও (অংশীবাদী) সালাম করেন? জবাব দিলেন সালাম একজন মুসলিমের নিদর্শন। এ কারণে আমি চাই, মানুষ জানুক যে আমি একজন মুসলিম।^৮

পুরাতন সম্পর্ক এবং মুরব্বীজনদের সম্পর্ক ও লৌকিকতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আবু আনাম (أبو عنام) ইবন তালাক বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের ও আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদে মধ্য সমবয়স্কের একটা সম্পর্ক ছিলো। 'আবদুর রহমান সে সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য সচেতন ছিলেন। এ কারণে যখন তিনি সফরে যেতেন অথবা সফর থেকে ফিরতেন তখন অবশ্যই আমাদেরকে সালাম করতেন।^৯

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে দারুণ মতভেদ আছে। শেষ বয়সে খিজাব লাগাতেন এবং "খায়"-এর চাদর গায়ে জড়াতেন। উল্লেখ্য যে, এক ধরনের বিশেষ রেশমী কাপড়কে 'খায়' বলে। খলীফা ইবন খায়্যাৎ বলেছেন, তিনি উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফাতকালে হিজরী ৯৮ অথবা ৯৯ সনে ইনতিকাল করেন।^{১০}

৪. তাহযীব আত-তাহযীব- ৬/১৪০

৫. তাহযীব আল-কামাল- ১১/১০৮

৬. ডায়কিরাতুল হুফাজ- ১/৫১

৭. আত তাবাকাত- ৬/২০৩; তাহযীব আল-কামাল- ১১/১০৮

৮. আত তাবাকাত- ৬/২০৩

৯. প্রাগুক্ত

১০. তাহযীব আল-কামাল- ১১/১০৮; তাবি'ঈন-২৫৩

আল হাকাম ইবন 'উতায়বা আল-কিন্দী (রহ)

হযরত আল হাকামের (রহ) ডাকনাম আবু 'উমার, মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ। পিতার নাম 'উতায়বা। তাঁর জীবনের শুরু দাস হিসেবে। তিনি 'আদী ইবন 'আদী আল-কিন্দী, মতান্তরে কিন্দার এক মহিলার দাস ছিলেন। পরে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে কূফায় আবাসন গড়ে তোলেন। তবে আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা ইবন নাহ্‌হাস আল-'ইজলী ও আমাদের আলোচ্য আল-হাকাম এক ব্যক্তি নন।' শেষোক্তজন কূফার কাজী ছিলেন। তাঁর থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি কূফার বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে আল হাফেজ, আল ফাকীহ এবং শায়খুল কূফা বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন সা'দ বলেন,

كان الحكم بن عتيبة ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث

আল হাকাম ইবন 'উতায়বা ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবী, ফকীহ, উঁচু পর্যায়ের 'আলিম ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক।^১

বহু শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাঁর জ্ঞান ও মনীষার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইবন 'উয়ায়না বলেন,

ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد

কূফায় আল হাকাম ও হাম্মাদের মতো আর কেউ ছিলেন না।^২

তাঁর যুগের সকল 'আলিম তাঁর জ্ঞান ও মনীষাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

মুজাহিদ ইবন রুমী বলেন,

ما كنت أعرف فضل الحكم إلا إذا اجتمع علماء الناس في مسجد من نظر إليهم عيال عليه

আমি আল হাকামের প্রকৃত মর্যাদা জানতাম না। কিন্তু যখন মিনার মসজিদে বড় বড় 'আলিম সমবেত হতেন তখন দেখতাম সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল।^৩

১. তাহযীব আল-কামাল- ৫/৯৪

২. আভ-তাবাকাত- ৬/২৩১

৩. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১১৭

৪. প্রাগুক্ত

হাদীছ

তিনি বহু সাহাবী ও তারিখদের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হুজায়ফা, যায়দ ইবন আরকাম, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওফ (রা) এবং তারিখদের মধ্যে কাজী গুরায়হ, ইবন আবী হাযিম, মূসা ইবন তালহা, ইয়াযীদ ইবন গুরায়ক তায়মী, 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ, 'আতা', তাউস, কাসিম ইবন মুখায়মারা, মূস'আব ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল কারাজী, ইবন আবী লায়লা (রহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^৫

আল আ'মাশ, মানসূর, আবু ইসহাক আস-সুবায়'ঈ, আবু ইসহাক আশ শায়বানী, কাতাদা, আবান ইবন সালিহ, হাজ্জাজ ইবন দীনার, আওয়া'ঈ, মিস'আর, শু'বা, আবু আওয়ানা, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, আবু বাকর ইবন 'আয়্যাশ (রহ) প্রমুখের মতো 'আলিম তারিখ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন।^৬

ফিকহ

ইবরাহীম নাখা'ঈ (রহ) ছিলেন ফিকহর অন্যতম ইমাম। আল হাকাম ছিলেন তাঁর বিশেষ সহচরদের একজন।^৭ এই সাহচাৰ্য আল হাকামকে কূফার একজন বড় ফকীহর আসনে অধিষ্ঠিত করে।

লায়ছ ইবন সুলায়ম বলেন,

كَانَ الْحَكَمُ أَفْقَهُ مِنَ الشَّعْبِ

আল হাকাম শা'বীর চেয়েও বড় ফকীহ ছিলেন।^৮

ইমাম আশ শা'বীর (রহ) পরে কূফার জ্ঞানের উচ্চাঙ্গনটি তাঁরই অধিকারে আসে। ইসরাঈল বলেন, আমি আল হাকামকে সর্বপ্রথম চিনলাম আশ শা'বীর মৃত্যুর দিন। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি একটি মাসয়ালা জানার জন্য আসে। লোকেরা তাকে বললো, তুমি আল হাকামের কাছে যাও।^৯

তিনি একজন বড় 'আবিদও ছিলেন। আব্বাস আল মুক্কযী বলেন, তিনি ছিলেন 'আবিদ ও নৈতিকগুণে গুণাবিত মানুষ। সুন্নাহের আনুগত্য ও অনুসরণের ব্যাপারে দারুন গুরুত্ব দিতেন।^{১০}

আল 'ইজলী বলেন,

৫. তাহযীব আল-কামাল- ৫/৯৫

৬. তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২৩৩; তাহযীব আল-কামাল- ৫/৯৫

৭. তাহযীব আত-তাহযীব- ২/৪৩৩

৮. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১১৭

৯. আত-তাবাকাত- ৬/২৩১; তারিখ-ঈন- ৯৯

১০. তাহযীব আত-তাহযীব- ২/৪৩৩

“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ়, সুস্বভাবের আনুগত্য ও অনুসরণকারী।”^{১১}

তাঁর এমন জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতার কারণে তিনি মানুষের অন্তরে একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুগীরা বলেন,

كَانَ الْحَكَمُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَخْلَوْا لَهُ سَارِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي إِلَيْهَا

আল হাকাম যখন মদীনায় আসতেন তখন মানুষ নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্তম্ভটি তাঁর জন্য খালি করে দিত। যাতে তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতে পারেন।^{১২}

মুজাহিদ ইবন রুমী বলেন

رَأَيْتُ الْحَكَمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَعِلْمَاءُ النَّاسِ عِيَالٌ عَلَيْهِ

আমি আল হাকামকে মিনার মসজিদে খায়ফ-এ দেখেছি, মানুষের ‘আলিমগণ যেন তাঁর উপর নির্ভরশীল।^{১৩}

মৃত্যু

তিনি হিজরী ১১৫, মতান্তরে ১১৪ সনে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ হিজরী ১১৩ সনের কথাও বলেছেন।^{১৪}

১১. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১১৭

১২. প্রাগুক্ত; তাহযীব আল-কামাল- ৫/৯৬

১৩. তাহযীব আল-কামাল- ৫/৯৬

১৪. প্রাগুক্ত- ৫/৯৭; তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১১৭

যায়দ ইবন আসলাম (রহ)

হযরত যায়দ ইবন আসলামের (রহ) ডাকনাম 'আবদুল্লাহ। তিনি হযরত 'উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) দাসত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মূলত তিনি এমন এক মহান ও মর্যাদাবান ব্যক্তির দাস ছিলেন যার অল্পদিনের সাহচর্যপ্রাপ্ত মানুষও 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের বাস্তবরূপ ধারণ করেছিলেন। আর যায়দ তো ছিলেন তাঁর একান্ত দাস। তিনি তাঁর মনিবের চেয়ে মনিব-পুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের জ্ঞানের ঋণাধারা থেকে বেশি অর্জন করেন। তাঁর সংগ ও সাহচর্যের কল্যাণে জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত হন এবং মদীনার 'আলিমদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন।

ইবন হাজার লিখেছেন,

كان من أهل الفقه و العلم

তিনি ফিক্হ ও জ্ঞানের অধিকারীদের একজন।^১

ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও ফাকীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (তায়কিরাতুল হফফাজ, খ. ১, পৃ. ১৩২)

কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ

কুরআন, হাদীছ ফিক্হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর পূর্ণ পারদর্শিতা ছিলো। তিনি কুরআনের তাফসীরের একজন বড় 'আলিম ছিলেন।

ইবন হাজার লিখেছেন,

كان عالماً بتفسير القرآن

তিনি তাফসীরুল কুরআনের 'আলিম ছিলেন।^২

হাদীছেও তাঁর জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক ছিলো। ইবন সা'দ লিখেছেন,

كان ثقة كثير الحديث

তিনি বহু হাদীছের ধারক-বাহক বিশ্বস্ত রাবী।^৩

সাহাবীদের মধ্যে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আয়িশা সিদ্দিকা, রাবী'আ ইবন 'আব্বাদ ওয়ায়িলী, সালামা ইবন আকওয়া এবং আবু হুরায়রা (রা); তাবিঈদের মধ্যে আবু সালিহ আস-সাম্মান, 'আতা' ইবন ইয়াসার,

১. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/৩৯৬

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

হুমরান ইবন আবান, 'আলী ইবন হুসায়ন, বিসর ইবন সাঈদ, আ'রাজ, 'আবদুর রহমান ইবন দা'লা, 'আবদুর রহমান ইবন সাঈদ, কা'কা ইবন হাকীম, 'আয়্যাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সা'দ, উম্মুদ দারদা আস-সুগরা', 'আমর ইবন রাফি', আমর ইবন মু'আয (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন।^৪

তাঁর দু'পুত্র 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান এবং উসামা, মালিক ইবন আনাস, ইবন 'আজলান, ইবন জুরায়জ, সুলায়মান ইবন হিলাল, হাফস ইবন মায়সারা, দাউদ ইবন কায়স, আল-ফাররা', আইউব আস-সিখতিয়ানী, জারীর ইবন হাযিম, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার, ইবন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন আবী কাছির (রহ) প্রমুখ তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র।^৫

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিলো। ইমাম যাহাবী, ইমাম নাওবী, আল্লামা ইবন হাজার (রহ) সকলে তাঁকে মদীনার ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।^৬

দারসের আসর

মদীনার মাসজিদে নববীতে হযরত যায়দের দারসের আসর বসতো। সেখানে বড় বড় ফকীহ ও মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতেন। বিশিষ্ট তাবি'ঈ আ'রাজ (রহ) এই আসরের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বর্ণিত আছে হযরত যায়দ ইবন আসলামের (রহ) আসরে চল্লিশজন বিদ্বৎ ফকীহ শরীক হতেন। তাঁদের মধ্যে এতোখানি পারস্পরিক সহমর্মিতা ছিলো যে, প্রত্যেকের অর্থ-সম্পদ অন্যের প্রয়োজনের জন্য নিবেদিত ছিলো। দারসের এই আসনে কোন হাদীস নিয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক ও ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট করা হতো না।^৭

ইমাম যায়নুল 'আবিদীন (রহ) নিজের পারিবারিক আসর ছেড়ে এই আসরে অংশগ্রহণ করতেন। এতে নারফি' ইবন জুবায়র (রহ) প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি আপনার পারিবারিক আসর ছেড়ে 'উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) দারসের আসরে বসেন? জবাবে তিনি বলেন, মানুষ এমন আসরেই বসে যেখান থেকে তার দীনের কোন ক্ষয়দা হয়।^৮

গান্ধীর্ষ

হযরত যায়দ (রহ) যদিও একজন দাস ছিলেন তবুও তাঁর গান্ধীর্ষ, জ্ঞান ও মনীষার কারণে তাঁর সামনে এলে সকলের উপর একটা শ্রদ্ধামূলক ভীতির প্রভাব পড়তো। ইবন 'আজলান বলেন, আমার মধ্যে আর কাউকে দেখে এতোখানি ভয় কাজ করতো না যতখানি করতো যায়দ আসলামকে দেখে। তাঁর নিকট প্রশ্ন করার হিম্মতও কারো হতো না। যখন তাঁর ইচ্ছা হতো নিজেই হাদীছ বর্ণনা করতেন। তারপর যখন চূপ হয়ে যেতেন কেউ আর প্রশ্ন করার

৪. তাহযীব আল কামাল- ৬/৪২৬

৫. প্রাগুক্ত

৬. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/৩৯৫; তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩২

৭. তাহযীব আল কামাল- ৬/৪২৬; তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩২; তাহযীব আল আসমা'- ১/২০০

৮. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১৩২

সাহস করতো না।^৯ তিনি সবসময় বলতেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহকে ভয় করো, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে- তা তাদের যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।^{১০}

সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব

তাঁর প্রতি মানুষের একটা ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ থাকার সাথে সাথে তিনি ছিলেন সর্বজন প্রিয় এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মানুষের অন্তরের গভীরে ছিলো তাঁর স্থান। তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান বলেন, আমার পিতা আমাকে বিশেষ কোন কাজে তাঁর কোন বন্ধু ও সঙ্গী-সাথীর নিকট পাঠাতেন, তাঁরা আদর করে আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে বলতেন, আল্লাহর কসম! তোমার পিতা আমার সন্তান ও পরিবারবর্গের চেয়েও আমার অধিক প্রিয়। যদি আল্লাহ এ দুটির মধ্যে কোন একটি উঠিয়ে নিতে চান এবং সেক্ষেত্রে আমাকে নির্বাচনের অধিকার দেন তাহলে আমি যায়দের জীবন ও তাঁর নিরাপত্তার বিপরীতে নিজের সন্তানাদি ও পরিবার উঠিয়ে নেওয়া পছন্দ করবো।^{১১} আবু হাযিম দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে যায়দের মৃত্যুর দিন দেখাবেন না। তিনি ছাড়া আমার নিজ সন্তা, আমার দীন-ধর্মের জন্য কোন পছন্দনীয় ও কল্যাণময় ব্যক্তিত্ব অবশিষ্ট নেই।^{১২}

নৈতিক চরিত্র

জ্ঞানগত পূর্ণতার সাথে সাথে নৈতিক গুণাবলী দ্বারাও উৎকর্ষমণ্ডিত ছিলেন। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, 'তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ তাবি'ঈ ছিলেন।'^{১৩} এ কথা প্রচলিত ছিলো যে, তাঁকে একনজর দেখলে মানুষের মধ্যে ইবাদাতের শক্তি সৃষ্টি হতো। আবু হাযিম বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ভালো করে জান, আমি যায়দকে এজন্য দেখি যে, তাঁকে দেখলে আমার মধ্যে তোমার ইবাদাতের শক্তি সৃষ্টি হয়। তাঁকে একনজর দেখার প্রভাব যদি এই হয় তাঁর সাথে সাক্ষাত ও কথা বলার প্রভাব কী হতে পারে?^{১৪}

ওফাত

হিজরী ১৩৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।^{১৫}

৯. তাহযীব আত তাহযীব- ৩/৩৯৬

১০. তাহযীব আল কামাল- ৬/৪২৭

১১. প্রাগুক্ত

১২. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৩২

১৩. তাহযীব আল আসমা'- ১/২০০

১৪. তাহযীব আল কামাল- ৬/৪২৭

১৫. প্রাগুক্ত; তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১৩৩

‘আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ (রহ)

হযরত ‘আবদুর রহমানের ডাকনাম ‘আবু মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা বিখ্যাত তাবি'ঈ আল কাসিম, পিতামহ মুহাম্মাদ এবং প্রপিতামহ প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকর সিদ্দিক (রা)। তাঁর বংশধারা এরূপ : ‘আবদুর রহমান ইবন আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন ‘উছমান ইবন ‘আমির ইবন ‘আমর ইবন কা'ব ইবন সা'দ ইবন তায়ম ইবন মুররা। তাঁর মায়ের নাম কারীবা। তিনি হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন আবী বাকর সিদ্দিকের (রা) কন্যা। পিতৃ ও মাতৃ উভয় কূলের দিক দিয়ে তাঁর ধমনীতে হযরত সিদ্দিকে আকবরের (রা) রক্ত প্রবাহিত ছিলো। ‘আবদুর রহমান হযরত ‘আয়িশার (রা) জীবদ্দশায় অনুগ্রহণ করেন।’

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত ‘আবদুর রহমানের সম্মানিত পিতা আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ জ্ঞান, মনীষা ও তাকওয়া-পরহেযগারীর দিক দিয়ে একজন মর্যাদাবান তাবি'ঈ ছিলেন। সুতরাং পৈত্রিকসূত্রে উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য তিনি লাভ করেন।

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ব, মর্যাদা, সত্যনিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে একমত।^১ ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, আল্লাহভীরু ইমাম ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী বলেছেন।^২ ইবন হিব্বান তাঁকে ফিক্হ, ‘ইলম, সততা, মুখস্ত শক্তি ও দৃঢ়তায় মদীনাবাসীদের অন্যতম নেতা বলে গণ্য করেছেন।^৩

হাদীছ

তিনি মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন।

ইবন সা'দ লিখেছেন,

كان ورعاً كثير الحديث

তিনি ছিলেন আদ্বাহভীরু ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক।^৪

ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে ইমাম ও হুজ্জাত (প্রমাণ) বলেছেন।^৫

-
১. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১২৬; তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৬
 ২. তাহযীব আল আসমা'- ১/৩০১
 ৩. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১২৬
 ৪. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫৪
 ৫. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৭; তাহযীব আল আসমা'- ১/৩০১

হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন যে সকল বড় তাবি'ঈর নিকট থেকে তাঁদের কয়েকজন হলেন : পিতা আল কাসিম, সা'ঈদ ইবন আল মুসায়্যিব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), নাকি', মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, সালিম মাওলা 'উমার (রহ) ও আরো অনেকে।^১ সাম্মাক ইবন হারব, ইমাম যুহরী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আজলান, হিশাম ইবন 'উরওয়া, মানসূর ইবন যাযান, ইয়াহইয়া ইবন মানসূর, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল আনসারী, মুসা ইবন 'উকবা, আইউব আস-সিখতিয়ানী, হুমায়দ আত-তাবীল, মালিক, শু'বা, হাম্মাদ ইবন সালামা, ছাওরী, আওয়া'ঈ, ইবন জুরায়জ, লায়ছ (রহ) প্রমুখের মতো হাদীছের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।^২

তাকওয়া পরহেযগারী এবং দুনিয়া বিরাগী মন-মানসের জন্য সকলের নিকট বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন। ইবন সা'দ, ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার, ইমাম নাওবী (রহ) সহ সকল সীরাতে বিশেষজ্ঞ তাঁর দুনিয়া বিরাগী মনোভাব এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর ব্যাপারে একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন। মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ বলেন, “আমি মদীনায় তাঁর চেয়ে ভালো কোন মানুষ দেখিনি।”^৩

ইবন 'উয়ায়না তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোত্তম মানুষ বলে জানতেন।^৪

আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফার আল মানসূরের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। একবার তিনি খলীফা মানসূরের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি 'আবদুর রহমানকে অনুরোধ করলেন কিছু উপদেশমূলক কথা শোনানোর জন্য। 'আবদুর রহমান বললেন : আমি যা দেখেছি তাই বলবো, না যা শুনেছি তাই? বললেন : যা দেখেছেন তাই বলুন। তিনি বললেন, 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) বারোটি ছেলে রেখে যান। আর তাদের জন্য রেখে যান মাত্র সতেরটি দীনার। তার থেকে কাফনের জন্য পাঁচ দীনার, কবরের জায়গার জন্য দু'দীনার খরচ হয় এবং বাকী দশ দীনার তাঁর সকল সন্তানের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকে মাত্র সতেরটি দিরহাম করে পায়।

অন্যদিকে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও বারোটি ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করলে প্রত্যেকে পায় দশ লক্ষ দিরহাম করে। আমি 'উমারের এক ছেলেকে একদিনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একশো' ঘোড়া দান করতে যেমন দেখেছি, তেমন দেখেছি হিশামের এক ছেলেকে মানুষের নিকট থেকে সাদাকা (দান) গ্রহণ করতে।^৫

৬. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১২৬

৭. তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৬

৮. প্রাগুক্ত- ১১/৩৩৭; তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫৫

৯. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫৪

১০. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১২৬

১১. ইবন আল-জাওযী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয- ৩৩৮; তাবি'ঈদের জীবনকথা- ২/২৫

ওফাত

তাঁর মৃত্যু সন ও স্থান নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে তিনি হিজরী ১২৬ সনে শামে ইনতিকাল করেন। খলীফা ইবন খায়্যাতে'র বর্ণনা মতে সন একই, তবে মৃত্যুর স্থান মদীনা। কোন কোন বর্ণনায় হিজরী ১৩১ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা এসেছে।^{১২}

‘আবদুর রহমান ইবন আবিয যানাদ বলেন, আল-ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ‘আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার পর আবুয যানাদ, ‘আবদুর রহমান ইবন আল কাসিম, মুহাম্মাদ ইবন আল মুনকাদির ও রাবী‘আ- এই চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিমাশ্কে ডেকে পাঠান। তাঁরা খলীফার আমন্ত্রণে সেখানে যান এবং ‘আবদুর রহমান শামের আল-ফুদাইন মতাজ্জরে হাওরান নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।^{১৩}

১২. তাহযীব আত তাহযীব- ৬/২৫৫

১৩. তায়কিরাতুল হুফফাজ- ১/১২৬; তাহযীব আল কামাল- ১১/৩৩৩-৩৩৭

ছাবিত ইবন আসলাম আল-বুনানী (রহ)

ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :^১

ثابت بن أسلم الامام الحجة القدوة أبو محمد البناني البصري.

অর্থাৎ আসলামের পুত্র ছাবিত একজন ইমাম, হুজ্জাত (প্রমাণ) ও আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি, যাঁর ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ আল বুনানী এবং তিনি বসরার অধিবাসী।

বুনানা কুরায়শ বংশের বানু সা'দ এর একটি শাখা।^২ তিনি ইসলামের বিধি-বিধানের নিষ্ঠাবান অনুসারী একজন 'আলিম তাবি'ঈ।

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি বসরার বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল হাম্বলী জ্ঞান-মহত্ব ও ইবাদাত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন।^৩

হাদীছ

তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) বিশেষ সংগী-সাথীদের একজন ছিলেন। তাঁর একান্ত সাহচর্য ছাবিতকে হাদীছের একজন বড় হাফিজে পরিণত করে। ইবনুল মাদীনী'র মতে তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো'।^৪ তিনি বহু সাহাবী ও তাবি'ঈ'র নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। সাহাবীদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল আল মুযানী, 'আমর ইবন আবু সালামা, শু'আয়ব, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ, আবু রাফি' আস-সায়িগ (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^৫

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : হুমায়দ আত-তাবীল, জারীর ইবন আবী হাযিম, মা'মার, শু'বা, হাম্মাম, আবু 'আওয়ানা, জা'ফার ইবন সুলায়মান, সালমান, দাউদ ইবন আবী হিন্দ, 'আতা ইবন আবী রাবাহ,

১. তায়কিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/১২৫

২. তাহযীব আল কামাল- ৩/২২৩

৩. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৬১

৪. তাহযীব আত তাহযীব- ২/২; তায়কিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/১২৫

৫. তাহযীব আত তাহযীব- ২/২; তাহযীব আল কামাল- ৩/২২৩

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উবায়দ, হাম্মাদ ইবন যায়দ, হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ) প্রমুখ।^৬

সেকালে একদল মানুষ ছিলেন যারা কিসসা-কাহিনী শুনিতে মানুষকে দীনের বিধি-বিধানের দিকে আকৃষ্ট করতেন। তাঁদেরকে “الفصّاص” (আল-কুসাসাস) বলা হতো। অর্থ : কিসসা-কাহিনী বলিয়ে মানুষ। ছাবিতও ছিলেন এই দলের একজন। হাম্মাদ ইবন সালামা বলেন, আমি শুনতাম এই ‘আল-কুসাসাস’ শ্রেণীর মানুষ হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ করতে তেমন সক্ষম হয় না। তাই একবার আমি ছাবিতকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছু হাদীছের সনদ ওলট-পালট করে একজনের নামের স্থলে আরেকজনের নাম বসিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় বর্ণনা করি। কিন্তু তিনি তা ধরে ফেলেন এবং সবগুলো হাদীছ বিস্মৃত সনদে উপস্থাপন করেন। এই বর্ণনা হাদীছে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে।^৭

আল্লাহ্‌ভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি

জ্ঞান ও মনীষার জন্য প্রসিক্কির চেয়েও তিনি তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির জন্য বেশি খ্যাতিমান ছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁর দীনদারী ও নৈতিক গুণবলীর জন্য তাঁর প্রশংসা করতেন। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলতেন, প্রতিটি ভালো কাজের একজন উপযুক্ত ব্যক্তি থাকে, শুভ ও কল্যাণের চাবি হলেন এই ছাবিত।^৮

বাকর ইবন ‘আবদিদ্বাহ বলতেন,

من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فليُنظر إلى ثابت البناني فما ادر كنا
الذي هو أعبد منه.

যে ব্যক্তি তার যুগের সবচেয়ে বড় আবিদ ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন ছাবিত আল বুনাণীকে দেখে। আমরা তাঁর চেয়ে বড় কোন আবিদ ব্যক্তিকে দেখিনি।^৯

আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা

তিনি একজন চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ প্রেমিক মানুষ ছিলেন। প্রেমাস্পদের সাথে মিলন কামনায় সবসময় বেদনা কাতর ও ব্যাকুল থাকতেন। অন্তর্জ্বালায় সর্বদা অশ্রুধারা বইতো। অস্থির ভাবে কাঁদতেন।

হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন,

رأيت ثابتاً يبكي حتى تختلف أضلاعه.

৬. প্রাপ্ত

৭. তাহযীব আল কামাল- ৩/২২৬

৮. প্রাপ্ত; আত-তাবাকাত- ৭/৩৩

৯. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১২৫

“আমি ছাবিতকে এতো অস্থিরভাবে কাঁদতে দেখেছি যে, তাঁর পাজরের হাড়গুলো যেন ওলট-পালট হয়ে যেত।”^{১০}

অতিরিক্ত কান্নার কারণে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেন।

জা'ফার ইবন সুলায়মান বলেন, অতিরিক্ত কান্না-কাটির কারণে ছাবিত অন্ধ হওয়ার উপক্রম হন। এ বিষয়ে তাঁর সংগে কথা বললে তিনি বলেন,

ما خيرهما إن لم تبكيا و أبي أن يعالج.

কান্নার কারণে চোখ থেকে যদি অশ্রু না ঝরে তাহলে সেই চোখ দু'টির কল্যাণ কিসে? তিনি চোখের চিকিৎসা করাতেও অস্বীকৃতি জানান।^{১১}

‘ইবাদাত-বন্দেগী

তাঁর জীবনের সবচাইতে প্রিয় কাজ ছিলো ‘ইবাদাত-বন্দেগী করা। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তির মধ্যে দুনিয়ার সকল শুভ ও কল্যাণের সমাবেশ ঘটালেও সে যদি সালাত ও ছাওমের পাবন্দ না হয় তাহলে কখনো ‘আবিদ হতে পারবে না। যে মাসজিদের পাশ দিয়ে যেতেন, একটু থেমে সেখানে অবশ্যই নামায আদায় করে নিতেন। তাহাজ্জুদের নামাযে বার বার এ আয়াতটি আওড়াতেন আর ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন।^{১২}

أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পরে শত্রু হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষের অকৃতিতে? (সূরা আল-কাহাফ : ৩৭)

শু'বা বলেন,

كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر.

ছাবিত আল বুনা'নী একদিন ও একরাতে কুরআন খতম করতেন এবং সিয়ামুদ দাহর অর্থাৎ সারা বছর সাওম পালন করতেন।^{১৩}

আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীনের দরবারে তাওবা ও ইসতিগফার করতে খুবই ভালোবাসতেন। বলতেন আমি কোন গুনাহ কবীরা করে ফেলি এবং তাওবা-ইসতিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে তা মাফ করিয়ে নেই, এটা আমার বেশি পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে আমার দ্বারা সাগীরা গুনাহ অনুষ্ঠিত হোক, আর আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করানোর তাওফীক না হোক, এ আমার মোটেই পছন্দনীয় নয়।^{১৪}

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. আত-তাবাকাত- ৭/৩

১৩. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১২৫

১৪. আত-তাবাকাত- ৭/৩

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে তার কর্মের উপর তার স্পষ্ট প্রভাব পড়ে।^{১৫}

হাম্মাদ ইবন সালামা বলেন, ছাবিত বলতেন-

اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري.

হে আল্লাহ! কবরে যদি তুমি কাউকে সালাত আদায় করার অনুমতি দান কর,

তাহলে আমাকেও আমার কবরে সালাত আদায়ের অনুমতি দিবে।^{১৬}

বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর দু'আ কবুল হয়। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে কবরে সালাত আদায় করা অবস্থায় দেখেছেন।^{১৭}

মৃত্যু

তিনি হিজরী ১২৩ মতান্তরে ১২৭ সনে ইনতিকাল করেন। ৮০ (আশি) বছরের উপরে জীবন লাভ করেন।^{১৮}

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. তাহযীব আল কামাল- ৩/২২৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. তায়কিরাতুল হুফাজ- ১/১২৫

হারিম ইবন হায়্যান আল 'আবদী (রহ)

হারিম (রহ)-এর পিতার নাম- হায়্যান, বসরার অধিবাসী আযুদ গোত্রের সন্তান। তাঁর নামের সাথে আল 'আবদী শব্দটি যুক্ত করে কী বুঝানো হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে অনেকে মনে করেন, আল 'আবদ অর্থ দাস এবং আল্লাহর দাসত্ব তাঁর মধ্যে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। তাই আল 'আবদী' বলে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদ ও যাহিদ (ইবাদাতকারী ও দুনিয়া বিরাগী) মানুষ।' অনেকে তাঁকে শিশু সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, তিনি ছিলেন উঁচু পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ তাবি'ঈদের একজন।

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) জ্ঞান চর্চার জগতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাস বিমূখ আল্লাহ প্রেমিক মানুষ। অথবা বলা যায়, তাঁর আধ্যাত্মিকতার জ্যোতি তাঁর অর্জিত জ্ঞানের উজ্জল্যকে ম্লান করে দেয়। এ কারণে সীরাত ও আসমাউর রিজালের গ্রন্থসমূহে তাঁর জীবনকথা খুব বেশি পাওয়া যায় না। ইবন সা'দের তাবাকাত সামান্য কিছু পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর প্রেমে এতই রিভোর থাকতেন যে, অনেকে তাঁর পরিচয় দিতে এ রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন :

الهائم الحيران، القائم العطشان، عاش محباً لله ولهان مشتاقاً لفقائه عزوجل.
“তিনি ছিলেন প্রেমে মগ্ন দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মত।
আল্লাহর প্রেমে সারাটি জীবন বিষণ্ণভাবে, তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী হিসেবে কাটিয়েছেন।”

‘ইলমে তাসাউফের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের যে অবস্থাকে “ফানাকিল্লাহ” বলা হয়, তিনি সেই স্তরের মানুষ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন :

كان له فضل و عبادة.

“তাঁর ছিল অনেক গুণ-মহাত্ম্য ও 'ইবাদাত-বন্দেগী।”^১

ইসলামী জ্ঞান চর্চার জগতে তাঁর পদচারণা তেমন একটা নেই, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে একেবারে 'ইলম তথা জ্ঞান বিমূখ ছিলেন তা বলা যাবে না। অনেকে বলেছেন, তিনি আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব ও 'উহমান ইবন আফফানের (রা) নিকট থেকে হাদীছ শুনছেন এবং বর্ণনাও করেছেন।^২

১. 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ২৫০
২. সিয়রুত তাবি'ঈন, পৃ. ৫০৫
৩. 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ২৫০

হাসান আল বসরী (রহ) যদিও হারিম (রহ)-এর মত দুনিয়া বিরাগী তাপস ছিলেন, তবে জ্ঞানের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি হারিম (রহ)-এর নিকট থেকে হাদীছ শুনছেন এবং তাঁর সূত্রে তা বর্ণনাও করেছেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবী (বর্ণনাকারী)।^৪

আল্লাহর ভয়

তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় যে কি পরিমাণ ছিল তা বুঝা যায় তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে। তেমন কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো :

হারিম (রহ)-এর কিছু নির্বাচিত বন্ধু ও সংগী ছিলেন। ইতিহাস তাঁদের সততা ও আল্লাহ ভীতির সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁদের একজন হলেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী হামামা (রা)। একদিন রাতে হারিম (রহ) গেলেন হামামার (রা) সাথে সাক্ষাত করতে। হামামা (রা) আন্তরিকভাবে ও সম্মানের সাথে তাঁকে স্বাগতম জানালেন। দুই বন্ধু একসাথে রাত্রি যাপন করলেন। হামামা (রা) সারা রাত কান্নাকাটি করে অতিবাহিত করেন, কিন্তু হারিম (রহ) তাঁকে কিছুই বললেন না। সকালবেলা তিনি বললেন, হামামা! রাতে আপনি এত কান্নাকাটি করলেন কেন?

হামামা (রা) জবাব দিলেন : রাতে আমার সেই সকালের কথা মনে হলো, যখন কবরসমূহ ফেটে যাবে, তার থেকে কবরবাসীরা বেরিয়ে পড়বে এবং আকাশের নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। বন্ধু! সে কথা চিন্তা করে আমি কেঁদেছি।

এর কিছুক্ষণ পর দু'বন্ধু বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। বাজারটির নাম ছিল- 'আর রায়হান'। পথে তাঁরা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে প্রচুর দু'আ করলেন। পথে তাঁরা এক কর্মকারের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, লোহা আগুনে পুড়িয়ে অঙ্গার করা হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁরা বার বার আওড়াতে থাকেন :

اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচান, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচান।”^৫

একবার হারিম ইবন হায়্যান (রহ) তাঁর আরেক বন্ধু প্রখ্যাত তাপস ও দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তিত্ব 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির আত-তামীমীর (রহ) সাথে হিজায়ের দিকে যাত্রা করেন। পথে তাঁরা বেশি বেশি আল কুরআন পড়া ও বুঝার চেষ্টা করতে থাকেন। পথে ঘন ও লম্বা গাছের একটি বাগান পড়লো, যার ছায়াও ছিলো দীর্ঘ। তাঁরা ক্লান্তি দূর করার জন্য সেই ছায়ায় বসলেন এবং সালাতও আদায় করলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা গাছ নিয়ে ভাবতে লাগলেন এবং তাঁদের

৪. তাবি'ঈন, পৃ. ৫০৫

৫. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ-২, পৃ. ১১৯

উট দুটিও মাথা উঁচু করে গাছের পাতা খেতে থাকলো। এক সময় হারিম (রহ) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমিরকে (রহ) লক্ষ্য করে বলেন : ওহে ইবন 'আমির! তুমি কি এই সকল গাছের মত একটি গাছ হতে চাইবে?

ইবন 'আমির বললেন : না, আব্দাহর কসম, আমি তা চাই না। আমরা আব্দাহর সেই ব্যাপক ও প্রশস্ত দয়া-অনুগ্রহের প্রত্যাশী হবো।

দু'জনের মধ্যে হারিম (রহ) ছিলেন বেশি জ্ঞানী এবং আব্দাহর জ্ঞানে বেশি পারদর্শী। তিনি বললেন, ওহে আব্দাহর বান্দা, আব্দাহর কসম! আমার তো প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে, এই গাছ গুলির মত একটি গাছ হওয়ার।

ইবন 'আমির হাসতে হাসতে বললেন : কেন?

হারিম বললেন : তাহলে আমাদের এই বাহন উট খেয়ে ফেলবে এবং লেদী হিসেবে ত্যাগ করবে। কিয়ামাতের দিন আমাকে আর হিসাব-কিতাবের মুখোমুখি হতে হবে না, তেমনিভাবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের ভাবনাও থাকবে না। জবাব শুনে ইবন 'আমির চুপ হয়ে গেলেন। অনেক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না। হারিম (রহ) আবার বললেন : ওহে ইবন 'আমির! আমার ভয় হলো সেই মহা বিপদ নিয়ে।^৬

উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) খিলাফাতকালে

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) রাষ্ট্র পরিচালনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার মূলে ছিল উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে বের করে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ দেওয়া। তাই হারিম ইবন হায়্যান (রহ) নিজেকে যতই লুকিয়ে রাখুন না কেন উমারের (রা) দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। তিনি হারিমকে (রহ) খুঁজে বের করেন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঘোড়াসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। আজকের যুগে একটি উন্নত সামরিক বাহিনীর জন্য আধুনিক যন্ত্রযান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে যুগে সেনাবাহিনীর জন্য ঘোড়াও তেমন ছিল। হারিম (রহ) তাকওয়া ও আমানতদারীর সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব পালনকালে তিনি তাঁর অধীনস্থ এক কর্মচারীর উপর রেগে যান এবং তাকে শাস্তি দেন। রাগ প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের লক্ষ্য করে বলেন : আব্দাহ আপনাদেরকে ভালো প্রতিদান না দিন। আমি যখন ঐ লোকটিকে শাস্তি দিলাম, আপনারা কেউই আমাকে উপদেশ দেন নি এবং রাগের মাথায় যে কাজ করেছি তা থেকে আমাকে বিরত রাখেন নি। আব্দাহর কসম! আমি আর এই দায়িত্ব পালন করবো না।^৭ তারপর তিনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে (রা) লেখেন :

يا امير المؤمنين لا طاقة لي بالرعية، فابعث من يكون على خيلك غري.

৬. প্রাণ্ড, খ-২, পৃ. ১২১

৭. প্রাণ্ড, 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ২৫৩

“হে আমীরুল মু'মিনীন! এই রাখালীর ক্ষমতা আমার নেই। আমার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠান যে আপনার ঘোড়ার রাখালীর কাজ করবে।”

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন আল খাতাব (রা) এমন মানুষকে কি ছাড়তে পারেন যিনি মানুষের উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করতে চান এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন? তিনি হারিমকে (রহ) একটি অঞ্চলের ওয়ালীর (শাসক) পদে নিয়োগ দেন। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মস্থলে গেলেন। নতুন ওয়ালীকে স্বাগতম জানানোর জন্য মানুষ ভীড় জমাতে থাকে। কিন্তু হারিম (রহ) এক অভিনব কাণ্ড করলেন। তিনি নিজের চারপাশে আশুন জ্বালিয়ে বেটনী তৈরির নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউই বুক ও হাত মেলানোর জন্য তাঁর নিকট পৌঁছাতে পারলো না। সবাই আশুনের বেটনীর বাইরে থেকে তাদের ওয়ালীকে সালাম ও স্বাগতম জানালো। কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা আমার কাছে আসুন! আসুন!

উপস্থিত জনতা বিস্ময়ের সাথে বললো : আমরা তো আপনার নিকট যেতে পারছি না। আপনার ও আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হলো এই জুলন্ত আশুন। তিনি বললেন : এই সামান্য আশুনের কারণে আপনারা আমার ধারে কাছে আসতে পারছেন না, অথচ জাহান্নামের আশুন যা এর চেয়েও ভয়ঙ্কর, সেখানে আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা করেন কিভাবে? এরপর জনতা নিজ নিজ পথে ফিরে গেল।^৮

আরেকবার খলীফা 'উমার (রা) একটি অভিযানে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। বাহিনী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন। কোন সৈনিকের কোন প্রয়োজন হলে সে সেনাপতির নিকট থেকে ছুটি নিত। একজন সৈনিক তার পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো। সে সেনাপতি হারিমের (রহ) নিকট আসলো এবং পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার কথা না বলে অন্য কারণ দেখিয়ে ছুটির আবেদন জানালো। হারিম (রহ) তাকে ছুটি দিলেন। সে পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে ফিরে আসলো। হারিম (রহ) তাকে প্রশ্ন করলেন : কোথায় ছিলে?

সৈনিকটি বললো : পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। আমি আপনার নিকট ছুটির আবেদন জানালে আপনি ছুটি দেন।

হারিম বললেন : আমি তোমাকে এজন্য নয়, বরং অন্য কারণে ছুটি দিয়েছিলাম।

সৈনিকটি তা স্বীকার করলো।

হারিম (রহ) ভীষণ রেগে গেলেন। তাকে তিরস্কার করলেন এবং অত্যন্ত শক্ত কথা বললেন। সেই মাজলিসে তখন অনেক মানুষ বসা ছিল। কিন্তু কেউই লোকটির পক্ষ নিয়ে তাঁকে বিরত

রাখার চেষ্টা করলো না। তাঁকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে কেউ তাঁকে শান্ত হবার কথা বললো না।

লোকটি হারিমের শক্ত কথা ও তিরস্কার শোনার পর চুপচাপ সৈনিকদের মাঝে নিজের দায়িত্বে ফিরে গেল। হারিম বিষন্ন চিন্তে মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর তাঁর পাশে বসা সংগী-সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন :”

جزاكم الله من جلساء شرّ، تروني أقول لأخى ما أقول ولم ينهني أحد منكم
عن ذلك، اللهمّ خلف رجال السوء لزمان السوء.

“আল্লাহ তোমাদের মত নিকৃষ্টতর সংগী-সাথীদের প্রতিদান দিন। তোমরা আমাকে দেখলে, আমি আমার এক ভাইকে যা বলার বলছি, অথচ তোমাদের কেউই আমাকে বারণ করলে না। হে আল্লাহ! মন্দ লোকদের মন্দ যুগের উত্তরাধিকারী কর।”

হারিম ইবন হায়্যানের (রহ) সততা, দৃঢ়তা, কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি গুণের কারণে খলীফা ‘উমার (রা) ও ‘উছমানের (রা) খিলাফতকালে বহু অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সে সব দায়িত্ব পালন করেন। ‘বাজরা’ মতান্তরে ‘আশ-শুযুখ’ দুর্গের অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হিজরী ২৬ সনে তৃতীয় খলীফা ‘উছমান (রা) তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব দেন তাঁকে। তিনি বাহিনী নিয়ে দুর্গ অবরোধ করেন এবং যুদ্ধ ছাড়াই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুর্গ জয় করেন। দুর্গের অধিবাসীরা জিযিয়া দানের অঙ্গীকার করে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।

হিজরী ২৮ সনে মুসলিম বাহিনী ইরাক ও পারস্য অভিযানে বের হয়। যাত্রা পথে এখানে ওখানে প্রতিষ্ঠিত শত্রু বাহিনীর ঘাঁটি ও দুর্গ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব এরকম সংকটজনক পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের খুঁজতে থাকেন। তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে হারিমও (রহ) ছিলেন। কূফা অভিমুখী রাস্তার ধারে ‘আবু শাহর’ নামে একটি শহর ছিল। সেখানকার শাসক মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাকে দমন ও শহরটি দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয় হারিমকে (রহ)।

তিনি একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত শক্তভাবে শহরটি অবরোধ করেন। এ অবরোধ দীর্ঘ দিন চলে। শহরের অধিবাসীরা তীব্র খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়। অবশেষে শহরটির শাসক সন্ধি করার জন্য হারিম ইবন হায়্যানের (রহ) নিকট দূত পাঠায়। সন্ধি সম্পাদিত হয়। শহরের অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং কূফাগামী রাস্তাও খুলে দেওয়া হয়। মুসলিম বাহিনী কূফায় প্রবেশ করে।^৯

৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ-২, পৃ. ১২১

১০. উসুদুল গাবা, খ-৫, পৃ. ৫৭; আল ইসতী‘আব, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯

এভাবে আমরা দেখতে পাই হারিম ছিলেন একজন সফল সেনা কমান্ডার, তেমনভাবে একজন অল্পে তুষ্ট দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ। সেনা কমান্ডার অথবা ওয়ালীর দায়িত্বে থাকা বা না থাকা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর ভয় ও মানুষের প্রতি দয়া-মমতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

‘আমল তথা কর্মের গুরুত্ব

তিনি ‘ইলম বা জ্ঞানের বেশি গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর মতে মূল বিষয় হলো ‘আমল। ‘আমল বিমুখ ‘আলিমদেরকে তিনি ভীষণ ঘৃণা করতেন এবং তাদেরকে ‘ফাসিক’ (বিকৃত) বলতেন। একবার তিনি লোকদেরকে বলেন, তোমরা ফাসিক ‘আলিমদের থেকে দূরে থাকবে। কথাটি আমীরুল মু‘মিনীন ‘উমারের (রা) কানে গেলে তিনি বিস্মিত হলেন যে, ‘আলিম ব্যক্তি ফাসিক হয় কি করে? তিনি এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। হারিম (রহ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমীরুল মু‘মিনীন, এ কথাটি বলার ব্যাপারে আমার সং উদ্দেশ্য ছিল। অনেক সময় দেখা যায়, ইমাম জ্ঞানের কথা বলেন, কিন্তু কাজ করেন অন্য রকম। এ কারণে মানুষ সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে বিভ্রান্ত হয়।^{১১}

উওয়াইস আল কারানীর (রহ) সাথে সাক্ষাত

উওয়াইস আল কারানীর জন্মস্থান ইয়ামন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তিনি একজন পূর্ণ বয়স্ক ও ঈমানদার মানুষ হিসেবে বিদ্যমান থাকলেও নবী কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে মুখোমুখী সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। চোখের দেখা না হলেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘ইশক ও মুহাব্বাতে একেবারে বিভোর হয়ে পড়েন। তাঁর এ ‘ইশক ও মুহাব্বাত প্রবাদতুল্য হয়ে যায় এবং তিনি জগতের সকল রাসূলপ্রেমীদের নেতায় পরিণত হন। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না দেখেই ‘খায়রুত তাবি'ঈন’ (সর্বোত্তম তাবি'ঈ) বলে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন।^{১২} উওয়াইস আল কারানী (রহ) ছিলেন বাতিনী জগতের মানুষ। নিজেকে দুনিয়াবাসীর চোখ থেকে লুকোবার জন্য খুবই দীন-হীনভাবে থাকতেন। তবে তাঁর রূহানিয়্যাতের সুরভিতে মোহিত হয়ে মানুষ পাগলের মত তাঁর নিকট ছুটে এসেছে। হারিম (রহ) ছিলেন তাঁরই সমকালীন একই চিন্তা-চেতনার মানুষ। তাঁদের দু'জনের একটি চিন্তাকার্যক সাক্ষাতের ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হলো।

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) বলেন, আমি উওয়াইস আল কারানীর (রহ) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কুফা গেলাম। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ফুরাতের তীরে পৌঁছালাম। সেখানে দেখলাম

১১. তাবি'ঈন, পৃ. ৫০৬

১২. ইউসুফ আল কানখালুবি, হায়াতুস সাহাবা, খ.৩, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪; তাবি'ঈদের জীবন কথা, বিআইসি, ঢাকা, খ. ১, পৃ. ২৭১

একটি লোক দুপুরের সময় একাকী বসে ওজু করছে এবং কাপড় ধুচ্ছে। আমি উওয়াইসের (রহ) গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছিলাম। একারণে খুব দ্রুত তাঁকে চিনে ফেললাম। আমি তাঁর কাছাকাছি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি মুসাফাহ (করমর্দন) করার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি মুসাফাহ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'ইশক ও মুহাব্বতের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে আসে। আমাকে কাঁদতে দেখে তিনিও কাঁদলেন। তারপর বললেন, হারিম ইবন হায়্যান! আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। আমার ভাই, আপনি কেমন আছেন? আপনাকে আমার ঠিকানা কে বলেছে? বললাম : আল্লাহ!

আমার জবাব শুনে তিনি বললেন :

لا إله إلا الله سبحانه ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا حين سماني.

“আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ বা উপাস্য নেই। আমাদের রব কতনা পবিত্র। আমাদের রবের অঙ্গীকার অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।”

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) বললেন, এর পূর্বে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি এবং তিনিও আমাকে দেখেননি। এ কারণে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম : আপনি আমার ও আমার পিতার নাম জানলেন কিভাবে? বললেন : মহাজ্ঞানী সত্ত্বা আমাকে জানিয়েছেন। যখন আপনার অন্তর আমার অন্তরের সাথে কথা বলেছে তখনই আমার রুহ আপনার রুহকে চিনে ফেলেছে। মু'মিনরা কখনো একসাথে মেলামেশা না করলেও, পরস্পর পরিচিত না হলেও এবং একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ না হলেও সবাই সবাইকে চেনে-জানে। আল্লাহর এই রূহের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলে- তা সে একজন আরেকজনের থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন।

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন? শুনে থাকলে বর্ণনা করুন, আমি মুখস্থ করে নিই। তিনি বললেন, : আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেয়েছি। তবে তাঁর সাক্ষাৎ ও সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। হাঁ, যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের গৌরব অর্জন করেছেন, আমি তাঁদেরকে দেখেছি এবং আপনাদের মত আমার কাছেও তার হাদীছ পৌছেছে। কিন্তু আমি মুহাদ্দিছ, কাজী অথবা মুফতী হবো এ উদ্দেশ্যে নিজের জন্য এ দ্বার উন্মুক্ত করতে চাই না। আমার নিজের নফসের অনেক কাজ আছে।

এ জবাব শুনে হারিম (রহ) আরজ করলেন : তাহলে আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শোনান। আপনার মুখ থেকে কুরআন শোনার বড় ইচ্ছা আমার। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনাকে ভালোবাসি। আমার জন্য দু'আ করুন এবং কিছু উপদেশ দিন যা আমি চিরদিন মনে রাখবো।

হারিমের (রহ) এ আবেদন শুনে উওয়াইস আল কারানী (রহ) তাঁর হাত মুঠ করে ধরেন এবং
 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তারপর সূরা
 আদ-দুখানের প্রথম থেকে وهو العزيز الرحيم পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তারপর একবার
 চিৎকার দিয়ে উঠে একেবারে চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে বলেন, নির্জন
 ও একাকীত্ব আমার বেশি পছন্দ।^{১৩}

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) তাঁর ভক্তবৃন্দ ও সংগী সাথীদেরকে সব সময় বলতেন :^{১৪}

ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه
 ودهم.

“কোন বান্দা হৃদয়-মন সহকারে আল্লাহর দিকে এগিয়ে গেলে আল্লাহ
 মু'মিনদের হৃদয় মনসহ তার দিকে এগিয়ে যান। এভাবে তাদের ভালোবাসা
 তাকে দান করেন।”

একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো : জনাব, আপনি কিভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ
 করেন? জবাবে তিনি নিম্নের দু'আটি তাকে শুনিয়ে দেন :^{১৫}

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ زَمَانٍ تَمُرُّ فِيْهِ صَغِيْرُهُمْ، وَ تَاْمُرُ فِيْهِ كَبِيْرُهُمْ،
 وَ تَقْرُبُ فِيْهِ اَاجَاهُمْ.

“হে আল্লাহ! আমি এমন যুগ ও কাল থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই যখন
 ছোটরা অবাধ্য হয়ে যাবে, বড়রা ষড়যন্ত্র করবে এবং এর মধ্যে তাদের শেষ
 সময় ঘনিয়ে আসবে।”

তিনি সব সময় তাঁর পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে ভীত-সংকিত থাকতেন এই ভেবে যে,
 দুনিয়ার চাকচিক্য তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। এ জন্য সব সময়
 তাদেরকে সালাত আদায়ের তাকীদ দিতেন। তাঁর একজন সমকালীন ব্যক্তি বলেন :^{১৬}

كان هـرم إذا رأى أهله يكثرون الضحك، أمرهم بالصلاة.

“হারিম (রহ) যখন দেখতেন তাঁর পরিবারের লোকেরা বেশি হাসছে তখন
 তাদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ করতেন।”

তিনি মানুষকে সব সময় নিম্নের কথাটি বলতেন :^{১৭}

مارأيت مثل الجنة نام طالبيها، ولا مثل النار نام هاربها.

১৩. ‘আসরুত তাবি’ঈন, পৃ. ২৫৫; হায়াতুল আওলিয়া, খ-২, পৃ. ৮৭

১৪. সিয়রু আ'লাম আন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪৯

১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ-২, পৃ. ১২০

১৬. ‘আসরুত তাবি’ঈন, পৃ. ২৫৫

১৭. প্রাণ্ডু, হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ-২, পৃ. ১২০

“আমি জান্নাতের মত আর কিছু দেখিনি যার অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামের মত আর কিছু দেখিনি যার থেকে পলায়নকারী ঘুমিয়ে থাকে।”

তিনি মানুষকে আরো বলতেন :

أخرجوا يا بني من قلوبكم حب الدنيا، و أدخلوا في قلوبكم حب الآخرة
“ওহে আমার সন্তানেরা! তোমরা তোমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রেম বের করে দাও এবং সেখানে আখিরাতের প্রেম ঢুকিয়ে দাও।”

সত্যিকার আল্লাহপ্রেমিক যারা, তাঁরা যেমন জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আল্লাহর ইবাদাত করেন না, তেমনিভাবে করেন না জাহান্নামের ভয়েও। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই হারিম (রহ) বলতেন :

لوقيل لى إني من أهل النار لم أدع العمل.

“আমাকে যদি বলা হয় তুমি জাহান্নামের অধিবাসী হবে তাহলেও আমি ‘আমল ছেড়ে দেব না।’”^{১৮}

তাঁর অন্তিম উপদেশবাণী

তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত তখন বহু মানুষ দেখতে আসতো। তাঁর বন্ধুদের একজন তাঁকে বললো : হারিম! আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন : আমি জানিনা কী উপদেশ দিব? তবে তোমরা আমার এই বর্মটি বিক্রী করে আমার দেনা পরিশোধ করবে। যদি তাতে পরিশোধ না হয় তাহলে আমার দাসটি বিক্রী করবে। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকেন।

লোকেরা আবারো তাঁকে কিছু উপদেশ দানের জন্য অনুরোধ জানালো। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে সূরা আন-নাহল এর শেষ আয়াতগুলো তিলাওয়াত ও তার উপর ‘আমল করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। তারপর তিনি তাদেরকে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন :^{১৯}

اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَاتِلَتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا غَوَّيْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰىقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। যদি তোমরা শান্তি দাওই, তাহলে ঠিক ততখানি শান্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লারই সাহায্যে। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। আল্লাহ তাদেরই সংগে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।”

তাঁর বন্ধুরা আবারো তাঁকে কিছু উপদেশ দানের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি সূরা আন-নাহল-এর উল্লেখিত আয়াতগুলো বারবার ভিলাওয়াত করতে লাগলেন।

মৃত্যু

হারিম ইবন হায়্যান (রহ) এক প্রচণ্ড গরমের দিন ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুক্ণ সঠিকভাবে জানা না গেলেও খিলাফাতে রাশিদার শেষ দিক পর্যন্ত যে জীবিত ছিলেন তা ধারণা করা যায়। লোকেরা তাঁর লাশ কবরে দাফন করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, এক খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে তাঁর কবরের উপর এসে থামলো এবং মুম্বলধারে বৃষ্টিপাত হলো।^{২০}

আল 'উতবী বলেছেন, আমি আমার শায়খদের বলতে শুনেছি : তাবি'ঈদের আটজনের মধ্যে 'যুহদ' (আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি) চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কুদ্দুস, আল-হাসান আল-বসরী, হারিম ইবন হাইয়্যান, আবু মুসলিম আল-খাওলানী, উওয়াইস আল-কারানী, রাবী ইবন খুছায়ম, মাসরুক ইবন আল আজদা ও আল আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রহ)।^{২১}

২০. সিয়রু আ'লাম আন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪৯; 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ২৫৯

২১. আল ইকদুল ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৭১; তাবি'ঈদের জীবন কথা, বিআইসি, খ. ১, পৃ. ২৮৩

নাফি' মাওলা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)

নাফি' (রহ) ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ইবন আল খাত্তাবের দাস। একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ। তাঁর ডাক নাম আবু 'আবদিল্লাহ। পিতার নামের ব্যাপারে একটু মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, হুরমুয, আবার কেউ বলেছেন কাউস। তিনি অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তবে কেউ কেউ তাঁকে আরব বংশোদ্ভূত বলেছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান মাগরিব (মরক্কো) বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তবে গবেষকদের নিকট এ মতটি তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। তাঁর অনারব বংশোদ্ভূত হওয়ার ব্যাপারে বেশিরভাগ গবেষক প্রায় একমত। তবে তাঁর জন্মভূমির ব্যাপারে নানা মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন : নিশাপুর, খুরাসান, দায়লাম এবং তালিকানের বারারিন্দাহ পার্বত্য অঞ্চল। অনেকে আফগানিস্তানের কাবুলের কথাও বলেছেন। নাফি' (রহ) দাস হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) হাতে কিভাবে পৌঁছলেন সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় যে, কোন একটি যুদ্ধে তিনি বন্দী হন এবং যুদ্ধবন্দী বণ্টনের সময় 'আবদুল্লাহর (রা) ভাগে পড়েন অথবা 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে দাস হিসেবে ক্রয় করেন।' একাধারে ত্রিশ বছর ইবন 'উমারের (রা) সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে কুরআন ও সুন্নাহর অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।^১ মুসলিম জাতি দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ মানুষের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে উদারতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো আমাদের এই আলোচিত ব্যক্তিত্ব নাফি' (রহ)। মুসলিম মাওয়ালীদের (দাস) জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে নাফি'র (রহ) স্থান অতি উঁচুতে। সে সময়ে দ্বিতীয় কোন দাস তাঁর সমপর্যায়ে ছিল না। 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) দাস 'ইকরিমাও (রহ) ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তবে মদীনাবাসীদের নিকট নাফি'র (রহ) মত তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাঁর চেয়ে নাফি' (রহ) ছিলেন অধিক মর্যাদার অধিকারী।^২ এদিক বিবেচনায় বলা যায়, ইসলামে দাসদের জ্ঞান চর্চার প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হয়েছে নাফি' (রহ) থেকে। প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ইয়াহইয়া ইবন মাজিন (রহ) বলেন, নাফি' (রহ) ছিলেন দায়লামের অধিবাসী, তাঁর জিহ্বায় একটু জড়তা ছিল।^৩

শিক্ষা

সৌভাগ্যক্রমে নাফি' তাঁর জীবনের সূচনাপর্বেই রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

১. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, (দারুল ফিকর) খ-১৯, পৃ-৩২
২. ড. হামদ 'আজ্জাজ আল-খাতীব, আস-সুন্নাহু কাবলাত তাদবীন, (দারুল ফিকর) পৃ-৩৩২
৩. ইবন হাজার আল-আসকিলানী, তাহযীব আত্ তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩৭০
৪. আয-যাহাবী, তাজকিরাতুল হফকাজ, খ-১, পৃ-১০০

সাল্লাম) মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত বিশাল ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধান লাভ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত ইবন 'উমারের (রা) খাদিম হিসেবে কাজ করার গৌরব অর্জন করেন।^৬ তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য যে স্বভাবগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা ছিল স্নেহশীল মনিবের সাহচর্য ও তত্ত্বাবধান তা আরো শাণিত করে দেয় এবং তিনি জ্ঞানের জগতের মুকুটের অধিকারী হন। ইসলামী জ্ঞানের জগতে তাঁর অনন্য অবদান ও অবস্থানের কথা সকল 'আলিম ও সীরাত লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

ইমাম নাওয়াবী (রহ) লিখেছেন যে, তিনি একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর মহত্ত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত।^৭ আল-খলীলী বলেন :^৮

نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه.

“নাফি' জ্ঞানের জগতে মাদীনার তাবি'ঈ ইমামদের মধ্যে অন্যতম ইমাম.. তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি কোন ভুল করেছেন বলে জানা যায় না।”

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন,^৯ لقد من الله علينا بنافع
“আব্দুল্লাহ নাফি'র (রহ) দ্বারা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।”

হাদীছ

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক ও বর্ণনাকারী। নাফি' (রহ) হাদীছের জ্ঞান তাঁর নিকট থেকেই অর্জন করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণিত হাদীছের গরিষ্ঠ অংশ তিনি নিজের স্মৃতিতে ধারণ করেন। একজন হাফিজে হাদীছ হওয়ার জন্য কেবল ইবন 'উমারের (রা) বর্ণনাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নাফি'র (রহ) জ্ঞান পিপাসা এত তীব্র ছিল যে, তা মেটানোর জন্য অন্য ঋণীধারার নিকটেও ছুটে গেছেন এবং সেখান থেকে অঞ্জলী ভরে পান করে তৃপ্ত হয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ছাড়াও সাহাবীদের মধ্য থেকে যাদের নিকট হাদীছ শুনেছেন, তাঁরা হলেন : আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ আল খুদরী, আবু লুবা বা ইবন 'আবদিল মুনিয়র, রাফি' ইবন খাদীজ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, উম্মু সালামা, আর-রুবাই বিনত মু'আওবিয ইবন আফরা (রা)। তাছাড়া বিশিষ্ট তাবি'ঈদের নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শোনেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : তাঁর মনিবের পুত্রগণ- 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন

৫. প্রাণ্ডজ

৬. আল-ইমাম আন-নাওয়াবী, তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ-১, পৃ-১১৪

৭. তাহযীব আত তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩৭০

৮. প্রাণ্ডজ, আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন, (দারুল ফিকর) পৃ-৩৩২

‘উমার, যায়দ ইবন ‘আবদিদ্বাহ ইবন ‘উমার এবং আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব বাকর আস-সিন্দীক, নুবাইহ ইবন ওয়াহাব আল-‘আবদারী, ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আস-সিন্দীক, ‘আবদুর রহমান ইবন হুসাইন, সাঈদ ইবন আবী হিন্দ ও আরো অনেকে।’^৯

তাঁর এ সকল মহান শিক্ষকের কল্যাণে তিনি তাবিঈন শ্রেণীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছ তথা হাদীছের হাফিজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইবন সা‘দ তাঁকে বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন।^{১০} ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে الإمام العلم –শীর্ষস্থানীয় ইমাম বলেছেন এবং হাদীছের হাফিজদের তৃতীয় স্তরের মধ্যে গণ্য করেছেন।^{১১} তাঁর বর্ণিত হাদীছের মানের ব্যাপারে আল-খালীলীর (রহ) প্রত্যায়ন পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তাঁর বর্ণনার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে হাদীছ বিশারদগণ একমত পোষণ করেছেন। যে সালিম ইবন ‘আবদিদ্বাহর (রা) নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনে, অনেকে তাঁকে তাঁরও উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনেকে আবার দু’জনকে সমপর্যায়ের মনে করতেন। তাঁর সকল বর্ণনা সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত।^{১২}

বিশেষ করে ইবন ‘উমার (রা) থেকে তাঁর বর্ণনাসমূহ ছিল একেবারেই সন্দেহ-সংশয় মুক্ত। ইমাম মালিক ইবন আনাস (রা) বলেন :^{১৩}

كنت إذا سمعتُ من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمع من غيره.
“আমি যখন ইবন ‘উমারের (রা) সূত্রে নাকি‘কে (রহ) হাদীছ বর্ণনা করতে শুনি, তখন সে হাদীছ অন্য কারো নিকট থেকে শুনি বা না শুনি তার কোন পরোয়া করিনা।”

ইমাম আল-বুখারী (রহ) বলেন :

أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر.
“হাদীছের সনদসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত সনদটি হলো : ইবন ‘উমার (রা) হতে নাকি‘ (রহ) হতে মালিক (রহ)।”

আর হাদীছ বিশারদগণ এই সনদটিকে سلسلة الذهب বা ‘সোনার শিকল’ নামে অভিহিত করেছেন।^{১৪}

৯. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা’ আর-রিজাল, (দারুল ফিকর) খ-১৯, পৃ : ৩২-৩৩

১০. প্রাগুক্ত, তাবিঈন, পৃ-৫০০

১১. তাজকিরাতুল হুফাজ্জ, খ-১, পৃ-৯৯

১২. তাহযীব আত্ তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩৭০

১৩. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-৩৫; তাহযীবুল আসমা’, খ-১, পৃ-১২৪

১৪. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ‘ইয়ান, খ-২, পৃ-১৫১; আস-সুন্নাহ্ কাবলাত তাদবীন,

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হাদীছে নাকি' (রহ)-এর ছাত্রদের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে অনেক উঁচু পর্যায়ের তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈ ছিলেন। সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন তাবি'ঈ হলেন : আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ, আল-হাকাম ইবন 'উয়াইনা, ইয়াহইয়া আল- আনসারী, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, ইবন শিহাব আয-যুহরী, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, সালিহ ইবন কায়সান, আইউব আস-সাখতিয়ানী, হুমাইদ আত-তাবিল, মায়মুন ইবন মিহরান, মূসা ইবন 'উকবা, সুলায়মান আল-আ'মাশ, মুহাম্মাদ ইবন 'আওন আল-খুরাসানী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) ও আরো অনেকে।

তাবি'-তাবি'ঈনের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : 'আবদুল মালিক ইবন জুরাইজ, আল-আওয়া'ঈ, মালিক ইবন আনাস, লাইছ, ইউনুস ইবন 'উবাইদ, ইবন আবী যি'ব, ইবন আবী লায়লা, দাহূহাক ইবন 'উছমান, ইসহাক ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন ফারওয়া (রহ) ও আরো অনেকে।^{১৫}

ইমাম মালিক ইবন আনাস (রহ) ছিলেন নাকি'র (রহ) একান্ত স্নেহধন্য ছাত্র। তিনি বলেন, আমি শৈশবে তাঁর নিকট যেতাম। আমার সঙ্গে থাকতো একজন দাস। নাকি' ঘর থেকে নেমে এসে আমাকে হাদীছ শোনাতে।^{১৬} নাকি' (রহ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ইমাম মালিক (রহ) সবসময় তাঁর দারসের আসরে বসতেন। তাঁর নিকট জানতে চাইতেন, অমুক অমুক মাসয়ালায় ইবন 'উমার (রা) কী বলেছেন।^{১৭}

ফিকহ

নাকি' (রহ) তাঁর মহান মনিবের তত্ত্বাবধানে ফিকহ শাস্ত্রেও পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। ইবন হাজার (রহ) তাঁকে **نافع الفقيه** - 'নাকি' আল ফাকীহ' বলে উল্লেখ করেছেন।^{১৮} সাহাবায়ে কিরামের (রা) পরে মাদীনায় 'আলিম ও মুফতী হিসেবে যে দলটি স্বীকৃত ছিল, তিনি ছিলেন সেই দলের অন্যতম সদস্য।^{১৯} তাঁর মনিব পুত্র সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ছিলেন তৎকালীন মাদীনার শ্রেষ্ঠ সাতজন ফকীহর একজন। নাকি' ছিলেন তাঁর ছাত্র। এ কারণে সালিম (রহ) যতদিন জীবিত ছিলেন, নাকি' (রহ) কোন ফাতওয়া দেননি।^{২০}

জ্ঞানের জগতে তিনি এত শক্ত অবস্থানে পৌঁছেন যে, উমাইয়া বংশের সত্যানিষ্ঠ খলীফা

(দারুল ফিকর) পৃ-৩৩২

১৫. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-৩৩-৩৪; তাহযীব আত্ তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩৭১

১৬. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১০০

১৭. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, খ-৬, দ্র. ইমাম মালিক-এর জীবনী, তাবি'ঈন, পৃ-৫০১

১৮. তাহযীব আত্ তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩৭১

১৯. ইবনুল জাওযী, আ'লাম আল-মুয়াক্কিসীন, খ-১, পৃ-২৫

২০. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১০০

‘উমার ইবন ‘আবদিল আযীয (রহ) তাঁকে মূল্যায়ন করতে ভুল করেন নি। তিনি তাঁকে মিসরের মুসলিমদেরকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর তা‘লীম দানের জন্য সেখানে পাঠান।^{২১}

কয়েকজন মনীষীর মূল্যায়ন

আল- ‘ইজলী (রহ) নাকি'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : “তিনি একজন মাদীনাবাসী, তাবি'ঈ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।” ইবনু খিরাশ (রহ) বলেন, “তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি।” আর ইমাম নাসাঈ (রহ) তাঁকে “বিশ্বস্ত ও দৃঢ়পদ” ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।^{২২} হারব ইবন ইসমা'ঈল বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) নিকট জানতে চাইলাম, সাগিম ও নাকি' (রহ) যখন ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমারের (রা) মতামতের ব্যাপারে মতপার্থক্য করেন তখন আপনি কার মতটি বেশি পছন্দ করেন? তিনি বললেন, আমি তাঁদের দু'জনকে অতিক্রম করিনি।^{২৩} এমনিভাবে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈনকে প্রশ্ন করা হয়, ইবন ‘উমার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে নাকি' ও সাগিমের (রহ) মতপার্থক্য হলে আপনি কার মতটি বেশি পছন্দ করেন? তিনি একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিতে সম্মত হননি। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হয়, নাকি' ও ‘আবদুল্লাহ ইবন দীনারের (রহ) মধ্যে মতপার্থক্য হলে? তিনি বলেন, তাঁরা সকলে বিশ্বস্ত। কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেননি।^{২৪}

নাকি'র (রহ) গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর মনিব মহান সাহাবী ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা) তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। নাকি'র (রহ) দাসত্বের জীবনে তাঁর গুণমুগ্ধ অনেক গুলীজন তাঁকে ক্রয় করার জন্য ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমারের (রা) নিকট মোটা অংকের অর্থদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি বিক্রি করতে সম্মত হননি। আল-আসমা'ঈ (রহ) বর্ণনা করেছেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার একবার বার হাজার দিরহাম দানের প্রস্তাব করেন। ‘আবদুল্লাহ (রা) সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রসঙ্গে নাকি' (রহ) নিজেই বলেছেন :^{২৫}

قد خدمت ابن عمر ثلاثين سنة فاعطاه ابن عامر في ثلاثين ألفاً، فقال : إني أخاف أن تفتني دراهم ابن عامر، إذ هب فأنت حرٌّ.

“আমি ত্রিশ বছর ইবন ‘উমারের (রা) সেবা করেছি। অতপর ইবন ‘আমির আমার বিনিময়ে ত্রিশ হাজার দানের প্রস্তাব করে। তিনি বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে ইবনু ‘আমিরের দিরহাম আমাকে প্রলোভিত না করে ফেলে। যাও, তুমি মুক্ত ও স্বাধীন।”

২১. শাযারাত আয-যাহাব ফী মান যাহাব, খ-১ পৃ-১৫৪

২২. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-৩৬

২৩. তাজকিরাতুল হক্ফাজ, খ-১, পৃ-১০০

২৪. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-৩৬

২৫. তাজকিরাতুল হক্ফাজ, খ-১, পৃ-১০০

এভাবে নারি' (রহ) দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

তার মৃত্যু সন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। ১১৭, ১১৯ ১২০ হিজরী সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।^{২৬} নারি'র (রহ) একটি দাসী ছিল যার নাম ছিল 'কাওকাব আস-সুবহি'-প্রভাতের তারকা।^{২৭}

২৬. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-৩৭

২৭. তাজকিরাতুল হফফাজ, খ-১, পৃ-১০০

মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান (রহ)

মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান আল-কুরাশীর (রহ) ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ। মূলত: তিনি ফাতিমা বিনত আল ওয়ালীদ ইবন 'উতবার দাস ছিলেন।' এ কারণে আল কুরাশী বলা হয়। পরবর্তীতে মাদীনার স্থায়ী অধিবাসী হন। তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ। 'ইল্ম ও তাকওয়ার দিক দিয়ে তিনি বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম নাওয়াবী (রহ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

كَانَ إِمَامًا فَقِيهًا عَابِدًا

“তিনি ছিলেন একজন ইমাম, ফকীহ ও 'আবিদ ব্যক্তি।”

ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে القدوة و الإمام “ইমাম ও আদর্শ” বলেছেন।^১ ইবনুল মুবারাক বলেন,^২

لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ابْنِ عَجَلَانَ، كُنْتُ أَشْبَهُهُ
بِالْيَاقُوتَةِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

“মাদীনায় মুহাম্মাদ ইবন 'আজলানের (রহ) চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ নেই। আমি তাঁকে 'আলিমদের মধ্যে ইয়াকূত পাথরের সাথে তুলনা করে থাকি।”

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছ। সাহাবীদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক (রা) ও আবুত তুফাইলের (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। তাছাড়া বহু বিখ্যাত তাবি'ঈ-মুহাদ্দিছের নিকট থেকেও হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।

তাঁদের কয়েক জনের নাম হলো : আবান ইবন সালিহ, ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হুসাইন, বুকাইর ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আশাজ্জ, ছাওর ইবন যায়দ আদ-দীলী, রাজা' ইবন হায়ওয়া, যায়দ ইবন আসলাম, সা'ঈদ ইবন ইবরাহীম, সা'ঈদ ইবন আবী সা'ঈদ আল-মাকবুরী, আবুল হুবাব সা'ঈদ ইবন ইয়াসার, সালমান আবী হাযিম আল-আশজা'ঈ, সুমাইয়্যা মাওলা আবী বাকর ইবন 'আবদির রহমান, সুহাইল ইবন আবি সালিহ, সাইফী মাওলা আবী আইউব আল-আনসারী, 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদা, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আয-যুবায়র, আবুয যানাদ 'আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন হুরমুয, 'ইকরিমা মাওলা ইবন 'আব্বাস, 'আমর ইবন শু'আয়ব, 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ, নাকি' মাওলা ইবন

১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা' আর রিজাল, খ-১৯, পৃ-৫৩

২. তাহযীব আল আসমা' ওয়াল লুগাত, খ-১, পৃ-১৮৭

৩. তায়কিরাতুল হুফাজ্জ, খ-১, পৃ-১৬৫

‘উমার, হিশাম ইবন ‘উরওয়া, ওয়াকিদ ইবন সালামা, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল আনসারী, আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ (রহ) ও আরো অনেকে।^৪

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ শোনেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের নামের তালিকা অতি দীর্ঘ। এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো :

সুফইয়ান ইবন ‘উয়ায়না, সুফইয়ান আস-ছাওরী, সাঈদ ইবন মাসলামা আল উমাবী, ‘উবাইদুল্লাহ ইবন ‘উমার আল ‘উমারী, লাইছ ইবন সা'দ, মালিক ইবন আনাস, মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ আল ইয়শকুরী, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ আল আশহালী, মুহাম্মাদ ইবন ‘উমার আল ওয়াকিদী, নাবি' ইবন ইয়াযীদ আল মিসরী, ইয়াহইয়া ইবন আইউব আল মিসরী, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান, সালিহ ইবন কায়সান, আবু ‘আসিম আদ দাহহাক (রহ) ও আরো অনেকে।^৫

ফিকহ ও ফাতওয়া বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন।^৬

كان مفتيًا فقيهاً عالمًا عاملًا ربانيًا كبير القدر، له حلقة كبيرة في مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم.

“তিনি ছিলেন একজন মুফতী, ফাকীহ, ‘আলিম, ‘আমলকারী, রাব্বানী (আল্লাহ ওয়ালা) ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী মানুষ। মাসজিদে নববীতে তাঁর বিশাল আকৃতির বৃত্তাকারের শিক্ষার আসর বসতো। ইউসুফ আল-মিয়যী বলেন :^৭

كان عابدًا، ناسكًا، فقيهاً، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وكان يفق.

“তিনি ছিলেন একজন ‘ইবাদাতকারী, তাপস ও ফকীহ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে তাঁর বৃত্তাকারের শিক্ষার আসর ছিলো। তিনি ফাতওয়া দিতেন।”

ইবন সা'দও তাঁকে একজন ‘আবিদ ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।^৮ ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শিতার কারণে তাঁকে মাদীনার হাসান আল বাসরী (রহ) গণ্য করা হতো। একবার কোন একটি কারণে জা'ফার ইবন সুলায়মান তাঁকে বেত্রাঘাত করতে চান। এ কথা মাদীনাবাসীরা অবগত হলে তাঁরা জা'ফারকে বলে, যদি হাসান আল বাসরী (রহ) দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হতো,

৪. তাহযীব আল কামাল, খ-১৯, পৃ-৫৪; তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৪১

৫. প্রাণ্ডজ, তাবি'ঈন, পৃ-৪৪৭

৬. তায়কিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৬৫

৭. তাহযীব আল কামাল, খ-১৯, পৃ-৫৩

৮. তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৪১

তাহলে কি আপনি তাঁকে মারতেন? জা'ফার বলেন : না, মারতাম না। তখন লোকেরা বললো, মুহাম্মাদ তো মাদীনার হাসান আল বাসরী (রহ)। জা'ফার তাঁকে ক্ষমা করে দেন।^৯

মুহাম্মাদ ইবন আজলান জীবনের এক পর্যায়ে মিসর গমন করেন এবং ইসকান্দারিয়াতে অবস্থান করেন। সেখানে একটি বিয়েও করেন। অবশেষে মাদীনায় ফিরে আসেন। হিজরী ১৪৮ সনে মাদীনায় ইনতিকাল করেন।^{১০}

ইমাম আন নাসাঈ, আবু যুর'আ, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (রহ) প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুহাম্মাদ ইবন আজলানকে “ ২৪ ” বা পরম বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।^{১১}

৯. তাবকিরাতুল হুস্বা, খ-১, পৃ-১৬৬

১০. প্রাণ্ড

১১. তাহবীব আল কামাল, খ-১৯, পৃ-৫৬

নাফি' ইবন জুবায়র (রহ)

নাফি' (রহ)-এর ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবু 'আবদিল্লাহ। মক্কার কুরায়শ বংশের নাওফালী শাখার সন্তান। পিতা জুবায়র (রা) এবং পিতামহ মুত'ইম ইবন 'আদী। ইসলামের সূচনা পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমগণ মক্কায় প্রতিনিয়ত যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। তখন এই মুত'ইম ইবন 'আদী নানাভাবে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহায্য করেন। নাফি' (রা)-এর মায়ের নাম উম্মু কিতাল। তাঁর অন্য দু'ভাইয়ের নাম হলো- সা'ঈদ আল-আসগার ও আবদুর রহমান আল-আকবার। তাঁরা সকলে উম্মু কিতালের সন্তান। একথা জুবায়র ইবন বাক্কার বলেছেন।^১

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষার দিক দিয়ে নাফি' (রহ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ তারিখীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নাওয়াবী (রহ) লিখেছেন, তিনি একজন ইমাম ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও উঁচু মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।^২ 'আবদুর রহমান ইবন ইউসুফ ইবন খিরাশ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে : তিনি একজন দৃঢ়পদ, আস্থাভাজন, বিখ্যাত ও অন্যতম ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তি।^৩ ইবন হিব্বান তাঁকে অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

নাফি' ইবন জুবায়র (রহ) 'ইলমে হাদীছে যদিও উঁচু পর্যায়ের কোন ব্যক্তি ছিলেন না, তবে তিনি এমন একটা যুগ লাভ করেন যখন মদীনার অলি-গলিতে حَدَّثَنَا وَ سَمِعْتُ (আমি শুনেছি, তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন)-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতো এবং যাদের জ্ঞানের প্রতি সামান্যতম আগ্রহ ছিলো তারাও এর থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। আর নাফি'ও (রহ) এ সম্পদ থেকে একেবারে শূন্য ছিলেন না। যে সকল মহান ব্যক্তির নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর পিতা জুবায়র ইবন মুত'ইম, বিশর ইবন সুহাইম, জারীর ইবন আবদিল্লাহ আল-বাজালী, রাফি' ইবন খাদীজ, জুবায়র ইবন আল-আওয়াম, সাহল ইবন আবী হাছমা, সাহল ইবন সা'দ, আল-'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-'আব্বাস, 'উছমান ইবন 'আবিল 'আস, 'উরওয়া ইবন আল-মুগীরা ইবন শূ'বা, 'আলী ইবন আবী তালিব, মাস'উদ ইবন আল-হাকাম আয-যুরকী, মু'আয ইবন 'আবদির রহমান আত তায়মী, আল-মুগীরা ইবন শূ'বা, আবু শুরাইহ আল-খুযা'ঈ, আবু 'উবায়দা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবু

১. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ-১৯, পৃ-১৮

২. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, খ-১, পৃ-১২২

৩. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮

মাস'উদ আয-যুরকী, আবু হুরায়রা, 'আয়িশা, উম্মু সালামা (রা) ও আরো অনেকে।^৪

এ সকল ব্যক্তির কল্যাণে হাদীছের জ্ঞানে এত পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, হাদীছের শিক্ষার্থীগণ তাঁর পাশে ভীড় জমিয়ে রাখতো।

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন :

আবুল গুস্ন হাবিত ইবন কায়স আল-মাদানী, আবু বিশর জা'ফার ইবন আবী ওয়াহশিয়া, আল-হারিছ ইবন 'আবদিল মালিক, হাবীব ইবন আবী হাবিত, হাকীম ইবন হাকীম ইবন 'আব্বাদ, আল-হাকীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন কায়স, দাউদ ইবন কায়স আল-ফাররা', যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ, সা'দ ইবন ইবরাহীম, সা'ঈদ ইবন আবী সা'ঈদ আল-মাকবুরী, সালিহ ইবন সা'ঈদ আল-যুয়ায্বিন, সালিহ ইবন কায়সান, সাফওয়ান ইবন সুলাইম, 'আসীম আল-'আনযী, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-ফাদল আল হাশিমী, আবুল হুয়াইরিছ 'আবদুর রহমান ইবন মু'আবিয়া আয-যুরকী, 'উতবা ইবন মুসলিম, 'উরওয়া ইবন আয-যুযায়র, 'আমর ইবন দীনার, আল-কাসিম ইবন 'আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী, মূসা ইবন 'উকবা, ইউনুস ইবন খাক্বাব (রহ)।^৫

ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিলো। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে মদীনার একজন অন্যতম মুফতী। সকলের নিকট তাঁর ফাতওয়ার গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। 'আলী আল-মাদীনী (রহ) বলেন :

أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم
من لقيه، ومنهم من لم يلقه وهم اثناعشر رجلاً.

“যায়দ ইবন হাবিতের (রা) সঙ্গী-সাথী ও অনুসারী যারা তাঁর সূত্রে হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ফাতওয়া অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন, তাঁদের অনেকে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন, আবার অনেকে লাভ করেননি। তাঁরা হলেন বারো জন।”

অতপর 'আলী আল-মাদীনী তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সব শেষে নাকি' ইবন জুযায়র ইবন মুত'ইমের নামটিও উল্লেখ করেছেন।^৬

ভাষার বিদগ্ধতা ও অলঙ্করণ কুরায়শ বংশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বংশগতভাবে নাকি' (রহ) এ গুণ লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিদগ্ধ ও প্রাজ্ঞলভাষী। আল-কিলাবায়ী বলেন:^৭

৪. প্রাণ্ডু, তাহযীব আত তাহযীব, খ-১০, পৃ-৪০৫

৫. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৭-১৮; তাবি'ঈন, পৃ-৪৯৬

৬. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৯

৭. তাহযীব আত তাহযীব, খ-১০, পৃ-৪০৫

كَانَ نَافِعُ بْنُ جَبْرِ تَائِهًا فَصِيحًا عَظِيمَ النُّخْوَةِ جَهِيرَ الْكَلَامِ يَفْخَمُ
كَلَامَهُ.

“নাফি’ ইবন জুবায়র (রহ) ছিলেন হতবুদ্ধি ও দিশেহারা প্রকৃতির, বিস্কৃতভাষী, প্রচণ্ড আতসম্মানবোধ সম্পন্ন, উচ্চকণ্ঠী। তিনি কথা বলতেন জোরালো ভাবে।”

‘আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল-মারুযী বলেন:”

كَانَ يَعْدُ فَصَحَاءَ قُرَيْشٍ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ
سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ نَافِعُ بْنُ جَبْرِ.

“কুরায়শদের সর্বাধিক বিস্কৃতভাষী ব্যক্তি ছিলেন এই তিনজন :
‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয, সুলায়মান ইবন ‘আবদিল মালিক ও
নাফি’ ইবন জুবায়র।”

নাফি’ (রা) ছিলেন চারিত্রিক মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ইসলামের বাস্তব অনুসারী একজন মানুষ।

ইবন হিব্বান বলেন :

كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ
“তিনি ছিলেন উত্তম মানুষদের একজন।”

আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার করা বড় ধরনের ইবাদাত। একারণে তিনি কেবল সাওয়াবের আশায় পায়ে হেঁটে হজ্জ আদায় করতে যেতেন।

ইবন হিব্বান বলেন :

كَانَ يَحْجُ مَاشِيًا وَ نَاقَتَهُ تَقَادُ.

“তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ যেতেন এবং তাঁর বাহন উষ্ট্রটিও পিছনে
হাঁকিয়ে নেওয়া হতো।”

পূর্ব পুরুষ থেকেই তাঁর খান্দানে নেড়ত্ব চলে আসছিলো। এ কারণে তাঁর মধ্যেও এ গুণটি বিদ্যমান ছিলো। কিছু বর্ণনা এমন এসেছে যে, তাঁর মধ্যে একটু অহমিকা ভাব ছিলো, তবে তাঁর জীবনের সার্বিক দিক বিবেচনায় কথাটি সঠিক বলে মনে হয় না। তিনি নিজেও এমন ধারণার প্রতীবাদ করেছেন। একবার তাঁকে বলা হলো, মানুষ মনে করে যে, আপনার মধ্যে গর্ব-অহংকার কাজ করে। জবাবে তিনি বলেন :^{১০}

৮. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮

৯. ইবনু সা’দ, আত-তাবাকাত, খ-৫, পৃ-১৫৩

১০. প্রাগুক্ত, খ-৫, পৃ-১৫২

والله لقد ركب الحمار و لبست الثملة و حلبت الشاة، وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ما فيمن فعل ذلك من الكبر
شيء“

“আল্লাহর কসম! আমি গাধার পিঠে চড়েছি, শামলা (টিলে জোকা) পরেছি ও ছাগীর দুধ দুইয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যারা একাজ্জ করেছে, তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকারের লেশ মাত্র নেই।”

তাহলে আমি কিভাবে অহংকারী হতে পারি?

তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মোটেও অহংকারী ছিলেন না। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করতেন, যাতে তাঁর নগন্যতা প্রকাশ পেত। যেমন একবার তিনি ‘আলা’ ইবন হারকীর দারসে হাজীর হন। এই ‘আলা’ ছিলেন একজন দাস। দারসের আসর শেষ হওয়ার পর তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা কি জানেন, আমি কেন আপনাদের সাথে এই দারসে বসেছি? লোকেরা বললো, দারস (পাঠ) শোনার জন্য বসেছেন। তিনি বললেন : না, সে জন্য নয়, বরং আল্লাহর নিকট আমার বিনয়ীভাব প্রকাশ পাক— এজন্য বসেছি। আরেকবার তিনি একজন অতি নগন্য ব্যক্তিকে সালাতের ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দেন এবং তার পেছনে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বলতে পারো, কেন আমি তোমাকে সামনে এগিয়ে দিলাম? সে বললো, সালাতের ইমামতির জন্য। তিনি বললেন : না, বরং তোমার পেছনে সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট আমার তুচ্ছতা ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পাক, এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো।^{১১}

মৃত্যু

আল-ওয়াকিদী, তাঁর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আয-যুবায়র ইবন বাক্কার, খলীফা ইবন খায়্যায প্রমুখ ইতিহাসবিদ বলেছেন, নাবি' (রহ) মৃত্যু বরণ করেছেন খলীফা সুলায়মান ইবন আবদিল মালিকের খিলাফাতকালে। অনেকে আরো একটু নির্দিষ্ট করে বলেছেন, তিনি খলীফা সুলায়মানের খিলাফাতের শেষ ভাগে মৃত্যু বরণ করেছেন। খলীফা ইবন খায়্যায বলেছেন, সুলায়মান হিজরী ৯৬ সনে খিলাফাত লাভ করেন এবং হিজরী ৯৯ সনে মারা যান। ‘আবদুর রহমান ইবন আবিয যানাদ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বলেন, নাবি' মৃত্যু বরণ করেন খলীফা সুলায়মানের খিলাফাতের শেষ ভাগে হিজরী ৯৯ সনে।^{১২}

১১. প্রাণ্ডু; আবি'ঈন, পৃ-৪৯৮

১২. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৯; আত-তাবাকাত, খ-৫, পৃ-১৫৩

মৃত্যুর সময় তিনি মুহাম্মাদ, আবু বাকর, 'আলীসহ ফয়েকজম সভান রেখে যান।
বার্জকো মাথার চুলে কালো খিজাব লাগাভেন। দাঁতে সোনার আবরণ করা ছিলো।
উন্নতমানের দামী সাদা পোশাক পরভেন।^{১৩}

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী (রহ)

প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ (রহ)-এর ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবু হামযা। পিতার নাম কা'ব এবং দাদার নামের ব্যাপারে একটু মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, সূলাইম, আবার কেউ বলেছেন হিব্বান। তিনি ছিলেন মাদীনার ইহুদী গোত্র বানু কুরায়জার সন্তান। তবে মাদীনার আনসার গোত্র আওসের সাথে তাঁর মৈত্রী চুক্তি ছিলো। বানু কুরায়জার সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের সময় মুহাম্মাদের পিতা কা'ব মুসলিমদের হাতে বন্দী হন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করেন।^১

যেমন আল-মিযযী বলেন,

وكان أبوه من سبي قريظة

‘তাঁর পিতা ছিলেন কুরায়জার বন্দীদের একজন।’

ইবন হিব্বান বলেন,

وكان أبوه ممن لم يثبت يوم قريظة فترك.

‘তাঁর পিতা বানু কুরায়জার যুদ্ধের সময় একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন, একারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো।’

এ কথা ইমাম আল বুখারীও বলেছেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি কূফায় বসবাস করেন। পরে আবার মাদীনায় ফিরে আসেন এবং প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় করেন।^২

মুহাম্মাদ ইবন কা'বের (রহ) জন্মের সময়কালের ব্যাপারে একটু মতপার্থক্য আছে। একটি মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন।^৩ ইবন হাজার আল-আসকিলানী (রহ) বলেন, এই মতটির কোন সত্যতা নেই। তবে যা সত্য তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর পিতা কা'ব জন্মগ্রহণ করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে বানু কুরায়জার সাথে যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হওয়ার পর মুক্তি লাভ করেন। ইমাম বুখারীও এমন কথা বলেছেন।^৪

ইয়া'কুব ইবন শায়বা বলেন, মুহাম্মাদ খলীফা 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) খিলাফতকালের একেবারে শেষ পর্যায়ে হিজরী ৪০ সনে জন্মগ্রহণ করেন।^৫

১. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ-১৯, পৃ-১৭৯

২. প্রাপ্ত, খ-১৯, পৃ-১৮০

৩. প্রাপ্ত, খ-১৯, পৃ-১৮১

৪. তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৭২

৫. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮১

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি ছিলেন উঁচু পর্যায়ের বিদ্বান তাবি'ঈ। ইবন হিষ্মান বলেন,^৬

كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها.

“তিনি ছিলেন ইলম ও ফিকহ-এর দিক দিয়ে মাদীনার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন।”

ইমাম নাওয়াযী (রহ) লিখেছেন, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ইমামদের একজন।^৭

আল কুরআন ও আল হাদীছের জ্ঞানে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিলো। আল-ইজলী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

مدني، تابعي، ثقة، رجل صالح، عالم بالقرآن.

“তিনি ছিলেন মাদীনাবাসী একজন তাবি'ঈ, বিশ্বস্ত, সত্যনিষ্ঠ মানুষ, আল কুরআনের ‘আলিম।”

‘আওন ইবন ‘আবদিদ্বাহ বলেন :

ما رأيتُ أحدا أعلم بتأويل القرآن القرطبي.

“আমি আল কুরআনের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল কুরাজীর চেয়ে বড় ‘আলিম আর কাউকে দেখিনি।”

ইমাম আয যাহাবী (রহ) তাঁকে আল কুরআনের মুফাসসির বলে উল্লেখ করেছেন।^৮

ফুদাইল ইবন আল-বায'যাহ (রহ) বলেন :^৯

كان محمد بن كعب جُلّساء كانوا من أعلم الناس بتفسير القرآن.

“মুহাম্মাদ ইবন কা'বের এমন কিছু সঙ্গী-সাবী ছিলেন যারা আল কুরআনের তাফসীর বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।”

আবু বুরদা আজ-জুফারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি :^{১০}

يُخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده.

৬. তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৭২

৭. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, খ-১, পৃ-৯০

৮. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮১, তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৭৩

৯. দুওয়ালুল ইসলাম, খ-১, পৃ-৫৬

১০. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮২

১১. মুসনাদু আহমাদ, হাদীছ-২৩৯৩৬, খ-৯; আল হায়ছামী, মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ: বাবু : ফী মান কারাআল কুরআনা মিন যুররিয়াতিল ইয়াহুদ, খ-৭, পৃ-১৬৭

“দুই পুরোহিত (অথবা গণক) গোত্রের একটি থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে এমনভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে যার পরে আর কেউ তেমনভাবে অধ্যয়ন করবে না।”

নাফি' বলেন, রাবী'আ বলতেন, আমরা বলাবলি করতাম, সেই ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল কুরাজী। আর সেই দুই পুরোহিত হলো কুরাইজা ও নাদীর।^{১২}

মুস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী মূসার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

يُخرج من الكاهنين رجل أعلم للناس بكتاب الله.

“দুই কাহিন তথা গণক থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যে কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শি হবে।”

সুফইয়ান বলেন, লোকেরা মনে করতো তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল কুরাজী।^{১৩}

হাদীছ

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছ। ইবন সা'দ তাঁকে মাদীনাবাসী মুহাদ্দিছগণের তৃতীয় তবকায় (স্তরে) স্থান দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন এভাবে :^{১৪}

كان ثقة عالماً، كثير الحديث، ورعاً.

“তিনি একজন পরম বিশ্বস্ত, 'আলিম, বহু হাদীছের ধারক-বাহক ও আল্লাহভীরু মানুষ ছিলেন।”

'আলী আল-মাদীনী ও আবু যুর'আ (রহ) তাঁকে “ছিকা” বা বিশ্বস্ত বলে সত্যায়ন করেছেন। যাদের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আনাস ইবন মালিক, আল-বারা' ইবন 'আযিব, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, যায়দ ইবন আরকাম, আল-'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খুতামী, 'আলী ইবন আবী তালিব, কা'ব ইবন 'উজরা, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, মুগীরা ইবন শু'বা, আবু আইউব আল আনসারী, আবদু দারদা', আবু যার আল-গিফারী, আবু হুরাইরা, 'আযিশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) ও আরো অনেকে। এ সকল ব্যক্তির সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।^{১৫}

১২. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮১

১৩. প্রাণ্ড, খ-১৯, পৃ-১৮২

১৪. প্রাণ্ড, খ-১৯, পৃ-১৮০

১৫. প্রাণ্ড, খ-১৯, পৃ-১৭৯

তঁার নিকট থেকে যাঁরা হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের তালিকা অতি দীর্ঘ। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

‘আবান ইবন সালিহ, ইবরাহীম ইবন তারীফ আশ-শামী, ইবরাহীম ইবন ‘উবাইদ ইবন রিফা‘আ আল-আনসারী, উসামা ইবন যায়দ আল-লায়ছী, ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-মাখযূমী, ইসমাইল ইবন রাফি‘ আল-মাদানী, বুরাইদা ইবন সুফইয়ান আল-আসলামী, আল-হাকাম ইবন ‘উতায়বা, যায়দ ইবন আসলাম, সাঈদ ইবন যিয়াদ আল-কুরাশী, সালিহ ইবন হাস্‌সান আল-মাদানী, ‘আসিম ইবন কুলাইব, ‘উছমান ইবন কা‘ব আল-কুরাজী, ‘আমর ইবন দীনার, মুহাম্মাদ ইবন ‘আজলান, মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-মাদানী, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদীর, মূসা ইবন ‘আবদির রহমান আল-খাতমী (রহ) ও আরো অনেকে।^{১৬}

মৃত্যু

আল-ওয়াকিদী, ‘আবদুল্লাহ আত-তায়মী, খলীফা ইবন খায়্যাতি, ‘আমর ইবন ‘আলী ও ইয়াকুব ইবন শায়বা বলেন, মুহাম্মাদ ইবন কা‘ব হিজরী ১১৭ সনে মৃত্যু বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। তবে ইবন হিব্বান হিজরী ১১৮ সনের কথা বলেছেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। এমনিভাবে হিজরী ১১৯ এবং ১২০ সনের কথাও অনেকে বলেছেন।^{১৭}

মুহাম্মাদ ইবন যুদাইল বলেন :^{১৮}

كان محمد بن كعب جلساء... وكانوا مجتمعين في مسجد الربة،
فأصابهم زلزلة، فسقط عليهم المسجد، فماتوا جميعا تحته.

“মুহাম্মাদ ইবন কা‘বের অনেক সঙ্গী-সাথী ছিলেন। ... তাঁরা রাবযা’র মাসজিদে সমবেত হয়েছিলেন। এমন সময় ভূমিকম্প হয় এবং তাঁদের ওপর মাসজিদ ধ্বসে পড়ে। তাঁরা সকলে মাসজিদের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করেন।”

আর ইবন হিব্বান বলেন :^{১৯}

وكان يقص في المسجد، فسقط عليه وعلى أصحابه سقف،
فمات هو وجماعة معه تحت الهدم.

“তিনি মাসজিদে গল্প-কাহিনী বলতেন। ইঠাৎ তাঁর ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। অতএব তিনি এবং তাঁর সাথে একদল মানুষ ধ্বংসস্তুপের তলে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করেন।

১৬. তাহযীব আত তাহযীব, খ-৯, পৃ-৩৭২, তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮০

১৭. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৯, পৃ-১৮৩

১৮. প্রাগুক্ত, খ-১৯, পৃ-১৮২

১৯. প্রাগুক্ত, খ-১৯, পৃ-১৮৩

মানসুর ইবন যাযান আল-ওয়াসিতী (রহ)

প্রখ্যাত 'আবিদ তাবি'ঈ মানসুর (রহ)-এর ডাকনাম আবুল মুগীরা। পিতার নাম আবু 'আকীল যাযান। ছকীফ গোত্রের 'আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির দাসত্বে ছিলেন। একারণে তাঁকে 'আছ-ছাকফী' বলা হতো। তিনি ওয়াসিতের অধিবাসী ছিলেন।'

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি ছিলেন তাবি'ঈকুল শিরোমনি হাসান আল-বাসরীর (রহ) একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সাহচর্য মানসুরকে 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের সমাবেশ স্থলে পরিণত করে। তিনি ওয়াসিতের বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে الإمام أحد الأعلام ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন :^১

كان ثقة حجة صالحا متعبدا كبير الشأن

'তিনি ছিলেন পরম বিশ্বস্ত, দলীল-প্রমাণ স্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ,
'ইবাদাতকারী, অভ্যুচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।'

হাদীছ

যে সকল মনীষীর নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আনাস ইবন মালিক (রা), আল-হারীছ আল-উককালী, আল-হাসান আল-বাসরী, আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা, হুমাইদ ইবন হিলাল, খুবাইব ইবন 'আবদির রহমান, রুফাই ইবন 'আলিয়াহ আর-রিয়াহী, যাযান ইবন আবী 'উমার আল কিন্দী, 'আবদুর রহমান ইবন আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'আমর ইবন দীনার, কাতাদা, মুহাম্মাদ ইবন সীরাঁন, মু'আবিয়া ইবন কুররা আল-মুযানী (রহ) ও আরো অনেকে।^২ তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

জারীর ইবন হাযিম, হাবীব ইবন আশ-শাহীদ, খালাফ ইবন খালীফা, শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ, দাহ্‌হাক ইবন হুমরা আল-উমলুকী, ফাদল ইবন মায়মূন আস-সুলামী, হুশাইম ইবন

১. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ-১৮, পৃ-৩৮৮

২. তাবকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৪১

৩. তাহযীব আল-কামাল, খ-১, পৃ-৩৮৮

বাশীর, আল-ওয়াদাহ আবু 'আওয়ানা, আবু হামযা আস-সুকারী (রহ) ও আরো অনেকে।^৪ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মন্তব্য করেন : شيخ ثقة : তিনি একজন বিশ্বাসভাজন শায়খ। আর আল-ইজলী তাঁর সম্পর্কে বলেন : رجل صالح : তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ 'আবিদ ব্যক্তি।

ইবন সা'দ তাঁকে ثقة و ثبت (বিশ্বাসভাজন ও সুদৃঢ়) বলেছেন।^৫

ইবাদাত ও অধ্যাত্মিক অনুশীলন

এটি হলো একজন মুসলিমের জীবনের সর্বাধিক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের 'আবিদ ও যাহিদ-তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষ। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ একজন সংযমী মানুষ হিসেবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন।^৬ ইবনুল 'ইমাদ আল হাম্বলী তাঁকে বসরার 'শায়খ ও যাহিদ' (সম্মানীয় ও দুনিয়া বিরাগী) বলে উল্লেখ করেছেন।^৭ তিনি রাত-দিনের অধিকাংশ সময় 'ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র হশাইম ইবন বাশীর তাঁর জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছেন এভাবে :^৮

لوقيل لمصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وذلك أنه كان يخرج فيصلي الغداة في جماعة، ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس، ثم يصلي إلى الزوال، ثم يصلي إلى العصر، ثم يجلس فيسبح إلى المغرب، ثم يصلي المغرب، ويصلي إلى العشاء الآخرة، ثم ينصرف إلى بيته فنكتب عنه في ذلك الوقت.

“মানসূর ইবন যাহানকে যদি বলা হতো, শূন্যের ফেরেশতা তোমার দরজায় অপেক্ষমান, তাহলেও তাঁর 'আমলের কোন রকম বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হতো না। কারণ তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করতেন। তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে তাসবীহ পাঠ করতেন। তারপর দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে হলে যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। তারপর সালাতুল আসর আদায় করে মাগরিব পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করতেন। তারপর মাগরিব ও 'ঈশা আদায়

৪. তাহযীব আত তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩০৬, তাজকিরাতুল হফফাজ, খ-১, পৃ-১৪৩

৫. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৮, পৃ-৩৮৮

৬. তাহযীব আত তাহযীব, খ-১০, পৃ-৩০৬

৭. শাযারাত আয-যাহাব, খ-১, পৃ-১৮১

৮. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৮, পৃ-৩৮৯; তাজকিরাতুল হফফাজ, খ-১, পৃ-১৪১

করে ঘরে ফিরতেন। আমরা তখন তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিখতাম।”

কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ছিলো তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। ইবন সা'দ বলেন :”

وكان سريع القراءة، وكان يريد يترسل فلا يستطيع، وكان يهتم في الضحى.

“তিনি দ্রুত কুরআন পাঠ করতেন। ধীরে ধীরে পাঠ করতে চাইতেন কিন্তু পারতেন না। সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে কুরআন খতম করতেন।”

নফল নামাযে তাঁর কুরআন পাঠ সম্পর্কে হিশাম ইবন হাস্‌সান বলেন :”

صليت إلى جنب منصور بن زاذان في ما بين المغرب والعشاء، فقرأ القرآن في الركعة الأولى وبلغ في الثانية إلى النحل.

“আমি মানসূর ইবন যাযানের পাশে দাঁড়িয়ে মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত সালাত আদায় করেছি। তিনি প্রথম রাক'আতে কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আন নাহল পর্যন্ত পৌঁছে যান।”

রামাদান মাসে তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীর মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। প্রতিদিন কুরআন খতম করতেন। সালাতে এত বেশি কান্না-কাটি করতেন যে, চোখের পানি মুছতে মুছতে পাগড়ির এক প্রান্ত ভিজ়ে যেত। আত্মাহুকে ভয় করে ভীষণ ভক্তি বোধ করতেন। ফরজ সালাতের পূর্বে এগারোটি সাজদা করতেন। জীবনে মাত্র দুটি রাত ছাড়া আর কখনো আরাম করে বিছানায় রাত কাটান নি। একটি রাতে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং অন্যটিতে হয় ছেলের মৃত্যু।”

তিনি এই কথাটি প্রায়ই বলতেন :”

الهم والحزن يزيد في الحسنات والأشروالبطر يزيد في السيئات.

“দুঃস্বিস্তা-দুর্ভাবনা মানুষের পুণ্যের বৃদ্ধি ঘটায়, আর গর্ব-অহঙ্কার বৃদ্ধি ঘটায় পাপের।”

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সনের ব্যাপারে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরী ১২৮ ও ১২৯ সনের কথা বর্ণিত

৯. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৮, পৃ-১৮৮

১০. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৪১

১১. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, খ-৩, পৃ-৫৮, তারি'ঈন, পৃ-৪৯১

১২. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৪২

হয়েছে। তবে ইয়াযীদ ইবন হারুন বলেন, তিনি হিজরী ১৩১ সনে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।^{১৩}

তাঁর সংস্খ্যভাব, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ ও উন্নত নৈতিকতার কারণে প্রতিটি ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা তাঁকে খুবই ভালো বাসতো। এ কারণে তাঁর জানাযায় ইহুদী-নাসারাহ সকল ধর্মের প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করে।

‘আব্বাদ ইবনুল ‘আওয়াম তাঁর জানাযার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :^{১৪}

شهدت جنازة منصور بن زاذان فرأيت النصارى على حدة،
واليهود على حدة، والنجوس على حدة، كل واحد منهم على
حدة، وقد أخذ خالي بيدي من كثرة الزحام وأنا حدث.

“আমি মানসূর ইবন যাযান এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম।
দেখলাম নাসারা, ইহুদী ও মাজুসীরা (অগ্নি উপাসক) প্রত্যেকে
পৃথক পৃথকভাবে অংশগ্রহণ করছে। আমি ছিলাম অল্প বয়স্ক,
তাই অতিরিক্ত ভীড়ের কারণে আমার মামা আমার হাত ধরে
রেখেছিলেন।”

১৩. প্রাচ্য, তাহযীব আল-কামাল, খ-১৮, পৃ-২৭২

১৪. তাহযীব আল-কামাল, খ-১৮, পৃ-৩৮৯

সুলায়মান ইবন তুরখান আত্‌ তায়মী (রহ)

সুলায়মানের (রহ) ডাকনাম আবদুল মু'তামির এবং পিতার নাম তুরখান। তিনি বানু মুররার সন্তান ছিলেন। তবে বানু তায়ম-এ বসবাসের কারণে তায়মী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইমাম আয্‌ যাহাবী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

الحافظ الإمام شيخ الإسلام

তিনি ছিলেন হাদীছের একজন হাফিজ, ইমাম ও শায়খুল ইসলাম।^১

আর ইবন সা'দ বলেছেন :

كان من العباد المجتهدين

তিনি ছিলেন 'আবিদ মুজতাহিদদের একজন।^২

জ্ঞান ও মনীষা

যুহুদ ও তাকওয়া- দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আদ্বাহ ভীরুতা এবং 'ইবাদাত-বন্দেগী ছিল তাঁর জীবনের সর্বাধিক উজ্জ্বল দিক। তবে জ্ঞানের জগতেও তাঁর সরব উপস্থিতি ছিলো। তিনি বসরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। একজন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন:^৩

كان ثقة كثير الحديث

“তিনি ছিলেন বিশ্বাসভাজন, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।”

তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ, তিনি যে হাফিজে হাদীছ ছিলেন তা স্বীকার করতেন। সুফইয়ান আছ্‌ ছাওরী (রহ) বলতেন :^৪

حفاظ البصريين ثلاثة : سليمان التيمي، و عاصم الأحول، و داود بن أبي هند. وكان عاصم أحفظهم.

“বসরাবাসীদের হাফিজ তিনজন : সুলায়মান আত্‌ তায়মী, 'আসিম আল-আহওয়াল ও দাউদ ইবন আবী হিন্দ। এদের মধ্যে 'আসিম সবচেয়ে বড় হাফিজ।”

উল্লেখ্য যে, এখানে হাফিজ বলতে হাদীছের হাফিজ বলা হয়েছে।

তিনি যাঁদের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা)ও আছেন। তাছাড়া তাবি'ঈদের মধ্যে হাসান আল বাসরী, আসলাম আল-

১. তাজকিরাতুল হফযাজ, খ-১, পৃ-১৫০; তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৮

২. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১৮

৩. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৭

৪. তাজকিরাতুল হফযাজ, খ-১, পৃ-১৫১

‘ইজলী, বাকর ইবন ‘আবদিব্লাহ আল-মুযানী, ছাবিত আল-বুনানী, খিদাশ আল-‘আকদী, রাবী’ ইবন আনাস, সা’ঈদ ইবন আবিল হাসান আল-বাসরী, সা’দ আল-কায়সী, সুলায়মান আল-‘আমাশ, তাউস ইবন কায়সান, তাল্ক ইবন হাবীব, ‘আবদুর রহমান ইবন আদম, গুনাইম ইবন কায়স, কাতাদা ইবন দি‘আমা, কায়স ইবন হাব্বার, মা‘বাদ ইবন হিলাল, নু‘আইম ইবন আবী হিন্দ, আবু মিজলায লাহিক ইবন হুমাইদ, ইয়াহইয়া ইবন ইয়া‘মার, ইয়াযীদ ইবন ‘আবদিব্লাহ আশ-শিখ্বীর, আবু ইসহাক আস-সাবী‘ঈ, আবু ‘উছমান আন-নাহদী, আবু ‘আমর, আবু ‘ইমরান আল-জাওনী, আসমা’ বিনত আল-কায়সিয়া আল-বাসরিয়া, রুমাইছা (রহ) ও আরো অনেকে।^৫

ইমাম আল-বুখারী (রহ) ‘আলী আল-মাদীনীর সূত্রে বলেছেন, সুলায়মানের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় দু’শো পর্যন্ত পৌঁছে যায়।^৬

গু‘বা (রহ) বলতেন :^৭

ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي.

“আমি সুলায়মান আত-তায়মীর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কাউকে দেখিনি।”

গু‘বা (রহ) আরো বলতেন :

شك ابن عون و سليمان التيمي يقين.

“ইবন ‘আওন ও সুলায়মান আত-তায়মীর সন্দেহ-সংশয়ও নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত পর্যায়ের।”

এতো প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। গু‘বা (রহ) বলেন:

كان إذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه.

“তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যখন হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন তাঁর রং পাল্টে যেত।^৮

তাঁর ছাত্র-শাগরিদের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইবরাহীম ইবন সা‘দ, আসবাত ইবন মুহাম্মাদ, ইসমা‘ঈল ইবন ‘উলাইয়্যা, জারীর ইবন ‘আবদিল হামীদ, হাক্‌স ইবন গিয়াছ, হাম্মাদ ইবন সালামা, খালিদ ইবন ‘আবদিব্লাহ, যায়িদা ইবন কুদামা, যুহায়র ইবন মু‘আবিয়া, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন হাবীব,

৫. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৩০২; তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৮

৬. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৩০১

৭. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৯

৮. প্রাণ্ডক; তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৫১

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, আবু 'আসিম আদ-দাহ্‌হাক, 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, 'আলী ইবন 'আসিম আল-ওয়াসিতী, 'ইমরান আল-কাত্তান, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী, মু'তামির ইবন সুলায়মান, হুশাইম ইবন বাশীর, হাওয়া ইবন খালীফা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াযীদ ইবন হারুন, আবু ইসহাক আশ-শায়বানী, আবু যায়দ আল-আনসারী আন-নাহবী, আবু মাওদূদ আল বাসরী (রাহিমা ল্‌হুমল্লাহ) ও আরো অনেকে।^৯

ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও 'ইমাম নাসাঈ (রহ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁকে “ছিকা” বা বিশ্বস্ত বলেছেন। আর আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল- 'ইজলী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:’^{১০}

تابعى ثقة، و كان من خيار أهل البصرة.

“তিনি একজন তাবি'ঈ, বিশ্বস্ত এবং বাসরার উত্তম মানুষদের একজন ছিলেন।”

ইবন 'উলাইয়া তাঁকে বসরার অন্যতম হাফিজে হাদীছ বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ তাঁকে হাদীছ বিশারদ বলেছেন।^{১১}

পৃথিব সকল চাওয়া-পাওয়ার প্রতি উদাসীনতা ও আল্লাহ-ভীতি ছিলো তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ইবাদাত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রতি ছিলেন একান্ত মনোযোগী। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাফলী (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষ। তাঁর রাত অতিবাহিত হতো সালাতে দাঁড়িয়ে, আর দিন কাটতো সাওম পালন অবস্থায়। তিনি ছিলেন আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা।^{১২} ইবন সা'দ তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:^{১৩}

وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلى الليل كله بوضوء عشاء الآخرة، وكان هو وا بنه يدوران بالليل في المساجد فيصلان في هذا المسجد مرة و في هذا المسجد مرة، حتى يصبحا.

“তিনি ছিলেন অতি পরিশ্রমী 'আবিদের একজন। সালাতুল 'ঈশার অজুতে সারারাত সালাত আদায় করতেন। তিনি ও তাঁর ছেলে (মু'তামির) রাতে বিভিন্ন মাসজিদে যেতেন একং কখনো এ মাসজিদে কখনো ও মাসজিদে সালাত আদায় করতেন। এভাবে সকাল হয়ে যেত।”

সা'ঈদ ইবন 'আমির আদ-দাব'ঈ বলেন, সুলায়মান আত-তায়মী প্রতি সাজদায় সত্তর (৭০)

৯. প্রাক্ত

১০. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৯
১১. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৭০
১২. শাযারাত আয যাহাব, খ-১, পৃ-২১২
১৩. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৬৯

বার করে তাসবীহ পাঠ করতেন। তিনি আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন।^{১৪}

সাওম পালনে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো। সারা বছরই সাওম পালন করতেন। তাঁর ছেলে মু'তামির বলেন:^{১৫}

مكث أبى أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما.

“আমার পিতা চল্লিশ বছর যাবত একদিন সাওম পালন করেছেন

এবং একদিন ইফতার করেছেন। অর্থাৎ সাওম পালন করেন নি।”

আল্লাহ-ভীতি তাঁর শিরা-উপশিরা ও রক্ত-মাংশে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ইয়াহইয়া আল-কাস্তান বলেন:^{১৬}

ما رأيت أخوف لله منه

“আমি তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহ-ভীরু কাউকে দেখিনি।”

তিনি খুব বেশি বেশি দান-খয়রাত করতেন। জারীর ইবন ‘আবদিলাহ আল-বাজালী (রহ) বলেন, সুলায়মান সব সময় দান-খয়রাত করতেন। যখন সাদাকা করার কিছুই থাকতোনা তখন তার পরিবর্তে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করতেন।^{১৭}

তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো সৎকাজের মাধ্যমে। হাম্মাদ ইবন সালামা বলেন:^{১৮}

ماأتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها الا و جدناه مطيعا، و كنا نرى أنه لا يحسن يعص الله.

“যখন আমরা আল্লাহর ‘ইবাদাতের সময় সুলায়মান আত-তায়মীর

নিকট যেতাম তখন তাঁকে আল্লাহর অনুগত হিসেবেই পেতাম।

আমরা মনে করতাম যে, তাঁর মধ্যে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার

যোগ্যতা নেই।”

মু‘আয ইবন মু‘আয তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখনই তায়মীকে দেখতাম, তাঁকে একজন তরুণ যুবক মনে হতো, যে ইবাদাতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। লোকেরা বলতো, সুলায়মান তাঁর এ ইবাদাত আবু ‘উহমান আন-নাহদীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। মু‘আয আরো বলেন, আমি সুলায়মানের ‘ইবাদাতকে কেবল একজন যুবকের ‘ইবাদাতের সাথেই তুলনা করি, যে প্রথম এই কঠোরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

১৪. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৫১

১৫. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৭০

১৬. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৫১

১৭. ইবন সা‘দ আত-তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১৩৫; তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৫১

১৮. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৭০

পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়

পার্থিব জীবনে এত সতর্কভাবে চলা এবং এত বেশি পরিমাণে 'ইবাদাত-বন্দেগী' করা সত্ত্বেও সব সময় পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকতেন। নিজের এতসব 'আমলের উপর' আস্থা রাখতে পারতেন না। ফুদাইল ইবন 'আয়্যাদ (রহ) বলেন,^{১৯} "একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর এমন অস্থির ভাব দেখে বললেন, আপনি তো আপনিই, আপনার সমকক্ষ আর কে আছে? তিনি বললেন, তোমরা এমন কথা বলো না। আমি জানি না আমার রব (প্রভু) আমার সাথে কেমন আচরণ করবেন। আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

"এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।"^{২০}

অতি সামান্য ব্যাপারেও পাকড়াও ও জবাবদিহির ভয় করতেন। সাঈদ ইবন 'আমির বলেন, একবার সুলায়মান অসুস্থ্য হলেন। এ অবস্থায় কাঁদতে লাগলেন। একজন জিজ্ঞেস করলো, আপনার এই কান্নার কারণ কি? বললেন : একবার আমি একজন কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের লোকের পাশদিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম করেছিলাম। আমার এখন ভয় হচ্ছে, এজন্য আমাকে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে না হয়।^{২১} উল্লেখ্য যে, 'কাদরিয়্যা' একটি মুসলিম শ্রান্ত চিন্তা গোষ্ঠীর নাম।

তিনি "আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার" তথা সংকাজের আদেশ ও অসং কাজ থেকে নিষেধ করাকে ফরয মনে করতেন। এ কারণে তিনি আমীর উমারার প্রাসাদে গিয়েও এই ফরয আদায় করতেন।^{২২}

সর্ব যুগেই ধর্ম পালনে সহজ পন্থা অবশেষকারী কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায়। তারা বিশেষ কোন মাযহাব অনুসরণ করতে চায় না। বরং যে মাযহাবের যে কাজটি সহজ মনে করে সেটি পালন করে। তারা যুক্তি দেয় যে, সকল ইমাম এবং তাঁদের মত ও পথ যখন সত্য ও সঠিক তখন বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করা একান্ত জরুরী হবে কেন?

الدীন دین হলো সহজ। সুতরাং তাঁদের যে সিদ্ধান্তগুলো পালন করা সহজ তা কেন গ্রহণ করা হবে না? সুলায়মান (রহ) এ ধরনের সহজপন্থী তথা সুবিধাবাদীদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সুন্দর একটি মন্তব্য করতেন। তিনি বলতেন:^{২৩}

১৯. তাজকিরাতুল হক্কাজ, খ-১, পৃ-১৫১

২০. সূরা আয-যুমার, আয়াত-৪৭

২১. তাজকিরাতুল হক্কাজ, খ-১, পৃ-১৫২

২২. আল ইমাম আশ-শা'রানী, আত-তাবাকাত আল কুবরা, খ-১, পৃ-৩২

২৩. তাহযীব আল কামাল, খ-৮, পৃ-৭১

لَوَأْخَذْتَ بِرِخْصَةِ كُلِّ عَالَمٍ أَوْ زَلَّةِ كُلِّ عَالَمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ.

“তুমি যদি সকল ‘আলিমের বৈধতা দান অথবা সকল ‘আলিমের
ভুলকে গ্রহণ করো তাহলে সকল মন্দ তোমার মধ্যে সমবেত হবে।”

মৃত্যু

তিনি ১৪৩ হিজরীর মুলকা’দা মাসে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিলো
৯৩ বছর।^{২৪}

সাফওয়ান ইবন সুলাইম আয-যুহরী (রহ)

সাফওয়ানের (রহ) ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবুল হারিছ এবং পিতার নামের ব্যাপারে একটু মতপার্থক্য আছে। অনেকে 'সুলাইম' এবং অনেকে 'সালাম' বলেছেন। সাফওয়ান ছিলেন মাদীনার বিশিষ্ট তাবি'ঈদের একজন।'

জ্ঞান ও মনীষা

সাফওয়ানের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো যুহুদ ও তাকওয়া তথা পার্শ্বিভ ভোগ-বিলাস বিমূখতা ও আল্লাহ ভীতি। তবে জ্ঞান চর্চার জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন:^১

وكان ثقة حجة من أعلام الهدى.

“তিনি ছিলেন অতি আস্থাভাজন, হুজ্জাত তথা দলীল-প্রমাণতুল্য সঠিক পথপ্রাপ্ত বিশিষ্টজনদের একজন।”

তিনি যে সকল মহান সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শোনে এবং যাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন তাঁরা হলেন: 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আনাস ইবন মালিক, আবু 'উমামা ও জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ। আর তাবি'ঈন কিরাম, যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ছা'লাবা ইবন আবী মালিক আল-কুরাজী, হামযা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, হুমাইদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ, যাকওয়ান আবী সালিহ আস-সাম্মান, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ ইবন সালামা, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, সালমান আল-আগার, সুলায়মান ইবন 'আতা, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, তাউস ইবন কায়সান, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার, 'আবদুল্লাহ ইবন সালমান আল-আগার, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ, 'আবদুর রহমান ইবন সা'দ আল-আ'রাজ আল-মাক'আদ, 'আবদুর রহমান ইবন আবী সা'ঈদ আল-খুদরী, 'আবদুর রহমান ইবন গানম আল-আশ'আরী, 'আবদুর রহমান ইবন হরমূয আল-আ'রাজ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন তালহা, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, 'আতা ইবন ইয়াসার, ইকরিমা মাওলা ইবন 'আব্বাস, 'আলী ইবন আল হাসান ইবন আবিল হাসান আল বাররাদ, 'উমার ইবন ছাবিত, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আস-সিন্দীক, কুরাইব মাওলা ইবন 'আব্বাস, নফি' ইবন জুবায়র ইবন যুত'ইম, নফি' মাওলা ইবন 'উমার, আবু 'উমামা সাহল ইবন হনাইফ, আবু বুররা আল-গিফারী, আবু সা'ঈদ

১. তাজকিরাতুল হফফাজ, খ-১, পৃ-১৩৪; তাবি'ঈন, পৃ-৩০১

২. তাজকিরাতুল হফফাজ, খ-১, পৃ-১৩৪

মাওলা 'আমির ইবন 'আবদিদ্বাহ ইবন কুরাইয, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ, উনাইসা ও উম্মু সা'দ বিন্তু 'আমর আল-জুমাহিয়া (রহ)।^৩

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। নিম্নে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো: ইবরাহীম ইবন সা'দ, ইবরাহীম ইবন তাহমান, উসামা ইবন যায়দ ইবন আসলাম, উসামা ইবন যায়দ ইবন আল-লায়ছী, ইছহাক ইবন ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ আল মাদানী, আবু দামরা আনাস ইবন 'ইয়াদ আল-লায়ছী, বাকর ইবন 'আমর আল-মু'আফিরী, যায়দ ইবন আসলাম, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, সুলায়মান ইবন 'আবদিল আযীয আল-আয়লী, 'আবদুর রহমান ইবন ইছহাক আল-মাদানী, 'আবদুল মালিক ইবন জুরাইজ, লায়ছ ইবন সা'দ, মালিক ইবন আনাস, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন 'আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়ছী, মুসা ইবন 'উকবা, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (রহ) ও আরো অনেকে।^৪

মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে তাঁকে মাদীনাবাসী মনীষীদের চতুর্থ স্তরে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে:

كان ثقة كثير الحديث عابدا.

“তিনি ছিলেন অতি আস্থাভাজন, বহু হাদীছের ধারক-বাহক একজন
‘আবিদ (তাপস) মানুষ।”

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না সাফওয়ানের সূত্রে বর্ণনাকালে এভাবে বলতেন:

حدثني صفوان بن سليم، وكان ثقة.

“সাফওয়ান ইবন সুলাইম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন একজন “ছিকা” তথা বিশ্বস্ত ব্যক্তি।” ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আহমাদ ইবন 'আবদিদ্বাহ আল-ইজলী, আবু হাতিম, নাসাঈ ও ইয়া'কুব ইবন শায়বা (রহ) - তাঁরা সকলে সাফওয়ানকে একজন “ছিকা” তথা পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।^৫

ফিকহী বিষয়েও সাফওয়ান (রহ) পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে ‘আল-ফাকীহ’ বলে উল্লেখ করেছেন।^৬ তিনি মাদীনাতুর রাসূল-এর ফাকীহগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন।^৭ ইবনুল

৩. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা আর-রিজাল, খ-৯, পৃ-১০৯, ১১০

৪. প্রাগুক্ত; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৪২৫

৫. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১০, ১১১

৬. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১৩৪

৭. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৪২৫

‘ইমাদ আল- হাম্বলী (রহ) তাঁকে ‘ফাকীহ আল-কুদওয়াহ্’ আদর্শ ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।^৮

ইবাদাত-বন্দেগী

সাফওয়ান ইবন সুলাইমের (রহ) জীবনের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর দুনিয়া বিরাগী মনোভাব ও আল্লাহ-ভীতি। ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁর আর কোন কাজই ছিলো না। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলেন:^৯

ثقة من خيار عباد الله تعالى يستول بذكره القطر.

“আল্লাহ তা‘আলার উত্তম বান্দাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি। যার অসীলায় বৃষ্টিপাতের জন্য দু‘আ করা হতো।”

ইবাদাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তাঁর সেই কঠোরতার একটি বর্ণনা দিয়েছেন মালিক ইবন আনাস (রহ) এভাবে:^{১০}

كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح، و في الصيف في بطن البيت، يتقط بالحر و البرد، حتى يصبح.

“সাফওয়ান ইবন সুলাইম শীতকালে ঘরের ছাদে এবং গ্রীষ্মকালে ঘরের ভীতরে সালাত আদায় করতেন। গরম ও ঠান্ডায় জেগে থাকার উদ্দেশ্যে এমনটি করতেন। এভাবে সকাল হয়ে যেত।”

মালিক ইবন আনাস (রহ) আরো বলেন:^{১১}

و أنه لترم رجلاه حتى يعود كالسقط من قيام الليل.

“কিয়ামুল লাইল তথা রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা দুটি ফুলে যেত, এমন কি তিনি পড়ে যেতেন।”

অত্যাধিক সাজদা করার কারণে তাঁর কপালে ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। সুফইয়ান ইবন ‘উয়ায়না বলেন:^{১২}

حلف صفوان ألا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله، مكث على هذا ثلاثين عاما فمات و أنه جالس

“সাফওয়ান শপথ করেন যে, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব

৮. শাজারাত আয-যাহাব, খ-১, পৃ-১৮৫

৯. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১১

১০. প্রাণ্ড

১১. তাজকিরাতুল হফাজ, খ-১, পৃ-১৩৪

১২. প্রাণ্ড

পর্যন্ত মাটিতে নিজের পার্শ্বদেশ ঠেকিয়ে ঘুমাবেন না। এই শপথের উপর তিনি তিরিশ বছর অটল থাকেন।”

অতপর তিনি বসা অবস্থায় মারা যান। মেয়ে তাঁকে বলতেন, আব্বা! আপনি যদি একটু শুইতেন তাহলে ভালো হতো। জবাবে তিনি বলতেন, মেয়ে! তাহলে তো আমি আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হবো।^{১০}

অবশ্য মুহাম্মাদ ইবন মানসুর চল্লিশ বছর সাফওয়ান বিছানায় পাশ ঠেকিয়ে ঘুমান নি বলে উল্লেখ করেছেন।

কেউ যখন কোন বিষয় বা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার উপরে আর উঠা সম্ভব নয়, তখন সেটাকে পূর্ণতা তথা কামিলিয়াতের স্তর বলে। ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাফওয়ান (রহ) এই পূর্ণতা তথা কামিলিয়াতের স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তাঁর এই অবস্থার বর্ণনা আনা'স ইবন 'ইয়াদ (রহ) দিয়েছেন এভাবে:^{১১}

رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ سَلِيمٍ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: غَدَا الْقِيَامَةُ، مَا كَانَ عَنْدهُ
مَزِيدَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةِ.

“আমি সাফওয়ান ইবন সুলাইমকে (ইবাদাতের এমন পর্যায়ে) দেখেছি যে, তাঁকে যদি বলা হতো আগামীকাল কিয়ামাত হবে, তাহলে তিনি যে স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ইবাদাতের সামান্য কিছু বৃদ্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।”

অর্থাৎ ইবাদাত-বন্দেগীতে তিনি তাঁর সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। আবদুল আযীয ইবন আবী হাযিম (রহ) বলেন, একবার সাফওয়ান তাঁর মক্কার সফরে আমাকে সংগে নিলেন। ঘর থেকে বের হয়ে ঘরে ফেরা পর্যন্ত উটের পিঠের হাওদায় একবারও ঘুমানোর জন্য পাশ দিলেন না।^{১২}

আমরা জানি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতের কথা বলেছেন। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। সাফওয়ান (রহ) এ কাজটি বেশি বেশি করতেন। মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আত-তাম্মার বলেন, সাফওয়ান (রহ) বছরের বিভিন্ন সময়ে মাদীনার আল বাকী' গোরস্তানে যেতেন। একদিন তিনি আমার পাশ দিয়ে গেলেন। সেখানে কী করেন তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম তিনি মাথা ঢেকে গোরস্তানে প্রবেশ করে একটি কবরের পাশে বসে খুব কাঁদলেন। তাঁর সেই কাঁদা দেখে তাঁর প্রতি আমার খুব দয়া হলো। আমি মনে করলাম, কবরটি হয়তো তাঁর পরিবারের কোন

১৩. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১১

১৪. প্রাণ্ড, সাফওয়ানুস সাফওয়ান, পৃ-১৪৮

১৫. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১১

সদস্যের হবে। এভাবে আরেক দিন তাঁকে আমার পাশ দিয়ে যেতে দেখে আমি তাঁকে আবার অনুসরণ করলাম। দেখলাম তিনি আরেকটি কবরের পাশে বসে পূর্বের দিনের মতো খুব কাঁদলেন। ব্যাপারটি আমি মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদিরকে (রহ) বললাম, এবং এ কথাও তাঁকে জানালাম যে, আমার ধারণা ঐ কবরগুলি হয়তো তাঁর পরিবারের লোকদের। আমার কথা শুনে মুহাম্মাদ বললেন, এই বাকী'র সব মূর্দাই তাঁর আত্মীয় ও ভাই-বন্ধু। আসলে তিনি যখন তাঁর অন্তরে কঠোরতা অনুভব করেন তখন এখানে এসে মৃতদের স্মরণ করে তা দূর করেন।^{১৬}

আল মুনকাদির ইবন মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ) বলেন, একবার একটি জানাযায় আমরা সাফওয়ানের সংগে ছিলাম। উক্ত জানাযায় আমার পিতা মুহাম্মাদ ও আবু হাযিমও (রহ) ছিলেন। তাঁরা কয়েকজন 'আবিদ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর সালাতুল জানাযা আদায় করা হলো। তারপর সাফওয়ান বললেন:^{১৭}

أما هذا فقد انقطعت أعماله، واحتاج إلى دعاء من خلف بعده.

“এই ব্যক্তির সকল 'আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সে এখন যাদেরকে তার পিছনে রেখে গেছে তাদের দু'আর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।”

একথা বলে তিনি এবং সেখানে উপস্থিত সকলে কাঁদলেন।

আবু যুহরাহ (রহ) বলেন, আমি সাফওয়ান ইবন সুলাইমকে এ কথা বলতে শুনেছি:

في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا، وإن كان ذا ععض وكرب.

“মুমিনের জন্য মৃত্যুর মধ্যে দুনিয়ার কঠোরতা থেকে আরাম ও শান্তি আছে। যদিও তা অনেক যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক।”

অতঃপর তাঁর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।^{১৮}

দানশীলতা

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। হাতে কিছু অর্থকড়ি আসলেই তা আত্মাহর পথে খরচ করে ফেলতেন। সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, একবার সাফওয়ান হাজ্জে গেলেন। সংগে মাত্র সাতটি দীনার ছাড়া আর কোন অর্থ ছিলো না। তিনি সেই দীনারগুলো দিয়ে একটি কুরবানী পশু কিনে ফেললেন। যখন তাঁকে বলা হলো, আপনার কাছে তো আর কোন অর্থ নেই, কেন

১৬. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১১

১৭. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১২

১৮. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১২

আপনি সবক'টি দীনার পশু কেনার কাজে ব্যয় করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহকে এ কথা বলতে শুনেছিঃ”

وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَارِ اللَّهِ، لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ.

“এবং কুরবানীর পশুকে আমি করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলির

অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মজল রয়েছে।”২০

গরীব-দুঃখীকে দানের অবস্থা এমন ছিলো যে, মাঝে মধ্যে শরীরের কাপড়-চোপড়ও খুলে অভাবীকে দিয়ে দিতেন। একদিন প্রচণ্ড শীতের রাতে তিনি মাসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে কোন কাপড় নেই। সাথে সাথে তিনি নিজের গায়ের কাপড় খুলে তার গায়ে পরিয়ে দেন।^{২১}

অর্থ-সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি

অর্থ-সম্পদের প্রতি একেবারেই আগ্রহ ছিলোনা। তৎকালীন অনেক শাসক ও আমীর-উমারা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে চাইতেন, কিন্তু তিনি কারও সাহায্য গ্রহণ করতেন না। একবার তিনি তাঁর রুটিন মতো মাসজিদে নববীতে ইবাদাতে নিমগ্ন আছেন। এমন সময় তৎকালীন মুসলিম জাহানের খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক মাদীনার গভর্নর 'উমার ইবন আবদিল আযীযকে সংগে নিয়ে মাসজিদ পরিদর্শনে আসেন। সালাতুজ জুহর আদায়ের পর তিনি সাফওয়ানকে দেখতে পেলেন। পূর্ব থেকে তিনি তাঁকে চিনতেন না। তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে বলেন, এমন উজ্জ্বল চেহারার মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। লোকটি কে? 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! ইনি সাফওয়ান ইবন সুলাইম। খলীফা তাঁর নাম শুনে পাঁচশ দীনারপূর্ণ একটি থলি চাকরের হাতে দিয়ে বলেন, এটি সাফওয়ানকে দিয়ে এসো। চাকর থলিটি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললো, এই মুদ্রা ভর্তি থলিটি আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে হাদীয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি এখন মাসজিদেই আছেন। সাফওয়ান বললো, সম্ভবত তুমি ভুল করছো, তিনি হয়তো এটি অন্য কারো জন্য পাঠিয়েছেন। চাকরটি বললো, আপনি কি সাফওয়ান নন? বললেন : হ্যাঁ, আমি সাফওয়ান। চাকর বললো তাহলে এটি আপনাকেই দিয়েছেন। এবার সাফওয়ান বললেন, তাহলে ফিরে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে এসো। চাকর যেই না জিজ্ঞেস করার জন্য ফিরে গেলো, অমনি সাফওয়ান খুব দ্রুত মাসজিদ থেকে উঠে বাইরে যান। সুলায়মান মাসজিদে থাকা অবস্থায় তিনি আর ফিরে আসেন নি।^{২২}

১৯. সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত-৩৬

২০. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১২

২১. সাফওয়াতুস সাফওয়া, পৃ-১৪৮

২২. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১০৭; তাৰি'ঈন, পৃ-২০২, ২০৩

আল-ওয়াকিদী, ইবন সা'দ, খলীফা ইবন খায়্যাভ, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন নুমাইর, আবু 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম প্রমুখ ঐতিহাসিক হিজরী ১৩২ সনে সাফওয়ানের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর।^{২৭}

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) আরো বলেন, মাদীনার কবর খননকারীদের একজন আমাকে বলেন, একবার কবর খুঁড়তে খুঁড়তে একটি কবরে মাথার একটি খুলি পাই, যাতে সিঁজদার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম: কবরটি কার? লোকেরা বললো, তুমি জাননা? এতো সাফওয়ান ইবন সুলাইমের কবর।^{২৮}

২৩. তাজকিরাতুল হফ্ফাজ, খ-১, পৃ-১৩৪; তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১৩

২৪. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১১৩

‘আমর ইবন মুররা আল মুরাদী (রহ)

‘আমর (রহ)-এর ডাকনাম আবু ‘আবদুল্লাহ এবং পিতার নাম মুররা ইবন ‘আবদিল্লাহ। তাঁর পূর্ব পুরুষের মধ্যে দু’ব্যক্তির নাম ছিলো জামাল ও মুরাদ এ কারণে তাঁর পরিচয় দানকালে তাঁকে আল জামালী ও আল-মুরাদী বলা হয়। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী ও জন্মাক্ত মানুষ।^১

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি ছিলেন কুফার শ্রেষ্ঠ ‘আলিমদের একজন। হাদীছের একজন হাফিজ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে “আমর ইবন মুররা আল-হাফিজ” বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসায় আরো লিখেছেন:^২

كَانَ ثَقَّةً ثَبَاتًا إِمَامًا لَهُ مَائِقَى حَدِيثٍ.

“তিনি ছিলেন অতি বিশ্বাসভাজন দৃঢ়পদ ইমাম। তাঁর বর্ণিত দু’শো হাদীছ আছে।”

আবু হাতিম তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেছেন।

ইয়াহইয়া ইবন মাঈনও তাঁকে “ছিকা” তথা বিশ্বস্ত বলে সত্যায়ন করেছেন।^৩

মিস‘আর বলতেন:^৪

مَا أَدْرَكَتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْهُ.

“আমি তাঁর চাইতে উত্তম আর কাউকে পাইনি।”

‘আবদুর রহমান ইবন মাহদী তাঁকে কুফার হাদীছের হাফিজদের মধ্যে গণ্য করতেন।^৫ হাফস ইবন গিয়াছ বলতেন:^৬

مَا سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَثْنِي عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى عَمْرِو بْنِ مَرْوَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ مَا مَوَّنَا عَلَى مَا عِنْدَهُ.

“আমি আল-আ‘মশের মুখ থেকে একমাত্র ‘আমর ইবন মুররা

-
১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা’ আর-রিজাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৪; তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১২১
 ২. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১২১
 ৩. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৫
 ৪. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১২১
 ৫. প্রাগুক্ত
 ৬. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৫

ছাড়া আর কারো প্রশংসা শুনি। তাঁর সম্পর্কে তিনি বলতেন:
তিনি (‘আমর) তাঁর নিকট রক্ষিত হাদীছের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও
নিরাপদ।”

একবার শু‘বাকে (রহ) ‘আমর ইবন মুররা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন:

كان أكثرهم علما.

“তাঁর জ্ঞান ছিলো সবচাইতে বেশি।”

তিনি আরো বলতেন:^৭

ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلّس إلا عبد الله بن
عمر و عمرو بن مرة.

“আমি হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি যাদের
বর্ণনায় কিছুনা কিছু ত্রুটি হয় নি। তবে ‘আবদুল্লাহ ইবন আওন ও
‘আমর ইবন মুররা এর ব্যতিক্রম।”

একবার ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলকে (রহ) ‘আমর ইবন মুররা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে
তিনি তাঁর প্রশংসা করেন।^৮

অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনাও
করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

মহান সাহাবী ‘আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা), ইবরাহীম আন-নাখাঈ, আল-হাসান ইবন
মুসলিম ইয়ানাক, খায়ছামা ইবন ‘আবদির রহমান আল-জা‘ফী, যাহান ইবন ‘উমার, সালিম
ইবন আবিল জা‘দ, সালিম আল-আফতাস, সা‘দ ইবন ‘উবায়দা, সাঈদ ইবন জুবায়র,
সাঈদ ইবন আল-মুসায়ায, আবু ওয়ায়িল শাকীক ইবন সালামা, তাল্ক ইবন হাবীব,
‘আসিম আল ‘আনাযী, ‘আবদুল্লাহ ইবন আল হারিছ আন-নাজরানী, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর
মাওলা আল-হাসান ইবন ‘আলী, ‘আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, ‘আবদুর রহমান ইবন
ছাবিত আল-জুহাযী, ‘আমর ইবন মায়মুন আল-আওদী, ‘আওন ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন
‘উতবা, মুররা ~~আবু~~ তায়্যিব, হিলাল ইবন ইয়াসাক, ইয়াহইয়া ইবন আল-জাযযার, আবু
বুরদা ইবন আবী মূসা আল-আশ‘আরী, আবু হামযা মাওলা আল-আনসার, আবু ‘উবায়দা
ইবন ‘আবদিল্লাহ ইবন মাসউদ (রহ) ও আরো অনেকে।”

তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

৭. প্রাণ্ড; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৮, পৃ-১০৩

৮. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৫

৯. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৪; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৮, পৃ-১০২

ইদরীস ইবন ইয়াযীদ আল-আওদী, হুসাইন ইবন 'আবদির রহমান আস-সুলামী, যায়দ ইবন আবী উনায়সা, আবু সিনান সাঈদ ইবন সিনান আশ-শায়বানী, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুলায়মান আল-আ'মাশ, শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন মুররা (ছেলে), 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিদ্বাহ আল-মাস'উদী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওয়াঈ, আল-আওয়াম ইবন হাওশাব, কায়স ইবন আর-রাবী', মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিদ্বাহ আল-মুরাদী, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আবী লায়লা, মিস'আর ইবন কিদাম, মানসূর ইবন আল-মু'তামির, আবু ইসহাক আস-সাবীঈ (রহ) ও আরো অনেকে।^{১০}

ইবাদাত-বন্দেগী

তিনি 'ইলমের সাথে 'আমলেও সমৃদ্ধ ছিলেন। অত্যধিক বিণয় ও ভীতির সাথে সালাত আদায় করতেন। সালাতে দাঁড়ালে তাঁর অবস্থা দেখে মনে হতো সালাতের অবস্থায়ই তাঁর সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যেমন শু'বা বলতেন:^{১১}

ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا طنت أنه لا يفتل حتى يستجاب له.

“যখনই আমি 'আমর ইবন মুররাকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখেছি, আমার মনে হয়েছে সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তা কবুল হয়ে যাবে।”

হিজরী ১১৬ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর দাফনের পূর্বে 'আবদুল মালিক ইবন মায়সারা সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন:^{১২}

إني لأحسبه خير أهل الأرض.

“আমি তাঁকে পৃথিবীবাসী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ মনে করি।”

মিস'আর বলতেন, 'আমর ইবন মুররার চাইতে বেশি ভালো মানুষ এবং তাঁর চাইতে আমার বেশি প্রিয় ব্যক্তি কৃফায় আর কেউ নেই।^{১৩}

হিজরী ১১৬ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।^{১৪}

১০. প্রাপ্ত

১১. প্রাপ্ত

১২. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১২২

১৩. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-৩৩৫

১৪. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-১২২

সাফওয়ান ইবন মুহরিয় আল-মায়িনী (রহ)

সাফওয়ান (রহ) ছিলেন বসরার একজন দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ ও তাবি'ঈ ব্যক্তিত্ব। বানু তামীমের শাখা গোত্র বানু মায়িনের সন্তান ছিলেন। আল-আসমা'ঈ বলেন, তিনি বানু মায়িনের লোক নন বরং তাদের মাঝে বসবাস করতেন, তাই আল-মায়িনী বলা হয়। অনেকে তাঁকে বানু বাহিলার সন্তান বলেছেন।^১

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান চর্চার জগতে তিনি অত্যাচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তবে এ জগত থেকে একেবারে দূরে ছিলেন তাও বলা যাবে না। তিনি বসরার বা-‘আমল তথা ‘ইলম অনুযায়ী ‘আমলকারী ‘আলিমদের একজন ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন অনেক গুণ-কৃতিত্বের অধিকারী আব্বাহ-ভীরু মানুষ।^২ এছাড়া তিনি হাদীছ বর্ণনায় একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব।^৩

ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন:^৪

أحد العلماء العاملين.

“তিনি ছিলেন ‘আমলকারী ‘আলিমদের একজন।”

আল ইজলী বলেন,

بصرى تابعى ثقة.

“তিনি একজন বিশ্বস্ত বসরী তাবি'ঈ।”^৫

যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে সাহাবা ও তাবি'ঈন উভয় শ্রেণীর মানুষ আছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন: ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার, ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস, ‘ইমরান ইবন হুসাইন, আবু মূসা আল-আশ'আরী, হাকীম ইবন হিয়াম, জুনদুব আল-বাজালী (রা)।^৬

উল্লেখিত সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন।

বহুসংখ্যক তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ-৯, পৃ-১২৫; তাবি'ঈন, পৃ-২০৩
২. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১২৫
৩. ইবন সা'দ আত তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১০৭
৪. তাজকিরাতুল হুফাজ, খ-১, পৃ-৬০
৫. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৩৭৮
৬. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১২৫

বাকর ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-মুযানী, ছাবিত আল-বুনানী, আবু সাখরা জামি’ ইবন শাদ্দাদ, আল-হাসান আল-বাসরী, খালিদ ইবন ছাবিত আর-রাব্বাঈ, খালিদ ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-আশাজ্জ, আর-রাব্বী’ ইবন আনাস আল-খুরাসানী, আবুল মিনহাল সায্যার ইবন সালামা, ‘আসিম আল-আহওয়াল, ‘আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ আল-আনসারী, ‘আলী ইবন যায়দ ইবন জুদ‘আন, গায়লান ইবন জারীর, কাতাদা ইবন দি‘আমা, লাইছ ইবন আবী সূলাইম, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি’, মুওয়াররিক আল-‘ইজলী, আবু হামযা আল-বাসরী (রহ) ও আরো অনেকে।^৭

‘ইলম অনুযায়ী ‘আমল করা

বহু ‘আলিমকে দেখা যায় তারা তাদের ‘ইলম অনুযায়ী ‘আমল করেন না। ইসলাম এরূপ ‘ইলমের কোন গুরুত্ব দেয় না। আল-কুরআনেও এমন ‘আলিমকে খিক্কার দেওয়া হয়েছে। যেমন আল কুরআনে এসেছে:^৮

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

“তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর খুবই অসন্তোষজনক।”

সাফওয়ানও বিশ্বাস করতেন, শুধু ‘ইলমের কোন গুরুত্ব নেই যতক্ষণ না তার উপর ‘আমল করা হয়। তিনি বলতেন যতক্ষণ ‘ইলম অনুযায়ী ‘আমল করা না হবে ততক্ষণ সেই ‘ইলম কোন উপকার করতে পারে না। তিনি আফসোসের সাথে বলতেন, হায়! আমি যদি কিছুই না জানতাম!^৯

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর এই বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তোলেন। ইবন হাজার আল-‘আসকিলানী (রহ) বলেন, তিনি একজন বড় মাপের ‘আবিদ তাবিঈ ছিলেন।^{১০} আর ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তো তাঁকে ملين العلماء العا. (একজন ‘আমলকারী ‘আলিম) বলে পরিচয় দিয়েছেন।^{১১} সূফিগণ বলে থাকেন, অন্তরের ফসল সবুজ-সতেজ হয় চোখের পানিতে। সাফওয়ানের চোখ দুটি সব সময় অশ্রু ভেজা থাকতো। আল-মিয়যী বলেন :

كان من العباد، اتخذ لنفسه سربا يكي فيه.

“তিনি ছিলেন একজন ‘আবিদ ব্যক্তি। নিজের জন্য একটি গোপন আস্তানা গড়ে তোলেন। সেখানে বসে শুধু কাঁদতেন।”^{১২}

৭. প্রাগুক্ত; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৪৩০

৮. সূরা আস-সাফ্ফ, আয়াত-৩

৯. সাফওয়াতুস সাফওয়া, পৃ-৫৯

১০. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৪৪

১১. তাজকিরাতুল হুফফাজ, খ-১, পৃ-৬০

১২. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১২৬

ইবন সা'দ বলেন, কেবল সালাত আদায়ের জন্য সেখান থেকে বের হতেন। সালাত শেষে খুব দ্রুত আবার সেখানে ফিরে যেতেন।^{১৩}

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ চর্চা ও আলোচনাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। গায়লান ইবন জারীর (রহ) বলেন:^{১৪}

كانوا يجتمعون هو وإخوانه يتحدثون، فلا يرون تلك الرقة،
فيقولون: يا صفيان حدث أصحابك. قال : فيقول : الحمد لله،
فيرق القوم، وتسيل دموعهم كأنها أفواه المزداد.

“তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা সমবেত হয়ে আলোচনা করতেন। যখন তাঁরা অন্তরের সেই নম্রতা দেখতেন না তখন বলতেন, সাফওয়ান! আপনি আপনার সংগী-সাথীদেরকে হাদীছ বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি যেই না “আল হামদু লিল্লাহ” উচ্চারণ করতেন, অমনি তাঁদের অন্তর বিগলিত হয়ে যেত। তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। যেন সে চোখগুলি পানিভরা মশকের মুখ।”

তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিলো রাত। নিয়মিত সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।^{১৫} পার্শ্বিক ভোগ-বিলাসের প্রতি মোটেই আগ্রহ ছিলো না। তিনি বলতেন, যদি আমার শরীর সক্ষম রাখার জন্য এক টুকরো রুটি ও পান করার জন্য কিছু পানি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমার দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর কোন প্রয়োজন নেই।^{১৬} এ দুনিয়াকে তিনি পাছশালার অতিরিক্ত কিছু মনে করতেন না। এ কারণে স্থায়ী কোন বাসস্থান নির্মাণ করেন নি। সারা জীবন একটি ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করে গেছেন। ঘরটি তেমন মেরামতও করতেন না। একবার ঘরটির একটি কাঠ ভেঙ্গে যায়। কাঠটি পাল্টানোর জন্য লোকেরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন, কালই তো মরতে হবে। ঘরের প্রকৃত মালিক যদি অতিরিক্ত কিছু দিন এতে থাকার সুযোগ দিতেন তাহলে পাল্টিয়ে নিতাম।^{১৭}

মাসজিদে হৈ চৈ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা মাসজিদের পরিপন্থি কাজ বলে মনে করতেন। একবার কিছু লোককে মাসজিদে ঝগড়া-বিবাদ করতে দেখে তিনি এ কথা বলতে বলতে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যান যে, তোমরা সবাই দাঙ্গাবাজ।^{১৮}

আমরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ-নিষেধ অত্যন্ত গুরুত্ব

১৩. আত তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১০৭

১৪. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১২৬

১৫. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৪, পৃ-৪৩০

১৬. আত তাবাকাত, খ-৭, পৃ-১০৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

সহকারে মেনে চলেন। অন্তিম রোগ-সজ্জায় পরিবারের লোকদের রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেন যে, জোরে কান্নাকাটি করা, মাথা ঠোকানো, কাপড় ফেড়ে ফেলা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে মাতম করা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের কাজ নয়।^{১৯} কিছুদিন রোগ-ভোগের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন সঠিকভাবে জানা যায় না। ইবন হিব্বান-এরু মতে তিনি খলীফা আবদুল মালিকের খিলাফতকালে হিজরী ৭৪ সনে মৃত্যু বরণ করেন।^{২০}

১৯. প্রাগুক্ত

২০. তাহযীব আল কামাল, খ-৯, পৃ-১২৬

‘আমর ইবন শুরাহবীল আল-হামদানী (রহ)

‘আমর (রহ)-এর ডাকনাম আবু মায়সারা এবং পিতার নাম শুরাহবীল। কুফার অধিবাসী এবং হামদান গোত্রের সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে আল-হামদানী ও আল-কুফী বলা হয়।’

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি মর্যাদাবান তাবি'ঈদের অন্তর্গত ছিলেন। আবু ওয়ায়িল (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:^১

كان من أفاضل أصحاب عبد الله

“তিনি ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) সংগী-সাথীদের একজন।”

তাঁর নিজ গোত্র হামদানে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিলো না। আবু ওয়ায়িল আরো বলতেন:^২

ما اشتملت همدانية على مثل أبي مسرة.

“হামদান গোত্রে আবু মায়সার মতো আর কেউ ছিলো না।”

একবার একজন জিজ্ঞেস করলো : কেন মাসরুক? বললেন, মাসরুকও না।

হাদীছ

হাদীছ স্মৃতিতে ধারণের ক্ষেত্রে মধ্যম স্তরের হাফিজে হাদীছের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি উঁচু স্তরের যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, সালমান ইবন রাবী‘আ, ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, ‘আলী ইবন আবী তালিব, ‘উমার ইবন আল খাত্তাব, কায়স ইবন সা‘দ ইবন ‘উবাদা, মা‘কাল ইবন মুকাররান আল-মুযানী, নু‘মান ইবন বাশীর, উম্মুল মু‘মিনীন ‘আয়িশা (রা) ও আরো অনেকে।^৩

আবু ওয়ায়িল শাকীক ইবন সালামা, আবু ইসহাক আস-সাবী‘ঈ, তালহা ইবন মুসাররিফ, আল-হাকাম ইবন ‘উতায়বা, ‘আমির আশ-শা‘বী, ‘উমারা ইবন ‘উমাইর, আল-কাসিম ইবন

১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা’ আর-রিজাল, খ-১৪, পৃ-২৪২

২. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা’ আর-রিজাল, খ-১৪, পৃ-২৪৩

৩. প্রাগুক্ত; ইবন সা‘দ আত তাবাকাত, খ-৬, পৃ-৭২

৪. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-২৪৩; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৮, পৃ-৪৭

মুখায়মারা, মালিক ইবন আল-হারিছ আস-সুলামী, মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান, মুহাম্মাদ ইবন আল মুনতশির, মাসরুক ইবন আল-আজদা' ও আবু 'উমারা আল-হামদানীর (রহ) মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনে এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন।^৫

আল কুরআনের তাফসীরেও তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা ছিলো। কোন কোন আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) মতের সাথে তাঁর মতটি মিলে যেত। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, একবার ইবন মাস'উদ (রা) সূরা আত্-তাকবীর-এর ১৫-১৬তম আয়াত

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ. الْجَوَارِ الْكُنُوسِ

এর অর্থ তাঁর নিকট জানতে চান। 'আমির বলেন, আমার মতে الْخُنُوسِ অর্থ নীল গাভী। ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, আমার মতও তাই।^৬

ইবাদাত-বন্দেগী

'ইলমের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে 'আমলও ছিলো। তিনি একজন বড় মাপের 'আবিদ ও পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি একজন 'আবিদ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। অতিরিক্ত সালাত আদায় ও সাজদার কারণে কপালে ও পায়ের জোড়া সমূহে উটের মতো কড়া পড়ে গিয়েছিলো।^৭ ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য পাক-পবিত্রতার প্রতিও অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, কেবল মাত্র পবিত্র অবস্থা ও স্থানে যিকর হওয়া উচিত।^৮

দানশীলতা

নিজের সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী দানশীলও ছিলেন। নিজের আয়-রোজগারের একটা অংশ অবশ্য তিনি দান-খয়রাত করে দিতেন। তাঁর এ বদান্যতা এবং সে ক্ষেত্রে একটি আলৌকিক ঘটনার কথা ইসরাঈল ইবন ইউনুস বর্ণনা করেছেন এভাবে:^৯

كان أبو ميسرة (عمرو) إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء إلى أهله فعدّوه وجدّوه سواء، فقال لبنى أخيه: ألا تفعلون مثل هذا؟ فقالوا له: لو علمنا أنه لا ينفص لفعّلنا.

“আবু মায়সারা ('আমর) যখন তাঁর ভাতা গ্রহণ করতেন, তার থেকে কিছুনা কিছু সাদাকা করে দিতেন। তারপর অবশিষ্ট অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরতেন এবং পরিবারের লোকদের হাতে তুলে

৫. প্রাগুক্ত

৬. আত তাবাকাত, খ-৬, পৃ-৭২

৭. তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৮, পৃ-৪৭

৮. আত তাবাকাত, খ-৬, পৃ-৭২

৯. প্রাগুক্ত; তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-২৪৩

দিতেন। তারা গুণে দেখতেন ভাতার সম্পূর্ণ অংশই ঠিক আছে।
একবার তিনি তাঁর ভাতীজাদেরকে বললেন: তোমরা এমন কর না
কেন? তারা বললো, আমরা যদি জানতাম দান করলেও কম হবে
না, তাহলে (আপনার মত) দান করতাম।”

আবু ওয়্যিল (রহ) আবু মায়সারা ‘আমরের একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছেন। আবু
মায়সারা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম জান্নাতে প্রবেশ করেছি। দেখলাম, অনেকগুলো গম্বুজ
বসানো আবু। বললাম : এগুলো কার জন্য? বলা হলো, যুল কালা’ ও হাওশাব-এর জন্য।
উল্লেখ্য যে, তাঁরা দু’জন মু‘আবিয়ার (রা) পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। অতপর আমি
জিজ্ঞেস করলাম: ‘আম্মার ও তাঁর সংগী-সাথীরা কোথায়? বলা হলো: সামনে। আমি বললাম:
তারা জান্নাতে আসলেন কিভাবে? তারা তো একে অপরকে হত্যা করেছেন। বলা হলো: তারা
আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার পর দেখতে পেল, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।”^{১০}

মৃত্যু

হিজরী ৬৩ সনে আবু জুহায়ফার পূর্বে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর
অসীয়াত মত কাজী শুরাইহ (রহ) তাঁর সালাতুল জানাযার ইমামতি করেন।”^{১১}

অন্তিম রোগশয্যায় তিনি আত্মীয়-বন্ধুদের বলেন, আমি মৃত্যুর জন্য একেবারে প্রস্তুত। সামনে
যে পর্যায়াবস্থার মুখোমুখি হতে হবে, তা ছাড়া আর কোন কিছুই ভয় আমার মধ্যে নেই।
আমার না আছে কোন অর্থ-সম্পদ যার জন্য আমার আফসোস থাকবে, না আছে ঋণের
বোঝা যা পরিশোধ করতে না পারার দুশ্চিন্তা, আর আমার না আছে পরিবার-পরিজন যাদের
জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমার মধ্যে কাজ করবে। আমার মৃত্যুর খবর কাউকে দিবে না।
দ্রুততার সাথে লাশ কবরের দিকে নিয়ে যাবে। যেহেতু কবরের উপর তাজা ও সবুজ ডাল
গেড়ে দেওয়া মুহাজিরগণ ভালো মনে করতেন তোমরাও আমার কবরের উপর একটি তাজা
ডাল গেড়ে দেবে। মুহাজিরগণ কবর উঁচু করা পছন্দ করতেন না, তাই আমার কবরও
তোমরা উঁচু করবে না। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর তালকীর দিবে।
এই অসিয়াতগুলো করার পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।”^{১২}

১০. তাহযীব আল কামাল, খ-১৪, পৃ-২৪৩

১১. আত তাবাকাত, খ-৬, পৃ-৭২; তাহযীব আত-তাহযীব, খ-৮, পৃ-৪৩

১২. আত তাবাকাত, খ-৬, পৃ-৭৩; তারিঙ্গিন, পৃ-২৭৬

বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী (রহ)

বসরার বিখ্যাত মুযায়না গোত্রের সন্তান বাকর (রহ)-এর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ এবং তাঁর ভাই 'আলকামা ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী।' বসরার শ্রেষ্ঠতম 'আলিমদের একজন ছিলেন বাকর। জ্ঞানের জগতে তারকাতুল্য হওয়ার কারণে আল হাসান আল বাসরীকে (রহ) যেমন 'শায়খুল বাসরা' বা বসরার প্রধান অভিভাবক বা দীক্ষাগুরু বলা হতো, তেমনি এই বাকরকে বলা হতো 'ফাতা আল বাসরা' বা বসরার যুবক অভিভাবক।^১

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ। ইবন সা'দ বলেন:^২

كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث حجة.

“তিনি ছিলেন পরম আস্থাভাজন, দৃঢ়পদ, বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক হুজ্জাত তথা দলীল-প্রমাণতুল্য মানুষ।”

হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, মুগীরা ইবন শু'বা, আনাস ইবন মালিক (রা) প্রমুখ উঁচু স্তরের সাহাবীদের নিকট থেকে। তেমনিভাবে বহু সংখ্যক বিখ্যাত তারিখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

হাসান আল-বাসরী, হামযা ইবন আল মুগীরা ইবন শু'বা, সাফওয়ান ইবন মুহরিয, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ আল-আনসারী, 'আদী ইবন আরতাত, 'উরওয়া ইবন আল মুগীরা ইবন শু'বা, 'আলকামা ইবন 'আবদিল্লাহ আল মুযানী, নাদার ইবন আনাস ইবন মালিক, ইউসুফ ইবন আয-যুবাইর, আবু তামীমা আল হুজায়মী, আবু রাফি' আস-সায়িগ, আবুল 'আলিয়া আর-রায্যাহী, আবুল মুতাওয়্যাক্কিল আন-নাজী (রহ) ও আরো অনেকে।^৩

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো:

ইবরাহীম ইবন 'ঈসা আল ইয়াশকুরী, আশ'আছ ইবন 'আবদিল মালিক, বাকর ইবন রুসতুম আল আ'নাক, ছাবিত আল বুনাঈ, হুমাইদ আত তাবীল, দাউদ ইবন আবী হিন্দ, সুলায়মান আত তায়মী, সালিহ ইবন বাশীর আল মুররী, 'আসিম আল আহওয়াল, 'আমির আল আহওয়াল, কাতাদা ইবন দি'আমা, মাতার আল ওয়াররাক, ইউনুস ইবন 'উবায়দ, মুবারাক ইবন ফুদালা (রহ) ও আরো অনেকে। বাকর (রহ)-এর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পঞ্চাশ পর্যন্ত

১. তাহযীব আল কামাল ফী আসমা আর রিজাল, খ. ৩, পৃ. ১৪০

২. ইবন সা'দ, আত্ তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ১৫২

৩. প্রাপ্ত

৪. তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ১৪০

পৌছে যায়।^৫

ফিকহ

ফিকহ বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : و كان فقيهاً - তিনি একজন ফকীহ ছিলেন।^৬ এই যোগ্যতার কারণেই 'কাজা' বা বিচারকের পদটি গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। বড় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি ভয় পেতেন। এ কারণে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি এই যুক্তি পেশ করেন যে, আমি লা শারীক আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি বিচার-ফায়সালা বিষয়ে আমার কোন যোগ্যতা নেই। আমি যদি আমার এ কথায় সত্যবাদী হই তাহলে অবশ্যই আমি এ পদের যোগ্য নই। আর যদি অসত্য বলে থাকি তাহলে মিথ্যাবাদী কাজী তথা বিচারকের পদের যোগ্য হতে পারে না।^৭

আকীদা-বিশ্বাস

তাঁর সময়ে আকীদাগত বিষয়ে অনেক নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার প্রচলন হয়। তিনি তা একেবারেই পছন্দ করতেন না। এমনকি সেই সব বিদ'আতী চিন্তা-বিশ্বাসমূলক কথা শুনতেও ঘৃণা করতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের পরিচ্ছন্ন ও সহজ-সরল আকীদার অনুসারী ছিলেন। সে সময় কাদরিয়া চিন্তা গোষ্ঠী যুক্তির আড়ালে আকীদাগত ব্যাপারে চরম মাতামাতি করে চলছিলো। তাদের কোন কথা বা যুক্তি বাকর (রহ)-এর কানে গেলে তার কাফফারা হিসেবে তিনি দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন।^৮

জীবন-যাপন

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে অঢেল অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন। আয়েশী ও বিলাসী জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও দানের প্রকাশ করতেন। সুন্দর ও দামী পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিলো। চার হাজার দিরহাম মূল্যের পোশাকও পরতেন। তাঁর রুচিও ছিলো অত্যন্ত মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। একবার চারশ' দিরহাম দিয়ে একটি চাদর খরিদ করে দর্জির নিকট নিয়ে যান পোশাক তৈরির জন্য। দর্জি চাদরটি বিছিয়ে কাটার জন্য মাটি দিয়ে চিহ্ন দিতে চান। কিন্তু তিনি তা করতে দিলেন না। পরে কর্পূর পিষে তা দ্বারা সেই কাপড়ে চিহ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।^৯

বিলাসী জীবন-যাপন করলেও তিনি মোটেও অহঙ্কারী ছিলেন না। বরং তাঁর দামী দামী

৫. প্রাগুক্ত, তাহযীব আত তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৮৪

৬. তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ১৪২; আত তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ১৫২

৭. আত তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ১৫৩; তারি'ঈন, পৃ. ৬১

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

পোশাক পরে অতি স্বাভাবিকভাবে নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে হাদীছ শোনাতেন।^{১০}

এত বিলাসবহুল ও চিন্তামুক্ত জীবন-যাপন সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ ও হতদরিদ্র হিসেবে উপস্থাপন করতেন। সব সময় আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে রিযিক দান কর, যাতে আমি বেশি বেশি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। আমি কেবল তোমার মুখাপেক্ষি, অন্য কারো নিকট আমার চাওয়ার নেই। হে আল্লাহ! আমার আশা-আকাংখা না আমার আয়ত্তে আছে, আর না আছে আমার প্রিয় কথাগুলো ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা। আমার সকল বিষয় অন্য কারো হাতে আবদ্ধ। আমার চাইতে বড় অভাবী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। এই দু'আ করার পর তিনি আবার বলতেন, হে আদমের সন্তান! তুমি এমন আরজু-আকাংখা করবে না যা আল্লাহর পরাক্রমশালীতার ব্যাপারে তোমাকে নির্ভয় করে তোলে, তেমনিভাবে এমন ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রকাশ করবে না যা আল্লাহর রাহমাত থেকে হতাশ করে দেয়।^{১১}

জীবন-যাপনে তিনি এমন কিছু আচার-আচারণ করতেন যা সব মানুষের জন্য অনুসরণীয়। যেমন : পথ চলার সঙ্গীর ব্যাপারে তিনি বলতেন, যদি তোমার চলার সঙ্গীর জুতার ফিতা ছিড়ে যায় এবং সে তা ঠিক করে নিতে পারে এতটুকু সময় তুমি তার জন্য অপেক্ষা না কর, অর্থবা সে পেশাব করতে বসলো এবং সে তা শেষ করা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করলে না, তাহলে তুমি তার সঙ্গী নও।^{১২}

তিনি নিজে যেমন কম কথা বলতেন, তেমনি মানুষকে বেশি কথা বলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন :

إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم توجر، و إن أخطأت فيه أئمت.

“বেশি কথা বলা পরিহার কর। তুমি যদি শুদ্ধ ও সঠিকও বল, তাতে তুমি কোন প্রতিদান পাবে না। আর ভুল বললে তুমি পাপী হবে।”

মৃত্যু

হিজরী ১০৬ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এ কথা বলেছেন ইমাম আল বুখারী, ‘আলী ইবন আল মাদীনী, ‘আমর ইবন ‘আলী ও আবু নাসর (রহ)। তবে ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর ও অন্যদের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ১০৮।

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

বুসর ইবন সাঈদ আল-মাদানী (রহ)

বুসর (রহ)-এর পিতার নাম সাঈদ। মদীনার কায়স গোত্রের জুদায়লা শাখার আল-হাদরামীদের বাড়িতে বসবাস করতেন এবং তাদের সাথে দাসত্বের সম্পর্ক ছিল। একারণে তাদের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্য তাঁকে “আল-মাদানী আল-হাদরামী” বলা হয়। একথা ইবন হিব্বান (রহ) তাঁর “আছ-ছিফাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।^১ দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও আল্লাহ ভীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তৎকালীন মদীনার সম্মানীয় ও বিশিষ্টজনদের একজন।^২

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে তিনি একজন ‘রাব্বানী ‘আলিম’ তথা আল্লাহ ওয়ালা ‘আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম আল-যাহাবী (রহ) বলেন :^৩

بسر بن سعيد العالم الرباني الحجاب الدعوة أحد التابعين.

“বুসর ইবন সাঈদ হলেন একজন তাবিঈ, আল্লাহ ওয়ালা আলিম
যাঁর দু‘আ কবুল হতো।”

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীছ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। ইবন সাঈদ লিখেছেন :

كان ثقة كثير الحديث.

“তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীসের ধারক-বাহক।”^৪

তিনি বহু সংখ্যক সাহাবী ও উঁচু স্তরের তাবিঈদের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। সাহাবীদের মধ্যে সাঈদ ইবন আবী ওয়াক্কাস, যাদদ ইবন ছাবিত, ‘আদুল্লাহ ইবন ‘উমার, ‘উছমান ইবন ‘আফ্ফান, আবু হুরাইরা, খালিদ ইবন ‘আদী আল জুহানী, আবু সাঈদ সাঈদ ইবন মালিক (রা), বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কয়েকজন তাবিঈ শিক্ষকের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

জুনাদা ইবন উমাইয়া, আল হারিছ ইবনু মুখাল্লাদ আয যারকী, হুসাইন ইবন ‘আবদির বহমান আল আশজাঈ, খাওয়াত ইবনু জুবায়র আল আনসারী, যাদদ ইবন খালিদ আল

১. তাহযীব আত্-তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৩৭

২. তাবিঈন, পৃ. ৫৯

৩. দুওয়ালুল ইসলাম, খ. ১, পৃ. ৫১

৪. আত্ তাবাকাত, খ. ৫, পৃ. ২০৮

জুহানী, 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস, 'আবদুল্লাহ ইবন আস সা'ইদী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আল আসওয়াদ আল খাওলানী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী রাফি, মা'মার ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ) ও আরো অনেকে।^৫

যে সকল মহান তাবি'ঈ বুসর (রহ)-এর নিকট থেকে হাদীছ মুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

বুকাইন ইবন 'আবদিল্লাহ আল আশাজ্জ, আল হারিছ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আবী যুবাব, যায়দ ইবন আসলাম, সালিম আবুন নাদর, আবদুর রহমান ইবন আমী 'আমর, 'উছমান ইবন 'আবদিল্লাহ ইবনু সবাকা, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আল হারিছ আত তামীমী, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ, ইয়া'কুব ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আল আশাজ্জ (রহ)।^৬

যুহদ ও তাকওয়া

তাঁর মহাত্ম্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের উজ্জ্বলতম দিক হলো যুহদ ও তাকওয়া তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আল্লাহ ভীতি। ইবন সা'দ বলেছেন :^৭

كان بسر من العباد المنقطعين و أهل الزهد في الدنيا.

“বুসর ছিলেন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন 'আবিদ এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষদের একজন।”

ইবনু 'ইমাদ আল হাম্বলী (রহ) লিখেছেন :^৮

بسر بن سعيد المدني الزاهد العابد المجاب الدعوة.

“বুসর ইবন সা'ঈদ হলেন, একজন মদীনার অধিবাসী দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ মানুষ, যাঁর দু'আ কবুল হতো।”

তিনি নিজেকে সব সময় লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে 'ইলমুর রিজাল (রচিত অভিধান) গ্রন্থসমূহে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একবার কোন এক প্রয়োজনে তিনি বসরায় যান এবং সম্পূর্ণ গোপনে কাজ শেষ করে মদীনায় ফেরার প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কবি আল ফারায়দাক। বসরার কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু ফেরার পথে যখন তাঁরা উটের পিঠে হাওদায় বসা ছিলেন তখন মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে যান। মানুষ তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কবি আল ফারায়দাক বলতেন : আমি

৫. তাহযীব আত-তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৩৭; তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ৪৪-৪৫

৬. প্রাগুক্ত

৭. আত তাবাকাত, খ. ৫, পৃ. ২০৮

৮. শাযারাত আয-যাহাব, খ. ১, পৃ. ১১৮

বুসর এর চাইতে ভালো সফরসঙ্গী আর দেখিনি। আর বুসরও ঠিক একই রকম কথা আল ফারায়দাক সম্পর্কে বলতেন।^৯

তাঁর যুগের ও পরবর্তীকালের বহু মনীষী তাঁর গুণ ও কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মাঈন তাঁকে ‘ছিকা’ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, বুসর ইবন সাঈদ আমার নিকট ‘আতা’ ইবন ইয়াসারের চাইতেই বেশি প্রিয়। একবার আবু হাতিমকে বুসর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : বুসর একজন তারিঙ্গ। তাঁর মত মানুষ সম্পর্কে (দোষ-ত্রুটি জানার জন্য) প্রশ্ন করা যায় না।^{১০} একবার খলীফা আল ওয়ালীদ ইবন আবদিল মালিক ‘উমার ইবন আবদিল আযিযকে (রহ) জিজ্ঞেস করলেন : মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষটি কে? তিনি বললেন : হাদরামীদের দাস বুসর। অতঃপর আল ওয়ালীদ বুসরকে দেওয়ার জন্য কিছু জিনিস পাঠান। কিন্তু বুসর তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেন।^{১১}

বুসর ইবন সাঈদের (রহ) দু’আ যে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সংগে সংগে কুবল করতেন, বহু মনীষীর মুখ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আল হাজ্জাজ ইবন সাফওয়ান ইবন আবী ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, এক ব্যক্তি খলীফা আল ওয়ালীদের নিকট বুসর-এর নামে মিথ্যা অভিযোগ করলো যে, তিনি মারওয়ান বংশের খলীফা ও আমীরদের সমালোচনা ও নিন্দামন্দ করেন। লোকটি খলীফার নিকট থাকা অবস্থায় বুসরকে হাজির করা হলো। খলীফা তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য কিনা তা জানতে চাইলেন। তিনি অস্বীকার করলেন। খলীফা তখন অভিযোগকারী লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে বুসর! এই ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বুসর লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন : এই ব্যক্তি? খলীফা বললেন, হ্যাঁ, বুসর মাথা নীচু করে মাটিতে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন। তারপর মাথা উঁচু করে বললেন :

اللهم قد شهد بما قد علمت أني لم أقله، فإن كنت صادقاً فأرني به آية.

“হে আল্লাহ! সে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে এমন একটি বিষয়ে যা তুমি জান যে, আমি তা বলিনি। আমি যদি সত্যবাদী হই তাহলে আমাকে একটি নির্দশন দেখাও।”

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর দু’আর সাথে সাথে লোকটি মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সে মারা যায়।^{১২}

৯. তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ৪৬

১০. প্রাগুক্ত

১১. তাহযীব আত-তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৩৭; তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ৪৬

১২. তাহযীব আল কামাল, খ. ৩, পৃ. ৪৬

মৃত্যু

আল ওয়াকিদী বলেন, হিজরী ১০০ সনে খলীফা ‘উমার ইবন ‘আবদিল আযীযের (রহ) খিলাফাতকালে তিনি মদীনায়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৭৮ বছর জীবন লাভ করেন।^{১৩} দুনিয়ার প্রতি তার উদাসীনতার মাত্রা এত তীব্র ছিল যে, মরণকালে কোন বিষয় সম্পত্তি তো দূরের কথা কাফনের কাপড়টুকু রেখে যাননি। ঠিক এই সময় খলীফা ‘আবদুল মালিকের এক ছেলে ‘আবদুল্লাহর মৃত্যু হয় এবং তিনি রেখে যান আশি (৮০) মুদ পরিমাণ স্বর্ণ। একথা ‘উমার ইবন ‘আবদিল আযীয (রহ) জানার পর মন্তব্য করেন :

و الله لئن كان مدخلهما واحدا، لأن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك أحب ألى.

“আল্লাহর কসম! দু’জনের প্রবেশস্থল যদি একই হতো তাহলে আমি দুনিয়াতে ‘আবদুল্লাহর মত আরাম আয়েশের জীবন বেশি পছন্দ করতাম।”

তাঁর এ মন্তব্য শুনে ‘আবদুল্লাহর ভাই মাসলামা বললেন : আমীরুল মু’মিনীন! আপনি আপনার খান্দানকে আঘাত করলেন। জবাবে ‘উমার (রহ) বললেন :

إنا والله لا ندع أن يذكر أهل الفضل بفضلهم.

“আল্লাহর কসম! আমরা গুণী ব্যক্তির গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ত্যাগ করতে পারিনা।”^{১৪}

‘আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ)

‘আবদুর রহমান স্পেনের আমীর ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ।’ পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ ‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ) খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সর্বপ্রথম তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান ইবন ‘আবদিল মালিকের কাফন-দাফনের কাজটি শেষ করেন। তারপর বিভিন্ন অঞ্চলের আমীরদের অপসারণ ও নিয়োগের দিকে দৃষ্টি দেন। আমীর হিসেবে সর্বপ্রথম যাকে নিয়োগ দেন তিনি হলেন সামহু ইবন মালিক আল-খাওলানী। স্পেন ও তার পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের বিজিত অঞ্চলসমূহ তাঁর অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। নতুন আমীর দায়িত্ব নিয়ে স্পেনে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি সং, নিষ্ঠাবান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে তিনি নিজের সহকর্মী ও পারিষদবর্গের নিকট জানতে চাইলেন : এদেশে তাবি'ঈদের কেউ কি এখনো বেঁচে আছেন?

তারা বললো : মহামান্য আমীর! হাঁ, বেঁচে আছেন। মহান তাবি'ঈ ‘আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) এখনো জীবিত আছেন।

তারপর লোকেরা তাঁর বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা আমীরকে অবহিত করলো। যেমন : কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহু রাসূলিল্লাহ বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে, জিহাদের ময়দানে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। আর তাঁর মধ্যে আছে শাহাদাত লাভের তীব্র বাসনা এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও বিভূ-বৈভবের প্রতি নিরাসক্তির মনোভাব।

তারা আরো বললো : তিনি মহান সাহাবী ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভের গৌরব অর্জন করেছেন এবং জ্ঞান ও কর্মে তাঁকেই অনুসরণ করে চলেছেন।

সামহু ইবন মালিক আল-খাওলানী সাক্ষাতের জন্য ‘আবদুর রহমান আল-গাফিকীকে (রহ) আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ‘আবদুর রহমান (রহ) সাক্ষাৎ করতে আসলেন। সামহু আল-খাওলানী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে মাজলিসে নিজের পাশেই তাঁকে বসালেন। তারপর দিনের একটি বড় অংশ পারস্পরিক মত বিনিময়, আলোচনা ও যুক্তি-পরামর্শে কাটিয়ে দিলেন। এই সাক্ষাতের মাধ্যমে আমীর সামহু আল খাওলানী (রহ) ‘আবদুর রহমানের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতার ধারণা লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ‘আবদুর রহমান সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছিলো, তিনি তার চেয়েও উপরে এবং বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকে স্পেনের সবচেয়ে বড় প্রদেশটির ‘আমিল তথা শাসক নিযুক্ত করবেন।

আমীর তাঁর সিদ্ধান্তের কথা 'আবদুর রহমানকে জানালেন। 'আবদুর রহমান বললেন : সম্মানীয় আমীর! আমি অন্যদের মত অতি সাধারণ একজন মানুষ। এদেশে আমার আসার উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম বাহিনীর সাথে সীমান্তের কোন সামরিক চৌকিতে অবস্থান করা এবং আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীনের সম্ভবতার জন্য জীবনটি দান করা। এই তরবারী আমি কাঁধে ঝুলিয়েছি এদেশে আল্লাহর কালিমা উর্ধ্ব ধরার জন্য। যতক্ষণ আপনি সত্যের উপরে থাকবেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করে চলবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে আপনার অনুগত হিসেবে দেখতে পাবেন। এর জন্য আমাকে কোন অঞ্চলের শাসক হিসেবে নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমীর সামহু ইবন মালিক আল-খাওলানী ফ্রান্স অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো, সমগ্র ফ্রান্সকে ইসলামী খিলাফাতের সাথে সংযুক্ত করা। অতপর তার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান উপ-দ্বীপের দেশসমূহ যেমন : তুর্কি, গ্রীক ইত্যাদি পদানত করা। অতপর কনস্টান্টিনোপল জয় করে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত করা।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমগণ মাদীনায় যখন মক্কার মুশরিকদের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হচ্ছেন তখন একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) তৎকালীন বিশ্বের মহাশক্তিধর রাষ্ট্র রোমান সাম্রাজ্যের পতন ও তার রাজধানী কনস্টান্টিনোপল মুসলিমদের অধিকারে আসার সুসংবাদ দান করেন। তিনি বলেন :^২

لَفَتَحَنَّا عَلَيْكُمْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَنَعَمَ الْجَيْشُ جَيْشَهَا، وَنَعَمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا.

“কনস্টান্টিনোপল তোমাদের জন্য অবশ্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সেই বাহিনী কত না ভালো বাহিনী এবং তার আমীর কত না ভালো আমীর হবে।”

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র মুখ থেকে এ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হওয়ার পর প্রত্যেকটি মুসলিম ইচ্ছা পোষণ করেছে, কনস্টান্টিনোপল অভিযানে বের হওয়া বাহিনীর সদস্য হওয়ার এবং প্রত্যেক খলীফা ও আমীরই চেয়েছেন তার হাতেই নগরীটির পতন হোক। এ কারণে প্রখ্যাত সাহাবী আবু আইউব আল-আনসারী (রা) ৯২ বছর বয়সে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে যাত্রাকারী একটি বাহিনীর সাথে মাদীনাতুল মুন্সলিম থেকে বের হন এবং পথিমধ্যে মারা যান। এই কনস্টান্টিনোপল তথা ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে তাঁকে দাফন করা হয়। অবশেষে খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকে তুর্কী সুলতান মুহাম্মাদ-এর সময়ে এ নগরী মুসলিম

২. আহমাদ, আল-মুনাদ, খ.৪, পৃ. ৩৩৫; আল হাকিম, আল-মুসতাদরাক, কিতাবুল ফিতান, খ.৪, পৃ.৪২২; লামহাত মিন তারিখ আল-হাদীছ, পৃ.১৭৯

অধিকারে আসে। এ কারণে তাঁর নামের শেষে “আল ফাতিহ” শব্দটি যোগ করে বলা হয় ‘মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ’ অর্থাৎ বিজয়ী মুহাম্মাদ।^৩

সামহ ইবন মালিক আল-খাওলানীরও স্বপ্ন ছিলো এই গৌরব অর্জনের। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দক্ষিণ ফ্রান্সের ‘নারবুনা’ (NARBONNE) শহরটির দখল নেওয়া। কারণ, এই শহরটি ছিলো স্পেন সীমান্ত সংলগ্ন ফ্রান্সের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। মুসলিমরা যখনই পিরেনীজ (PYRENEES) পর্বতমালা থেকে অবতরণ করেছে, তখনই তাদের সামনে এটিকে অজেয় বীরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সর্বোপরি এই শহরটি ছিলো ফ্রান্সের প্রবেশদ্বার।

সামহ ইবন মালিক আল-খাওলানী ‘নারবুনা’ (NARBONNE) শহরটি অবরোধ করেন এবং শহরবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিয়ইয়া প্রদানে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাদের জন্য বেশ কঠিন ছিলো। তাই তারা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। সামহ একের পর এক শহরটির উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ‘মানজিনীক’ তথা ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে শহরের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। অবশেষে চার সপ্তাহের যুদ্ধের পর দুর্গ সদৃশ শহরটি মুসলিম বাহিনীর অধিকারে আসে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তার কোন নজীর ইউরোপের ইতিহাসে নেই।

অতপর এই বিজয়ী সেনাপতি তাঁর বিশাল দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে ‘উকটানিয়া’ প্রদেশের রাজধানী ‘টুলুজ’-এর দিকে অগ্রসর হন এবং শহরটি অবরোধ করে চারপাশে ‘মানাজিনীক’ (ক্ষেপণাস্ত্র) বসিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর নিকট এটি ছিলো সম্পূর্ণ নতুন সমরাস্ত্র। যাইহোক দুর্গ সদৃশ শহরটি পতন ঘটতে চলছিলো, ঠিক তখন এমন ঘটনা ঘটলো যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ফরাসী প্রাচ্যবিদ ‘রীনো’ সেই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় যখন অভ্যাসন, তখন ‘উকটানিয়া’-এর ডিউক ফ্রান্সের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাজা-বাদশা এবং তথাকার অধিবাসীদের প্রতি এ যুদ্ধে তাঁকে সাহায্যের জন্য জোরালো আবেদন জানানো। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে প্রত্যেকটি দেশের শাসক ও নাগরিকগণকে এই বলে সতর্ক করেন যে, খুব শীঘ্র তাদের দেশ বিদেশীদের দখলে চলে যাচ্ছে এবং তাদের নারী ও শিশুরা বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হচ্ছে। তাঁর এ সতর্ক বাণীতে দ্রুত কাজ হয়। গোটা ইউরোপে সাড়া পড়ে যায় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ‘রোন’ (RHONE) নদের তীরবর্তী অঞ্চলে এমন এক বিশাল বাহিনী গড়ে ওঠে যার কোন নজীর ইউরোপের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বিশাল দুই বাহিনী মুখোমুখী হলো। উভয় পক্ষের তীর বর্শা বৃষ্টির মত বর্ষিত হতে শুরু করলো। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সামহ্ অত্যন্ত ব্যস্ত। একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুটাছুটি করে নিজের বাহিনীর কর্মতৎপরতা তত্ত্বাবধান করছেন। হঠাৎ শত্রু বাহিনীর নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর বুকে এসে বেঁধে। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মৃতুবরণ করেন। সেনাপতির এমন করুণ পরিণতি দেখে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এ সময় আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীনের একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) শত্রু হাতে বাহিনীর কমান্ডিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর প্রধান কাজ ছিলো বাহিনীকে বিপর্যস্ত ও ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করে পিছু হঠে আসা। তিনি তাই করলেন এবং একটু সময় নিয়ে বাহিনীর মনোবল আবার চাঙ্গা করে তুললেন।

ফ্রান্সে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়, পিছু হটে আসা এবং সেনাপতি সামহ্ ইবন মালিক আল-খাওলানীর শাহাদাত বরণের খবর ইসলামী খিলাফাতের রাজধানী দিমাশ্কে পৌঁছালে উঁচু পর্যায় থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তবে অল্প দিনের মধ্যে এই শোককে তারা প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে রূপান্তরিত করেন। খুব দ্রুত খিলাফতের সদর দফতর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে থাকবে 'আবদুর রহমান আল-গাফিকীর হাতে। সেই সাথে তিনি সমগ্র স্পেনের ইমারাতের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফ্রান্সের বিজিত অঞ্চলও তাঁরই অধীনে থাকবে। সেখানে তাঁকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হলো। তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করবেন।

'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) ছিলেন একজন দৃঢ় সংকল্প, স্থির চিন্তা, আত্মপ্রত্যয়ী, বিচক্ষণ, আল্লাহভীরু, পরিচ্ছন্ন, জ্ঞানী ও সাহসী মানুষ। তিনি স্পেনের ইমারাতের দায়িত্ব লাভের পরই সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেন। সৈনিকদের মন থেকে সব ধরনের ভীতি ও হতাশা দূর করে আশাবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি তাদের আবার সম্মান, শক্তি ও বিজয়ের স্বপ্ন দেখান। তিনি তাদেরকে মাগরিব আল-আকসা' (মরক্কো) ও স্পেন বিজয়ী মূসা ইবন নুসাইর, তারিক ইবন যিয়াদ থেকে নিয়ে সর্বশেষ সামহ্ ইবন মালিক আল-খাওলানী (রহ) পর্যন্ত সকল মুসলিম বীরদের স্বপ্ন ও বীরত্বের কথা শোনালেন। তিনি বললেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিলো, ফ্রান্সকে মুসলিম শাসনের অধীনে আনা। তারপর সেখান থেকে ইতালী, জার্মানীর মধ্য দিয়ে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছা। আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে ভূমধ্য সাগর ইসলামী সাগরে পরিণত হবে এবং 'বাহরুর রুম' তথা রোম সাগর-এর নাম হবে 'বাহরু আশ-শাম' বা শাম সাগর।

তবে 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) বিশ্বাস করতেন, একটি বাহিনী তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করবে নিজেদের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, কোন জাতি বা সম্প্রদায় তাদের অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না, যদি অভ্যন্তরীণ শত্রু ভিতর

থেকে ষড়যন্ত্র করে। এ কারণে তিনি সমগ্র স্পেন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এক শহর থেকে অন্য শহরে উপস্থিত হয়ে জনগণের সামনে বক্তৃতা-ভাষণ দিতে থাকেন, সরকারী কর্মকর্তাদের দিক-নির্দেশনা দান করতে থাকেন এবং ঘোষকদের একথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন যে—

১. কোন সরকারী কর্মকর্তা, কাজী অথবা কোন ব্যক্তি কোন রকম যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার করলে তা যেন আমীরকে অবহিত করা হয়।

২. এ ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না।

অতপর তাঁর নিকট যে সকল অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হতো তিনি একটি একটি করে খতিয়ে দেখতেন এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে তিনি শক্তিমানের নিকট থেকে দুর্বলের অধিকার এবং যালিমের নিকট থেকে মাযলুমের প্রাপ্য আদায় করে দেন। তারপর তিনি মুসলিমদের দ্বারা জোর-জবরদস্তি দখলকৃত পুরাতন গীর্জাসমূহ এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত গীর্জাসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন। যেসব গীর্জা অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে গীর্জার ভূমিতে কোন কিছু তৈরি করা হয়েছে তা সবই প্রকৃত মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তারপর দৃষ্টি দেন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি। তাদের কারো বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিকৃতি ও আত্মহীনতার অভিযোগ পেলে তার প্রতিকার করেন, তাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি কোন শহরে গেলে জনসাধারণকে শহরটির জামি' মাসজিদে জুমু'আর জামা'আতে সালাত আদায়ের আহ্বান জানানো হতো। তিনি খতীব হিসেবে দাঁড়াতে। ভাষণে তিনি মানুষকে ভালো হওয়ার উপদেশ দানের পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে গমন, যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে কামিয়াবী অর্জনের জন্য উৎসাহিত করতেন।

'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) শুধু কথা বলা ও স্বপ্ন দেখার মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। যা বলতেন তা কাজে পরিণত করতেন। যা স্বপ্ন দেখাতেন তা বাস্তবে রূপ দিতেন। স্পেনের আমীর হিসেবে নিয়োগ লাভের পরই তিনি প্রস্তুতি শুরু করে দেন। অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলা, পাহাড়ের উপরে সৈন্য ছাওনী তৈরি করা, দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা, ব্রীজ-কালভার্ট তৈরি করা ইত্যাদি কাজ তিনি ব্যাপকভাবে আরম্ভ করেন। স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার দীর্ঘ ও বড় ব্রীজটি তিনিই তৈরি করেন। এটি নির্মাণ করা হয় বিশাল কর্ডোভা নদীর ওপরে। এটি তৎকালীন বিশ্বে অন্যতম আশ্চর্য কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর দৈর্ঘ্য ছিলো ৮০০ বা', প্রস্থ ছিলো ২৩ বা' এবং উচ্চতা ছিলো ৬০ বা'। উল্লেখ্য ৬৬ (বা') হলো এক বাহু পরিমাণ।

এই ব্রীজের নির্মাণ শৈলীতে ধনুকের মত বাঁকা সামগ্রীর সংখ্যা ছিলো ১৮টি এবং পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিলো ১৯টি। এটি নির্মাণের ফলে জনসাধারণ ও সৈনিকদের এই নদী পারাপার খুবই সহজতর হয়। এই ব্রীজের সুবিধা আজো স্পেনবাসী ভোগ করছে।

আমীর 'আবদুর রহমান আল-গাফিকীর (রহ) অভ্যাস ছিলো, যখনই তিনি কোন শহর বা

জনপথে যেতেন, তথাকার সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করতেন। তাঁরা যে সকল কথা বলতো বা পরামর্শ দিত, সবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন, তাঁদের সকল প্রস্তাব লিখে নিতেন এবং তাঁদের উপদেশ থেকে উপকৃত হতেন। এ সকল বৈঠকে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি এই নীতি অবলম্বন করেন যে, বেশি শুনবেন, কম বলবেন। তিনি যেমন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হতেন, তেমনি চুক্তিবদ্ধ যিম্মী নেতৃবৃন্দের সাথেও মিলিত হতেন এবং তাদের দেশ ও তাদের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করতেন।

একবার মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ যিম্মীদের ফরাসী বংশোদ্ভূত একজন বড় নেতার সাথে তিনি বৈঠকে বসলেন। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। এক পর্যায়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা বলুন তো আপনাদের সম্রাট ‘শার্ল’ আমাদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন না কেন এবং তার অধীনস্থ সামন্তবাদী রাজাদেরকেও বা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন না? তিনি বললেন : সম্মানীয় আমীর! আমাদের সাথে আপনারা যেসব অঙ্গীকার করেছেন তা সবই পূরণ করেছেন। সুতরাং আপনারা আমাদের নিকট যা কিছু জানতে চান সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য দান করা আমাদের দায়িত্ব। আপনার মহান নেতা মুসা ইবন নুসাইর সমগ্র স্পেনের উপর আধিপত্য লাভ করেন। তারপর আমাদের এই সুন্দর দেশ ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যে পিরেনিজ পর্বতমালা পার্থক্যকারী প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তিনি তা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা চালান। তখন ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ ও পাদ্রী-পুরোহিতরা সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, মহামান্য সম্রাট! এ কেমন অপমান ও গ্লানি আমাদের ও আমাদের পরবর্তী বংশধরদের কর্তে চিরকালের জন্য বুলে গেল? আমরা মুসলিমদের সম্পর্কে শুনতাম, পূর্বদিক থেকে তাদের আক্রমণের কথা ভেবে ভীত-শংকিত হতাম। এখন তো তারা আমাদের দ্বারপ্রান্তে। তারা সমগ্র স্পেন দখল করে সেখানকার সকল শক্তি ও সম্পদ করায়ত্ত করেছে। তারপর তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য প্রাচীর সুউচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গও দখল করেছে অথচ তাদের সংখ্যা খুব অল্প, অস্ত্র-শস্ত্রও খুব নিম্নমানের। তাদের অধিকাংশের একটি ঢালও নেই যা দ্বারা তরবারির আঘাত ঠেকাতে পারে এবং ঘোড়াও নেই যার পিঠে চড়ে রণাঙ্গনে যেতে পারে।

তাদের কথা ধীরস্থির ও মনোযোগ সহকারে শোনার পর সম্রাট বললেন: তোমরা যা কিছু বললে, সে সম্পর্কে আমি দীর্ঘদিন যাবত ভেবেছি। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের এই আক্রমণের মুখে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবো না। কারণ এখন তারা প্রবল প্লাবনের মতো, গতিপথে যা কিছু পড়বে সবই উপড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে ফেলবে। তাছাড়া আমি দেখেছি, তাদের একটি বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে, যা তাদের সংখ্যাধিক্যের কাজ করে। তাদের আছে ঈমান ও সততা যা ঢাল, বর্ম ও অস্ত্রের কাজ করে। তোমরা তাদেরকে একটু টিল দাও, গনীমতের সম্পদে তাদের হাত পূর্ণ হয়ে যাক, সুরম্য

অটালিকা ও প্রাসাদের মালিক হোক, অসংখ্য দাস-দাসী, সেবক-সেবিকা তাদের সেবায় নিয়োজিত হোক এবং তারা নিজেরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ুক। তখন তোমরা অল্প চেষ্টায়, খুব সহজে তাদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) বিষাদ ভরাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় মাথা নিচু করে তার কথা শুনছিলেন। একসময় মাজলিস ভেঙ্গে দিলেন একথা বলে : 'সালাতের সময় হয়েছে। সবাই সালাতের জন্য চলো।'

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার জন্য 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) দু'বছর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। সেইভাবে সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত ও প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। উপদেশ ও বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে তাদের মনোবল চাঙ্গা ও শাহাদাতের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন। আফ্রিকার আমীরের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান এবং তিনি কিছু সুদক্ষ সৈনিকও পাঠান। এভাবে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলার পর তিনি ফ্রান্স সীমান্তে পার্বত্য সেনা চৌকিতে অবস্থানরত 'উছমান ইবন আবী নুস'আকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর বিপরীতে অবস্থানরত শত্রু বাহিনীকে উত্তেজিত করে তোলেন, যাতে তারা মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'উছমান ছিলো একজন ভিন্ন ধরনের সৈনিক। সে এমন সব আমীরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতো যাদের ছিলো মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সুউচ্চ আকাংখা। যারা বড় কিছু করার চিন্তা করতো সে তাদেরকে মোটেই সহ্য করতে পারতো না।

এমন চরিত্রের লোকের জীবনের সাথে আরেকটি উপসর্গ যুক্ত হয়। সেটি হলো, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে উকটানিয়ার ডিউকের সুন্দরী কন্যা 'মীনী' তার হস্তগত হয়। রূপ-যৌবনের অধিকারিনী এই নারী জ্ঞান ও বুদ্ধিতেও ছিলো অতুলনীয়। অতি শিঘ্র সে 'উছমানকে মুগ্ধ করে ফেলে। 'উছমান তাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে। সে তার ছলা-কলার মাধ্যমে তার পিতার সাথে এই চুক্তি করিয়ে নেয় যে, ফ্রান্স সীমান্তে মুসলিম বাহিনী আর কোন অভিযান চালাবে না। স্পেন সীমান্তে ফরাসীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। প্রিয়তমা স্ত্রীর পিতার শাসিত রাজ্য উকটানায় অভিযান পরিচালনার নির্দেশ সম্বলিত আমীর 'আবদুর রহমানের পত্রটি 'উছমানের হাতে পৌঁছালে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। তবে দু'এক দিনের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আমীর 'আবদুর রহমান আল-গাফিকীকে লিখলো : উকটানিয়ার ডিউকের সাথে আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। সে চুক্তির মেয়াদ থাকা অবস্থায় আক্রমণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

'উছমানের পত্রটি 'আবদুর রহমানের হাতে পৌঁছলে তিনি রাগে-উত্তেজনাতে ফেটে পড়েন। তিনি 'উছমানকে লিখলেন : আমীরকে না জানিয়ে ফরাসীদের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছে তা মানতে আমীর বাধ্য নয় এবং মুসলিম বাহিনীরও সে ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। সুতরাং

এখন তোমার দায়িত্ব হলো, কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ না করে যত দ্রুত সম্ভব আমার নির্দেশ পালন করা।

‘উছমান এর পরেও চেষ্টা করে আমীরকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য। যখন তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো, সে তার স্বস্তরের নিকট দূত পাঠিয়ে মুসলিমদের সকল গোপন তথ্য জানিয়ে দিলো এবং তাকে তার মত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিল।

আমীর ‘আবদুর রহমান আল-গাফিকীর (রহ) গুপ্তচরেরা ‘উছমানের অবস্থান ও তার কর্ম-তৎপরতার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো। শত্রুর সংগে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগের সকল তথ্য তারা আমীরকে জানিয়ে দিলো। ‘আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) খুব দ্রুত অত্যন্ত কঠোর ও শক্ত মনের অধিকারী কিছু সৈনিকদের নিয়ে একটি চৌকস বাহিনী গঠন করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, ‘উছমানকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনার জন্য।

‘উছমান বাহিনীর হাত থেকে কোন রকম বেঁচে যায় এবং তার একান্ত বিশ্বাসভাজন কিছু লোকজন নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। সংগে তার সুন্দরী স্ত্রী মীনীনও ছিলো। আমীরের বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং সকলকে ঘিরে ফেলে। সে নিজেকে ও স্ত্রীকে বাঁচানো জন্য অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে নিহত হয়। তরবারি ও তীর বর্ষার অসংখ্য আঘাতে তার দেহ জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলো। সৈন্যরা তার বিচ্ছিন্ন মাথাটি এবং সেই সাথে তার সুন্দরী স্ত্রীকে আমীর ‘আবদুর রহমানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ‘আবদুর রহমান তার স্ত্রীকে ‘দারুল খিলাফা’ দিমাশ্কে পাঠিয়ে দেন। এভাবে একজন ফরাসী রাজকন্যা দিমাশ্কের উমইয়্যা খলীফাদের অন্দর মহলে পৌঁছেন এবং সেখানে সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করেন।

এদিকে উকটানিয়ার ডিউকের নিকট তার মেয়ের স্বামী ‘উছমানের করুণ পরিণতির সংবাদ পৌঁছলো। সেই সাথে এ কথাও জানলো যে, তার সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে মুসলিমদের হাতে বন্দী। সে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বন্ধ পরিকর হলো। সিদ্ধান্ত নিল, তাদের ভূমি থেকে মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করবে। কিন্তু মনে মনে এ আশংকাও করলো যে, তার মেয়েকে যেভাবে বন্দী করে শামের দারুল খিলাফা-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারও পরিণতি তেমন না হয়। অথবা অতীতে স্পেনের রাজা রডারিক-এর মাথা কেটে যেভাবে থালায় রেখে ঘোরানো হয়েছিলো সেভাবে তারও মাথা দিমাশ্কের বাজার ও রাস্তায় ঘোরানো না হয়।

‘আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) ডিউকের আশংকা একেবারে মিথ্যা হতে দেননি। তিনি স্পেনের উত্তর দিক থেকে দুঃসাহসী একটি বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হলেন এবং পিরেনীজের চূড়া থেকে প্লাবনের মত দক্ষিণ ফ্রান্সের উপর গিয়ে পতিত হলেন। তাঁর এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো এক লক্ষ এবং যাদের প্রত্যেকেই ছিলো সিংহের মত সাহসী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। এ বাহিনী ‘রুন’ নদের তীরে অবস্থিত ‘আর্লস’ (ARLES) শহরের দিকে অগ্রসর হলো। কারণ, তাদের সাথে একটি কঠিন হিসাব-নিকাশের ব্যাপার

ছিলো। আর তা হলো, এই শহরের অধিবাসীরা জিযিয়া দেওয়ার শর্তে মুসলিমদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলো। কিন্তু 'তুলুয'-এর (Toulouse)-এর যুদ্ধে সামহ ইবন মালিক আল-খাওলানী (রহ) শহীদ হলে এবং মুসলিমদের বিপর্যয় ঘটলে 'আর্লস' (ARLES)-এর অধিবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ এবং জিযিয়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) শহরটির কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলেন উকটানিয়ার ডিউক খাওডা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য অপেক্ষা করছে। দু'বাহিনী মুখোমুখি হলো এবং ভয়াবহ যুদ্ধ বেঁধে গেল।

'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে যে দলটি পাঠালেন, শত্রুরা জীবনকে যে পরিমাণ ভালোবাসে তাঁরা তার চেয়ে বেশি মৃত্যুকে ভালোবাসে। শত্রু বাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরলো এবং তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। বিজয়ী বেশে মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের নির্মূল করলো। তবে শহরের ডিউক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। সে মুসলিম বাহিনীর সাথে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। সে জানতো 'আর্লস' (ARLES)-এর যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধ, শেষ যুদ্ধ নয়।

'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) তাঁর দুঃসাহসী বাহিনী নিয়ে 'গারুন' (GARONNE) নদী পার হলেন এবং ডানে-বাঁয়ে বিভিন্ন শহর ও জনপদ পদানত করে উকটানিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। উকটানিয়ার ডিউক এই বিশাল বাহিনীর গতিকে রুখে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। দু'বাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ডিউকের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের অনেকে নিহত, অনেকে বন্দী এবং অনেকে পালিয়ে যায়। অতপর মুসলিম বাহিনী বোরডেক্স (BORDEAUX) শহরের দিকে ধাবিত হয়। এটি ছিলো উকটানিয়া অঞ্চলের রাজধানী ও তৎকালীন ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। এখানেও দু'বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। অবশেষে মুসলিম বাহিনীর হাতে শহরটির পতন ঘটে। এ যুদ্ধে শহরটির শাসক নিহত হয়। বোরডেক্স নগরীর পতনের পর একের পর এক লিওন (LYON), বেসানকোন (BESANCON) ও সেন্স (SENS) নগরীও মুসলিম বাহিনীর অধিকারে আসে। সেন্স শহরটির অবস্থান ছিলো প্যারিস থেকে মাত্র একশো মাইল দূরে।

'আবদুর রহমান আল-গাফিকীর (রহ) অভিযানে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে ফ্রান্সের অর্ধেক মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারা তাদের সামনে এক মহাবিপর্ষয় দেখতে পেল। তখন চারদিক থেকে এ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য আহ্বান ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। যাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করা হলো। ইউরোপবাসী আহ্বানকারীদের আহ্বানে সাড়া দিল। তারা 'শার্ল মার্টিলে'র পতাকাতলে সমবেত হলো। তারা গাছ, পাথর, অস্ত্র যে যা পেল তাই নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

এদিকে মুসলিম বাহিনী তখন 'টুরস' (Tours) শহরে ঢুকে পড়েছে। এটি ছিলো ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। ঘনবসতি, দৃষ্টিনন্দন আবাস এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এখানে ছিলো সমগ্র ইউরোপের সেরা গীর্জাগুলির একটি। গীর্জাটি ছিলো অতি জাঁকজমকপূর্ণ ও বিশাল আকারের। এখানে রক্ষিত ছিলো অতীতের অনেক মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন। মুসলিম বাহিনী শহরটি অবরোধ করলো। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হলো। অবশেষে শার্ল মার্টিল-এর চোখের সামনে শহরটির পতন ঘটলো।

হিজরী ১০৪ সনের শা'বান মাসের শেষের দিকে 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে 'পোয়েটিয়ারস' (POITIERS) শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। শহরের দ্বার প্রান্তে শার্ল মার্টিলের পরিচালনায় বিশাল ইউরোপীয় বাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলো। এখানে যে ভয়াবহ যুদ্ধটি হয় তা ছিলো মানব ইতিহাসের একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'বালাত আশ-শুহাদা' (بلاط الشهداء) শহীদদের প্রাসাদের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুসলিম বাহিনী এ সময় ফরাসীদের সাথে ধারাবাহিকভাবে বিজয় লাভ করে চলছিলো। আকাশ থেকে মুসল ধারার বৃষ্টির মত অচেনা গণীমাতের সম্পদও তাদের হাতে আসছিলো। এতে সৈনিকদের পিঠের বোঝা ভারী হয়ে গিয়েছিলো এবং আকাশে মেঘ জমে যেভাবে পরিচ্ছন্ন আকাশকে অন্ধকার করে দেয়, তেমনি এ সম্পদ মুসলিম সৈনিকদের পরিচ্ছন্ন হাতকে অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। বাহিনীর সদস্যদের এমন অবস্থা দেখে 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) ভীত-শংকিত হয়ে পড়েন। সৈনিকদের নিকট বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সম্পদ থাকবে, আর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে- 'আবদুর রহমান কোন ভাবেই নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করছিলেন না। কারণ, সংঘর্ষের সময় তার একটি চোখ থাকবে সামনের দিক থেকে আগত শত্রুর দিকে, আর অন্য চোখটি থাকবে তার মূল্যবান সম্পদের দিকে। একবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এসব সম্পদ ছুড়ে ফেলার জন্য সৈনিকদের নির্দেশ দিবেন; কিন্তু ভেবে দেখলেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সহজ হবে না। বরং হীতে বিপরীত হবে। এত মূল্যবান সম্পদ তারা ত্যাগ করতে রাজি হবে না। অবশেষে তিনি যুদ্ধ শুরু পূর্বে সেনা শিবিরের পিছন দিকে একটি তাবুতে সকল সম্পদ জমা করার নির্দেশ দিলেন।

বিশাল দুই বাহিনী মুখোমুখী অবস্থানে কয়েকদিন কাটলো। এ সময় তারা একে অপরের অবস্থান ও গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। দুটি পর্বতমালা যেমন নীরবে একটির বিপরীতে আরেকটি দাঁড়িয়ে থাকে, দু'বাহিনীর অবস্থানও তেমন ছিলো। প্রত্যেকটি বাহিনী তার বিরুদ্ধ বাহিনীর শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে ভীত-শংকিত ছিলো। উভয়ে আক্রমণের পূর্বে হাজার বার ভেবে নিচ্ছিল।

এ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) তাঁর বাহিনীর সদস্যদের আবেগ-উদ্দীপনা ও সাহস কোন্ স্তরে আছে তা বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের শক্তি-সাহসের উপর নির্ভর করে বিজয়ের আশা নিয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। 'আবদুর

রহমান আল-গাফিকী (রহ) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের মত শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালেন। প্রতিপক্ষ ফরাসী বাহিনী পাহাড়ের মত অটল ভঙ্গিতে সে আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল। কোন ফলাফল ছাড়াই যুদ্ধের প্রথম দিন অতিবাহিত হলো। রাতে রণক্ষেত্র ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেলো। দ্বিতীয় দিন মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ফরাসী বাহিনীর উপর হামলা করলো। কিন্তু তার ফলাফলও শূন্য হলো। টনটনে উদ্বেজনা ও শংকার ভিতর দিয়ে সাতটি দিন অতিবাহিত হলো। অষ্টম দিন মুসলিম বাহিনী একযোগে হামলা চালালো এবং প্রতিপক্ষের সারিতে বড় রকমের একটা ফাটল ধরাতে সক্ষম হলো। এই ফাটলের ভিতর দিয়ে তাঁরা বিজয়ের আলো দেখতে পেল। যেমন রাতের আঁধারের ভিতর দিয়ে প্রভাতের আলো দেখা যায়। ঠিক এ সময় ফরাসী বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দল মুসলিম বাহিনীর গনিমতের সম্পদ যে শিবিরে রক্ষিত ছিলো সেখানে আক্রমণ চালালো। অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা যখন দেখলো, তাঁদের জমাকৃত গনিমত প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাচ্ছে, তখন তাঁদের অনেকে তা রক্ষার জন্য পিছনে সরে গেলো। এতে তাঁদের সারিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলো এবং তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতি ভিন্ন দিকে মোড় নিল। মহান সেনাপতি ‘আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) তাঁর সাদা-কালো রঙের ঘোড়ার পিঠে চড়ে একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার উপরে, একবার নিচে নেমে আশ্রয় চেষ্টা চালাতে লাগলেন তাঁর বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার, তাঁদের মনোবল চাঙ্গা করার; কিন্তু সফল হওয়ার আগেই শত্রু বাহিনীর নিক্ষেপ্ত একটি তীর এসে তাঁর বুকে বেঁধে এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়েন। এভাবে তিনি রণক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম বাহিনীতে ভীতি ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে শত্রু বাহিনীর সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের আক্রমণ তীব্রতর হয়। এভাবে সেদিন অতিবাহিত হয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসে।

সকাল হলো, শার্ল মার্টিল দেখলেন- মুসলিম বাহিনী ‘পোয়েটারস (Poitiers)-এর অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে পিছন দিকে সরে গেছে। কিন্তু তারা মুসলিম বাহিনীর পিছু ধাওয়া করতে সাহসী হলো না। তারা সাহস করে পিছু ধাওয়া করে করে আক্রমণ করলে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হতো। পিছু ধাওয়া না করার কারণ এই ছিলো যে, তারা ধারণা করেছিলো, মুসলিম বাহিনীর এই গুটিয়ে নেয়া হয়তো কোন যুদ্ধ কৌশল। সুতরাং যতটুকু বিজয় অর্জিত হয়েছে তা ধরে রেখে সেখানে অবস্থান করাকে তারা প্রাধান্য দিল।

ইসলামের ইতিহাসে ‘বালাত আশ-শুহাদা’- শহীদদের প্রাঙ্গন-এর দিনটি ছিলো অত্যন্ত গুরুতর। এ দিনে মুসলিমদের একটি মহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁরা তাঁদের একজন বীর সিপাহসালারকে হারায়। এ দিনে উহুদ যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি মুসলিমদের অন্তরে ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং সেখান থেকে আজো রক্ত ঝরে। প্রতিটি মুসলিম জনপদ, গ্রাম, শহর এমনকি প্রতিটি বাড়ি ব্যাথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এ পরাজয়ে কেবল মুসলিমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং সমগ্র ইউরোপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের জয় হলে ফ্রান্স মধ্যযুগের অন্ধকারে পতিত হতো না। ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলা স্পেনের মুসলিমদের সাথে মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ করতে পারতো না। এ পরাজয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার গতি আটশ' বছর পিছিয়ে পড়ে। এ সব কথা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেছেন।^৪

আমরা সূচনাতে উল্লেখ করেছি যে, 'আবদুর রহমান আল-গাফিকী (রহ) প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন। যেমন তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের সূত্রে নিম্নের হাদীছটি বর্ণনা করেছেন:^৫

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنت الخمر على عشرة وجوه، لعنت الخمر بعينها، وشاربها وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها واخمولة إليه وأكل ثمنها.

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দশভাবে মদকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে : অভিশাপ দেওয়া হয়েছে স্বয়ং মদকে পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, যে রস বের করে, যে রস বের করায়, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেওয়া হয় এবং তার মূল্য- সকলকে।”

'আবদুর রহমান আল-গাফিকীর (রহ) মৃত্যু সন নিয়ে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। একটি মতে হিজরী ১০৪ সন যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আয্যাদ হিজরী ১১৫ সনের কথা বলেছেন। ইবন খাল্লিফুন বলেন :

كان رجلا صالحا جميل السيرة استشهد في قتال الأفرنج في شهر رمضان.

“তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, সুন্দর চরিত্রের মানুষ। ইউরোপীয়দের সাথে যুদ্ধে রামাদান মাসে তাঁকে শহীদ করা হয়।”^৬

৪. ড. রা'ফাত আল-বাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াত আভ-তারিখীন, পৃ.৩৮৯-৪২০

৫. আবু দাউদ, কিতাবুল আশরিবা, হাদীছ নং ৩৬৭৪; ইবন মাজাহ, কিতাবুল আশরিবা, হাদীছ নং ৩৩৮০; মুসনাদু আহমাদ, হাদীছ নং ৪৮৮৭; তাহযীব আল কামাল, খ.১১, পৃ.২৭৩

৬. তাহযীব আত তাহযীব, খ.৬, পৃ.১৯৭; তাহযীব আল কামাল, খ.১১, পৃ.২৭২

আন-নাজাশী (রহ)

প্রত্যেক মুসলিমের নিকট “নাজাশী” নামটি খুবই পরিচিত। সেই সাথে একটি দেশের নামও। সেই দেশটি হলো, হাবশা বা আবিসিনিয়া এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া। মুসলিমদের অন্তরে রয়েছে এই দেশটির প্রতি গভীর মমতা ও ভালোবাসা। এ ভালোবাসা হলো ঈমানী ভালোবাসা। মক্কায় ইসলামের সূচনা পর্বে সেখানকার নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমদেরকে এই হাবশার রাজা ও জনগণ আশ্রয় দেন এবং তাদের প্রতি সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। মূলত: সেখান থেকেই মুসলিমরা তাদের অন্তরে তাদেরকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই হাবশার রাজা ছিলেন ‘আসহামা ইবন আল-আবজার’ এবং ‘আন-নাজাশী’ ছিল রাজ বংশের উপাধি। যেমন, পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল ‘কিসরা’ এবং রোমান সম্রাটদের ছিল ‘কায়সার’। আমরা এখানে হাবশার যে ‘নাজাশী’র জীবন আলোচনা করবো তিনি হলেন: আসহামা ইবন আল-আবজার। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সমকালীন। কাজ ও আচরণে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) এক নজর দেখার এবং সামনাসামনি অবস্থায় মুহর্তের জন্য তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। একারণে তিনি সাহাবী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যান এবং তাবিঈদের মধ্যে পরিগণিত হন। অবশ্য অনেকে তাকে সাহাবী বলে গণ্য করেন।^১

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবা ও তাবিঈন কিরামের (রা) জীবনকথা আলোচনা করতে গিয়ে বার বার আমার মনে উদয় হয়েছে হাবশার এই মহামান্য রাজা ‘নাজাশী’র কথা। ‘নাজাশী’র কথা মনে পড়লে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মক্কার দুর্বল মুসলিমদের চরম দুর্দশার চিত্রটি। জুলুম-অত্যাচার সইতে সইতে যখন তাদের পিঠ একেবারে দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহর (সা) উপর মক্কার পাষন্দের নির্মম অত্যাচারের করুণ চিত্রটি ফুটেছে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ছোট্ট এই মন্তব্যটিতে:

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟

“আল্লাহ আমার রব বা পালনকর্তা- একথা বলার কারণে তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করবে?”

মক্কার সম্রাসীদের হাত থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) বাঁচাতে গিয়ে তিনি একথাটি উচ্চারণ করেন। মক্কার সেই তৈরি পরিবেশের অবস্থার বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত কথাটির মধ্যে পাওয়া যায়।

আসহামা এর পিতা আবজার ছিলেন হাবশার রাজা। আসহামা পিতার একমাত্র সন্তান। এ কারণে পিতার মৃত্যুর পর তিনিই হবেন হাবশার রাজা। কিন্তু রাজার বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পরিষদবর্গ হাবশার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, রাজার দ্বিতীয় আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। একমাত্র সন্তান আসহামা পিতার মৃত্যুর পর রাজা হলে তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তিনি বিয়ে করলে বংশগত কারণে বেশি সন্তানের জনক হওয়ার সম্ভাবনাও কম। ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়বে বলে তারা আশংকা করেন। পক্ষান্তরে রাজা 'আবজার' এর ভাই এর ছিল তাগড়া জোয়ান বারো ছেলে। শয়তান এই বুদ্ধিমান পরিষদবর্গের মাথায় ভর করেছিল। তারা ভাবলো, যদি বর্তমান রাজা আবজারকে হত্যা করে তার ভাইকে রাজা বানানো যায় তাহলে হাবশার ভবিষ্যৎ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। কারণ, তখন সেই রাজার ছেলেরা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তাদের সম্মিলিত বাহুবলে হাবশার সাম্রাজ্য শক্তিশালী হবে।

বিজ্ঞ-বিচক্ষণ পরিষদদের মধ্যে যখন এরকম একটা চিন্তা কাজ করছে, তখন একদিন তাদের নেতা একটি গোপন স্থানে বৈঠক আহ্বান করে। সেখানে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনেকে এমন ভয় ও শংকার কথা প্রকাশ করে যে, ব্যাপারটি জানাজানি হলে তাদের জীবন চলে যেতে পারে। কেউ কেউ বলে যে, এ চিন্তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। যাই হোক, দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাজা আবজারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে অধিক সন্তানের জনক তার ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে রাজার ছোট ভাইয়ের সাথে মিলিত হলো। কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। অবশেষে পরিষদের নেতা নীরবতা ভঙ্গ করে তার বড় ভাই রাজা আবজারকে হত্যা করে তাকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনার কথা জানালো। রাজা হওয়ার জন্য, ক্ষমতার জন্য ভাইকে হত্যা করার কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং ক্ষোভে-উত্তেজনা বসা থেকে উঠে দাড়িয়ে গেলেন। পরিষদবর্গ তার উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলো। তারা একথাও বললো যে, তাদের প্রস্তাবে সাড়া না দিলে গোটা রাজপরিবারকেই নির্মূল করে ফেলা হবে। কেউ কেউ তাকে দেশের স্বার্থ বিবেচনার কথা বললো, আবার কেউ কেউ ক্ষমতার ও রাজা হওয়ার লোভ দেখালো, দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর একান্ত বাধ্য হয়েই এমন অন্যায় ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের সম্মতি দিলেন। এভাবে হাবশাবাসীর অতি প্রিয় রাজা নাজাশীকে হত্যার সম্মতি নিয়ে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ পরিষদবর্গ রাতের অন্ধকারে তার ভাইয়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল। সকল ষড়যন্ত্র গোপনেই করা হল। রাজা আবজার রাজকীয় কাজকর্ম যথা নিয়মে চালিয়ে যেতে লাগলেন। শিশু রাজকুমার আসহামা তার অভ্যাস মত প্রাসাদ-আঙ্গিনায় খেলা করে কাটিয়ে দিতে লাগলো।

তারা একটি ঘাতকদল গঠন করে। তারা রাতের অন্ধকারে রাজ প্রাসাদের প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে রাজার শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ে এবং নির্মম ভাবে ঘুমন্ত রাজাকে হত্যা করে। শিশু

আসহামা তখন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে ছিল। পরিষদবর্গের পরিকল্পনা মত কাজ এগিয়ে চললো। নিহত রাজার ভাইয়ের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসানো হলো। হাবশাবাসী নতুন রাজার কল্যাণ কামনা করে আনন্দ-খুশিতে মেতে উঠলো। শিশু আসহামা তখন রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিতার শোকে চোখের পানি ফেলছিল। নতুন রাজা রাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নিজের নিহত ভাইয়ের কথা স্মরণ করতেন, অনুশোচনায় জর্জরিত হতেন। তখন নিজের বারোজন ছেলেকে কাছে ডেকে তাদেরকে নিজের দুঃখের কথা বলতেন। কিন্তু নির্মম ষড়যন্ত্রের কথা একেবারেই গোপন রাখতেন। নতুন রাজা তার ভতিজা আসহামাকে অত্যন্ত আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করতে থাকেন। তার ছেলেরাও তাকে খুবই আদর করতো। এভাবে শিশু আসহামা তার চাচার স্নেহ-আদরে বেড়ে উঠলো এবং যৌবনে পা রাখলো। তখন তার মুখ ও চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার ছাপ সুস্পষ্ট। ইমাম আয-যাহবীর (রহ) ভাষায়:^২

فَكَانَ لَيْتًا حَازِمًا مِنَ الرِّجَالِ

“তিনি হন বুদ্ধিমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষদের একজন।”

তার কথা ও আচরণে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে ওঠে। অল্প বয়সেই তিনি সব শ্রেণীর মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

আসহামা তার চাচার অন্তরে স্থান করে নিতে সক্ষম হন। এমন কি তার বারো ছেলের কাউকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং তার পরামর্শমত কাজ করতেন। ইমাম আয-যাহবীর ভাষায়:^৩

غَلَبَ عَلَى أَمْرِ عَمِّهِ، وَنَزَلَ مِنْهُ بِكُلِّ مَرَلَةٍ.

“তিনি তার চাচার কাজকর্মের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন।”

হাবশার জনসাধারণ ও বিশিষ্ট জনেরা দেখলো, এই যুবক তাঁর চাচার পাশে বসে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দিচ্ছেন। তার চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। চাচাও তার কাজে ও কর্মে ভীষণ সন্তুষ্ট। লোকেরা বলতে শুরু করলো, এই যুবক আজ আমাদের আমীর, তবে ভবিষ্যতে সেই হবে আমাদের রাজা।

রাজা ও জনগণের মুখে আসহামার প্রশংসা শুনে এবং তাদের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা দেখে সেই কুচক্রী পরিষদবর্গ শংকিত হয়ে পড়লো। তারা আবার হাবশা ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। শয়তান তাদেরকে আবার বিভিন্ন রকম প্ররোচনা দিতে থাকলো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে যেসব কথা বলাবলি করলো তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ:^৪

২. সিয়াকু আ'লাম আন-নুবালা', খ-১, পৃ. ৪২৮

৩. প্রাগুক্ত

৪. আত-তিয়ায আল-মানকুশ ফী মাহাসিন আল-হাবুশ, পৃ. ৫৫

والله إنا لتتخوف أن يملكه! ولئن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه.

“আল্লাহর কসম! আমাদের ভয় হচ্ছে তাকেই রাজা বানানো হয় কিনা। যদি তাকে রাজা বানানো হয় তাহলে আমাদের সকলকে সে হত্যা করবে। নিশ্চয় সে জেনে গেছে, আমরাই তার পিতাকে হত্যা করেছি।”^৫

কুচক্রী পরিষদবর্গ তাদের গোপন বৈঠক থেকে উঠে সোজা আসহামার চাচা রাজার নিকট গেল এবং কোন ভূমিকা না রেখে সরাসরি এই কথাগুলো বললো:^৬

إما أن نقتل هذا الفقى، وإما أن نخرجه من بين أظهرنا، فإننا قد خفنا على أنفسنا منه.

“হয় এই যুবককে আমরা হত্যা করবো, অথবা আমাদের মধ্য থেকে তাকে বের করে অন্য কোথাও সরিয়ে দেব। কারণ, তাকে নিয়ে আমরা আমাদের জীবনের ব্যাপারে ভীত-শংকিত হয়ে পড়েছি।”

তাদের একথা শুনে রাজা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: তোমাদের ধ্বংস হোক! গতকাল তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছো, আর আজ আমি তাকে হত্যা করবো? আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা-করবো না।^৭

পরিষদবর্গ রাজার উপর অব্যাহত ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অবশেষে রাজা বাধ্য হয়ে সম্মত হন যে, তাকে হত্যা নয়, বরং দেশ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে।

পরিষদবর্গের লোকেরা রাতের অন্ধকারে গোপনে যুবক আসহামার শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ে এবং জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে হাবশা সীমান্তে একটি দাস কেনাবেচার বাজারে হাজির করে। সেখানে এক দাস ব্যবসায়ীর নিকট মাত্র ছয় শো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রী করে। ব্যবসায়ী তার কেনা দাস নৌকায় বোঝায় করে স্বদেশে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাকে।^৮

এদিকে যেদিন আসহামাকে দাস হিসেবে বিক্রী করা হয় সেদিনই রাজা নাজাশী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজ প্রাসাদ- থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটতে বের হন। তিনি আপন মনে হাঁটছেন, আর ভাইয়ের হত্যা, নিজের রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হওয়া, সর্বশেষ তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন তরুন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দাস হিসেবে বিক্রীর কথা চিন্তা করছেন। আত্মগ্লানিতে মনটা যেন ছিড়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে, বিদ্যুতের চমকানি, মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সাথে মুশল ধারায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সবকিছু উপেক্ষা করে রাজা আপন মনে হাঁটছেন। হঠাৎ বিদ্যুতের একটা ঝলকানি হলো, বজ্রপাতের বিকট শব্দ

৫. ‘আসরুত তাবি’ঈন, পৃ. ৬৬৮

৬. সিয়রু আ’লাম আন-নুবালা’, খ. ১, পৃ. ৪৩০

৭. প্রাণ্ডু; ইবন কাছীর, আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়াহ, খ. ১, পৃ. ২৬০

৮. ‘আসরুত তাবি’ঈন, পৃ. ৬৬৯; আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়াহ, খ. ১, পৃ. ৪৩২

হলো, রাজ প্রহরীরা দেখলো, তাদের রাজা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। বজ্রপাতে রাজার মৃত্যু হলো।^৯

হাবশাবাসীদের এখন একজন নতুন রাজার প্রয়োজন। তারা মৃত রাজার ছেলেদের দিকে দৃষ্টি দিল। কিন্তু তাদের কারো মধ্যে রাজা হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা দেখতে পেল না। তারা সবাই নির্বোধ-বোকা। তাছাড়া তারা রাজ-ক্ষমতা লাভ করার জন্য নিজেরা হৃদয় সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছালো। এ অবস্থায় হাবশাবাসী শংকিত ও বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা বলাবলি করতে লাগলো: আল্লাহর কসম! এখন আসহামা ছাড়া তোমাদের এই দেশের হাল আর কেউ ধরতে পারবে না। তাকেই খুঁজে বের করতে হবে।” কিন্তু এখন সে কোথায় যে হারিয়ে গেল, কেউ তার সন্ধান দিতে পারলো না। আসলে তাকে যে দাস হিসেবে বিক্রী করা হয়েছে, সে কথা তো হাবশাবাসী জানতো না।

চক্রান্তকারী পরিষদবর্গ নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। খুব দ্রুত তারা আসহামাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বেরিয়ে পড়লো। তারা ক্রয়কারী দাস ব্যবসায়ীকে খুঁজে পেল এবং তার নিকট থেকে আসহামাকে ফিরিয়ে আনলো। হাবশাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারা আসহামাকে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসালো এবং নাজাশী উপাধি দিয়ে তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করলো। হাবশার জনগণের সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও অস্থিরতা কেটে গেল। নতুন রাজা তার তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রজ্ঞার দ্বারা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তার পরিষদবর্গের অতীত সকল ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর অজানা থেকে গেল। ষড়যন্ত্রকারী পরিষদবর্গ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছে। যদিও তারা তাদের পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আসহামাকে ক্রয়কারী সেই দাস ব্যবসায়ী পরিষদবর্গের নিকট এসে হাজির। তার উদ্দেশ্য, তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কিছু অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। তাই সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, যদি তোমরা আমাকে কিছু অর্থ না দাও, তাহলে আমি রাজার নিকট তোমাদের কৃতকর্মের কথা ফাঁস করে দেব। তারা বললো: আমরা তোমাকে কিছুই দেব না। তুমি তোমার কথা রাজাকে বলতে পার।^{১০}

ব্যবসায়ী বললো, আমি অবশ্যই রাজাকে সব কথা বলে দেব।

তারা বললো: ঠিক আছে, বলো।

ব্যবসায়ী হাবশার রাজা আসহামা নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলো। রাজা তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন, সে রাজাকে লক্ষ্য করে বললো: “মহামান্য রাজা, আমি বাজার থেকে, আপনার সম্প্রদায়ের একদল লোকের নিকট থেকে ছয় শো দিরহাম দিয়ে একটি দাস কিনি। তারা আমাকে দাসটি বুঝিয়ে দিয়ে দিরহাম ও বুঝে নেয়। আমি দাসটি নিয়ে দেশে

ফিরছি, পশ্চিমধ্যে তারা আমার নিকট থেকে দাসটি ফেরৎ নেয়, কিন্তু আমার দিরহামগুলি ফিরিয়ে দেয়নি।”

এমন অন্যায় ও অবিচারমূলক কাজের কথা শুনে ন্যায়পরায়ন রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি দরবারে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মী ও সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন: “তোমরা অবশ্যই তার প্রাপ্য দিরহামগুলি দিয়ে দিবে, অথবা দাসটিকে তার হাতে তুলে দিবে। এরপর সে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।” সভাসদরা সাথে সাথে বলে উঠলো, আমরা তার দিরহাম দিয়ে দিচ্ছি।

দাস ব্যবসায়ী তার দিরহাম নিয়ে চলে গেল, কিন্তু রাজা নাজাশী জানলেন না যে, তিনিই সেই দাস, সেই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। দিন, বছর গড়িয়ে চললো। ধীরে ধীরে পরিষদ বর্গের ষড়যন্ত্র, চাচার কর্মকাণ্ড, পিতার হত্যা, ও তার নিজের দাস হিসেবে বিক্রী হওয়া-সবকথাই তিনি জানতে পারলেন। প্রতিশোধের আগুনে তিনি জ্বলতে থাকলেন। কিন্তু সকল ক্ষোভ-উত্তেজনা প্রশমিত করে ধৈর্যধারণ করেন। অপরাধীদের সকলকে তিনি ক্ষমা করে দেন। মূলত: তাঁর প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহকে স্মরণ করেই এমন উদারতা প্রদর্শন করেন। আর তাই পরবর্তীকালে মক্কার নির্যাতীত মুসলিমরা যখন হিজরত করে তার নিকট আশ্রয় নেয় এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি তাকে কিছু উপহার দিতে চান, তখন তিনি তাদেরকে এই কথাগুলো শুনিতে দেন।”

ما أخذ الله من الرشوة حين ردَّ عليّ ملكي، فأخذ الرشوة فيه؟

“আল্লাহ যখন আমার রাজত্ব আমাকে ফিরিয়ে দেন তখন তিনি আমার নিকট থেকে কোন রকম ঘুষ নেননি। এখন আমি তাদের ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে ঘুষ নিব?”

আসহামা নাজাশী হাবশার রাজ-কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। আর এদিকে মক্কার মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভের ঘোষণা দিয়ে মানুষকে সত্য দীনের দিকে আহ্বান জানাতে শুরু করেন। সকল দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে মক্কার অনেকে সে আহ্বানে সাড়া দেন। এবং দিনে দিনে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা দেখে কুরাইশরা তাদের ধর্ম ও অভিজাত্য নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ে। তারা মুহাম্মাদের (সা) নতুন ধর্মকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যায়। তারা নতুন ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য নানা রকম পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে যারা একটু দুর্বল ও অসহায় ছিলেন, তাদের উপর চলছিল সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন। যাদের একটু গোত্রীয় শক্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাঁরাও একেবারে নিরাপদ ছিলেন না। কুরাইশ পাষন্ডরা তখন মক্কার একটা সম্রাসের রাজত্ব কায়ম করে। যেমন বিলাল ইবন রাবাহ- এর উপর নির্মম অত্যাচার করে নরাধম উমাইয়া ইবন খালাফ। ইয়াসিরের পরিবার মারপিট, হত্যা ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন।

‘আম্মার ইবন ইয়াসির ও তার পিতা ইয়াসিরকে (রা) দেয়া হয় চরম দৈহিক শাস্তি। আর আম্মারের মা সুমাইয়্যাকে (রা) হত্যা করা হয়। তিনিই হন ইসলামের প্রথম শহীদ। এমন কি রাসূলুল্লাহকে (সা) একটু কষ্ট দেয়ার জন্য আবু লাহাব ও উম্মু জামীল সর্বক্ষণ পিছু লেগে থাকতো। তবে তিনি চাচা আবু তালিবের সামাজিক মর্যাদার কারণে অনেকটা নিরাপদে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দেখলেন বিশাল বিস্তৃত মক্কার ভূমি তার অনুসারীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে তাদেরকে তিনি রক্ষা করতে পারছেন না, তখন একদিন তাদেরকে বলেন:^{১২}

لو حزجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق.

“তোমরা যদি হাবশার দিকে বেরিয়ে পড়তে, ভালো হতো। কারণ, সেখানে একজন রাজা আছেন যার নিকট কেউ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয় না। তা একটি সত্য ও ন্যায়ের ভূমি।” কিছু ঐতিহাসিক কথাটি এভাবে বলেছেন, যখন মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখন কুরাইশরা তৎপর হয়ে উঠলো। প্রতিটি গোত্র তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আবার পৌত্তলিক ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাদের উপর অসহনীয় জুলুম নির্যাতন শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে একদিন বলেন: তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। খুব শীঘ্র আল্লাহ তোমাদেরকে আবার একত্র করবেন। তারা বললেন: কোথায় যাব? রাসূল (সা) হাত দিয়ে হাবশার দিকে ইশারা করে বললেন: এই যে, এই দিকে! তারপর কিছু সংখ্যক মানুষ হাবশায় হিজরাত করেন। তাদের কেউ কেউ একা, আর কেউ কেউ পরিবারবর্গসহ হিজরাত করেন।^{১৩}

সেই সময়ে হাবশা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) আরেকটি উক্তি ইতিহাসে দেখা যায়। সেটি হলো:^{১৪}

إِنَّ بِهَا مَلِكًا صَالِحًا، لَا يُظْلَمُ وَلَا يُظْلَمُ عَنْدهُ، فَاخْرَجُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فُرْجًا وَمَخْرَجًا، وَأَرَادَ بِهِ النِّجَاشَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

“সেখানে একজন সত্যনিষ্ঠ রাজা আছেন, যিনি জুলুম করেন না, তার নিকট কারো উপর জুলুম করাও হয় না। তোমরা তার দিকে বেরিয়ে পড়। সেখানে থাক, যতদিন না আল্লাহ এই বিপদ থেকে বের হওয়ার জন্য মুসলিমদেরকে একটি ফাঁক ও পথ করে দেন।”

রাসূলুল্লাহর (সা) এমন আশা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার পর মক্কা থেকে সর্বপ্রথম চারজন নারী ও এগার জন পুরুষ, মোট পনেরো জন মানুষ গোপনে হাবশার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তারা হলেন: ‘উছমান ইবন ‘আফ্ফান, তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা রুকাইয়্যা, যুবায়র ইবন

১২. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, খ. ১, পৃ. ৩২১

১৩. ইবন সায্যিদিন নাস, ‘উয়ুন আল-আছার, খ. ১, পৃ. ২০৯

১৪. আত-তিরায় আল-মানকুশ ফী মাহাসিন আল-হাবশ, উদ্ধৃত: ‘আসরুত তাবি’ঈন, পৃ. ৬৭৯

আল-‘আত্তায়াম, ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ, আবু হুযায়ফা ইবন ‘উতবা, তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনত সুহায়ল ইবন ‘আমর, মুস‘আব ইবন যুবাইর, আবু সালামা ইবন অ‘বদিল আসাদ, তার স্ত্রী উম্মু সালাম বিনত আবী উমাইয়া, ‘উছমান ইবন মাজ্জ‘উন, ‘আমির ইবন রাবী‘আ ও তার স্ত্রী লায়লা বিনত আবী খায়ছামা, হাতিব ইবন ‘আমর ও সুহায়ল ইবন বায়দা’ (রা)। উল্লেখ্য যে, এই সুহায়ল ইবন বায়দা’ ও সুহায়ল ইবন ওয়াহাব ইবন রাবী‘আ আল-ফিহরী (রা) একই ব্যক্তি।^{১৫}

এই দলটি মক্কা থেকে বেরিয়ে সরাসরি সাগরের দিকে চলে যান এবং সেখান থেকে হাবশাগামী একটা বড় নৌকায় চড়ে বসেন। মক্কার কুরাইশরা তাদেরকে ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করে সাগর পাড়ে পৌছে। কিন্তু ততক্ষণে মুহাজির দলটি তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এটা রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়্যাত লাভের পঞ্চম বছরের ঘটনা। এটা হলো প্রথম হিজরাত।

এরপর মক্কা থেকে দ্বিতীয় আরেকটি মুসলিম দল হাবশার দিকে যাত্রা করেন। এই দলটিতে ছিলেন: জা‘ফার ইবন আবী তালিব, তার স্ত্রী আসমা’ বিন্ত ‘উমাইস। এই আসমা’ হাবশায় তার তিন ছেলে মুহাম্মাদ, ‘আবদুল্লাহ ও ‘আওনকে জন্ম দেন। এই দলে আরো ছিলেন: সাঈদ ইবন আল‘আস, তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত সাফওয়ান, খালিদ ইবন সাঈদ, তার স্ত্রী আমীনা বিন্ত খালাফ আল-খুযা‘ইয়া, ‘উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তার স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা)। উল্লেখ্য যে, এই ‘উবায়দুল্লাহ হাবশায় অবস্থানকালে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আর উম্মু হাবীবাকে রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে তিনি উম্মুল মু‘মিনীনের মর্যাদা লাভ করেন। এই দলে আরো ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ আল-হুযালী, তার ভাই ‘উতবা ইবন মাস‘উদ (রা) ও আরো অনেকে। তারা সকলে পর্যায়ক্রমে হাবশায় পৌছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলটি কিছুদিন হাবশায় অবস্থান করেন। সেখানে তাঁরা বেশ আরামেই ছিলেন। কিছুদিন পর তাদের নিকট এ সংবাদ পৌছলো যে, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সদয় হয়েছে। আর এ সংবাদের ভিত্তিতে তারা হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। মক্কা এসে তারা বুঝতে পারেন সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে আরো কঠোর আচরণ করতে থাকে। আল্লাহর রাসূল (সা) ও তার সাহাবীদের উপর জুলুম-নির্যাতন মাত্রাছাড়া রূপধারণ করে। হাবশা থেকে ফিরে আসা লোকগুলো আবার সেখানে ফিরে গেলেন। এবার তাদের সাথে যোগ দেন মক্কার আরো বহু মুসলিম। একেই বলা হয় হাবশার দ্বিতীয় হিজরাত। নারী ও শিশু ছাড়া হাবশায় হিজরাতকারী পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট বিরাশি (৮২) জন। সেখানে তারা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপন

করতে থাকেন। মুক্ত ও স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতেন। কোন রকম কটু কথা তাদের শুনতে হতো না এবং জুলুম নির্ধাতনের কোন ভয় ও তাদের ছিল না।^{১৬}

মক্কার কুরাইশরা যখন দেখলো, মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গী-সাথীরা হাবশায় বেশ নিরাপদে আছে, নিশ্চিন্তে তাদের ধর্মপালন করেছে এবং রাজা নাজাশীর আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আরামেই দিন কাটাচ্ছে, তখন তারা প্রসাদ শুনলো। তারা হাবশায় মুসলিমদের এমন শান্ত ও নিরিবিলা জীবন মেনে নিতে পারলো না। তারা একত্রে বসে বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। তারা বলাবলি করলো, এভাবে যদি তাদেরকে সেখানে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং মক্কার বাইরে তাদের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তা হবে কুরাইশদের জন্য আত্মঘাতীর শামিল। সুতরাং সেখানে তাদেরকে আর থাকতে দেয়া যায় না, যে কোন ভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে।

তারা স্থির করলো, ‘আবদুল্লাহ ইবন রাবী’আ ও ‘আমর ইবন আল-‘আসকে হাবশার রাজার নিকট দূত হিসেবে পাঠাবে। তারা রাজার সাথে আলোচনা করে সে দেশে আশ্রয় নেওয়া মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনবে। এ উদ্দেশ্যে নাজাশী ও তার সভাসদদের জন্য মূল্যবান উপটোকন প্রস্তুত করা হলো এবং বিপুল জাকজমকের সাথে দূতদ্বয় রওনা হলো।^{১৭}

এ প্রসঙ্গে উম্মু সালামা বিন্ত উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরার বর্ণনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনিও হাবশায় হিজরাত করেন এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করায় উম্মুল মু‘মিনীন (বিশ্বের সকল মু‘মিনের মা)- এর গৌরভ জনক আসন লাভ করেন। তিনি বর্ণনা করছেন এভাবে:^{১৮}

لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى،
لأنؤذى، ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً، اتهموا بينهم أن يبعثوا إلى
النجاشي فينا رجلين منهم جلين منهم جلدتين، وأن نهدد النجاشي هدايا مما يستطرف من
متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من
بطارقه بطريقاً إلا أهدوا له هديّة، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص،
وأمرؤهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعاً إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلمنا النجاشي فيهم، ثم
قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم.

“আমরা হাবশার যমীনে উপস্থিত হবার পর একজন উত্তম প্রতিবেশী পেলাম। তিনি স্বয়ং নাজাশী। আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করলাম। নিবিঘ্নে আল্লাহর ইবাদাত করতে লাগলাম। কোন কষ্টদায়ক ব্যবহার ও কেউ করছিল না এবং কোন

১৬. প্রাণ্ডক, পৃ. ৬৮১

১৭. ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৩৩৩

১৮. প্রাণ্ডক, খ. ১, পৃ. ৩৩৪

অর্থীতিকর কথাও আমাদের শুনতে হচ্ছিল না। কুরাইশরা একথা জানতে পেরে সিদ্ধান্ত নিল যে, নাজাশীর কাছে আমাদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য দু'জন শক্ত ও সাহসী দূত পাঠাবে এবং নাজাশীর জন্য মক্কার চোখ জুড়ানো মূল্যবান জিনিস উপটোকন হিসেবে পাঠাবে। নাজাশীর কাছে মক্কা থেকে যে সব জিনিস আসতো তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বিবেচিত হতো সেখানকার চামড়া। তাই তার জন্য কুরাইশরা প্রচুর চামড়া সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিল। নাজাশীর দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রধান বিশপগণের কাউকে তারা উপহার দিতে বাদ রাখেনি, এসব উপহার-উপটোকন সহকারে 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ ও 'আমর ইবন আল-'আসকে পাঠালো এবং তাদের করণীয় কাজ তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। তারা তাদেরকে বলেছিল: মুহাজিরদের সম্পর্কে নাজাশীর সাথে কথা বলার আগে তোমরা প্রত্যেক উচ্চ পদস্থ দরবারী ও বিশপকে উপটোকন দেবে। অতঃপর নাজাশীকে উপটোকন দিয়ে অনুরোধ করবে, তিনি যেন মুহাজিরদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পন করেন এবং সমর্পন করার আগে তাদের সাথে যেন কোন কথা না বলেন।”

তারা মক্কা থেকে রওনা করে নাজাশীর কাছে পৌঁছলো। তারা তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাজাশীর সাথে কথা বলার আগে রাজ দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও বিশপদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে কথা বললো এবং তাদেরকে মূল্যবান উপহার-উপটোকন দিল। তাদেরকে তারা বললো: আমাদের দেশ থেকে কিছু নির্বোধ লোক আপনাদের রাজার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজ জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে, কিন্তু আপনাদের ধর্ম ও অবলম্বন করেনি। তারা এক নতুন ধর্ম তৈরী করেছে যার সাথে আমরা বা আপনারা কেউই পরিচিত নই। জাতির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদেরকে রাজার কাছে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বজাতির কাছে ফেরত পাঠান। আমরা যখন রাজার সাথে কথা বলবো তখন আপনারা রাজাকে তাদের ফেরত পাঠাতে ও তাদের সাথে কোন কথা না বলতে পরামর্শ দেবেন। কারণ, তাদের দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ সম্পর্কে তাদের জাতিই সবচেয়ে ভাল জানে। দরবারীরা সবাই এতে সম্মতি জানালো।

তারা দু'জন নাজাশীর সামনে উপস্থিত হলো এবং তাঁর জন্য আনা উপহার-উপটোকন তাঁর হাতে তুলে দিল। নাজাশী তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তারা দু'জন তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো এভাবে:

أيها الملك! إنه قد صُنِيَ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بَعَثْنَا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرتهم لترُدَّهُم إلينا، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.

“হে রাজন্য! আমাদের দেশ থেকে কিছু নির্বোধ যুবক আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনার ধর্ম ও গ্রহণ করেনি। তারা একটা নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়েছে যা আপনার বা আমাদের কাছে অপরিচিত। তাদের ব্যাপারে আপনার কাছে তাদের স্বজাতির সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির আামাদেরকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তারা তাদের বাবা-চাচা ও গোত্রীয় লোকজন। তাদেরকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ নিয়েই আমরা এসেছি। তাদের কি দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ আছে তা তারাই সমধিক অবগত।”

উম্মু সালামা (রা) বলেন, নাজাশী মুহাজিরদের বক্তব্য শুনুক তা ‘আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী’আ ও ‘আমর ইবন আল-‘আস মোটেই চাচ্ছিল না। রাজার পরিসদবর্গ রাজাকে বললো: ওরা দু’জন ঠিক বলেছে। তাদের স্বজাতি তাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে ভালো জানে। কাজেই তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করে দিন। তারা তাদেরকে স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।

নাজাশী ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন: না, এ পরিস্থিতিতে আমি তাদেরকে এই দূতদ্বয়ের হাতে সমর্পণ করবো না। এক দল লোক আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করছে, আমার দেশে অতিথি হয়েছে। তারা অন্য কোথাও না গিয়ে আমার কাছে আসা শ্রেয় মনে করেছে। আমি তাদেরকে ডাকবো এবং এই আগন্তুকদ্বয়ের বক্তব্য সম্পর্কে তাদের বক্তব্য শুনবো। যদি এদের বক্তব্য সত্য হয় এবং আশ্রিতরা তদ্রূপ হয় তাহলে ওদেরকে সমর্পণ করবো এবং তাদেরকে স্বজাতির কাছে ফেরত পাঠাবো। অন্যথায় পাঠাবো না। যতদিন তারা আমার কাছে থাকতে চায়, থাকবে। তিনি তাঁর কথা শেষ করেন এভাবে:”

إني والله لا أنسى فضل الله عليّ، فلقد ردّ في إلى أرضي، وحماني من كيد الكائدين لي، وصانني من بغى الباغين عليّ.

“আল্লাহর কসম! আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা আমি ভুলবো না। তিনি আমাকে আমার দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং সীমালংঘনকারীদের বাড়াবাড়ি থেকে আমাকে হিফাজত করেছেন।”

কুরাইশরা নাজাশীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় বৈঠকে এভাবে কূটনীতিতে পরাজিত হলো। কারণ তারা কেবল নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার কথাই মাথায় রেখেছিল, প্রতিপক্ষ মুহাম্মাদের (সা) অনুসারীদের কোন মূল্য আছে তা তারা কখনো চিন্তাই করেনি। এ কারণে তাদের চেহারা বিষন্নতার ছাপ ফুটে উঠলো।

উম্মু সালামা (রা) বলেন: অতঃপর নাজাশী রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন। নাজাশীর বার্তাবাহক যখন মুহাজিরদের ডাকতে গেল তখন তারা পরামর্শ করতে বসলেন। একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজার কাছে গিয়ে কী বলা হবে? অবশেষে এই সিদ্ধান্তে

আসলেন যে, আমরা যা জানি এবং আমাদের নবী যা নির্দেশ দিয়েছেন তা-ই বলবো। তাতে পরিণতি যা যা হয় হবে।

তাঁরা দরবারে গেলেন। ঢুকেই তাঁরা দেখলেন, ‘আমর ইবন আল-‘আস ও ‘আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী’আ সেখানে বসে আছে। নাজাশী পূর্বেই ধর্ম যাজকদের ডেকে হাজির করে রেখেছেন। তাঁরা রাজার সামনে ইন্জীল খুলে বসে আছেন।

তাঁরা রাজাকে ইসলামী কায়দায় সালাম দিলেন এবং মাজলিসের শেষ প্রান্তে বসে পড়লেন। ‘আমর ইবন আল-‘আস তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: কী ব্যাপার, তোমরা রাজাকে সাজদা করলে না যে? তারা বললেন: আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সাজদা করি না।

নাজাশী তাদের কথা শুনে সন্তোষিত সূচক মাথা ঝাঁকালেন। তারপর তিনি মুহাজিরদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের সেই ধর্মটা কি যা গ্রহণ করে তোমরা নিজ জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো এবং আমার ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম ও গ্রহণ করনি?

মুহাজিরদের পক্ষ থেকে জা‘ফার ইবন আবী তালিব (রা) উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাবে বললেন:^{২০}

أيها الملك ! كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام ونسى الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقة وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّد وحده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآبائنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وهأنا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.

“হে রাজা! আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। আমরা করতাম মূর্তি পূজা। মৃত জীব-জন্তুর গোশত খেতাম এবং অনীল ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম। আমরা নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করতাম এবং আমাদের মধ্যে যে সবল সে দুর্বলের হক আত্মসাত করতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে নবী করে পাঠালেন। আমরা তাঁকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সত্যবাদী বলে জানি এবং বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী রূপে তাঁকে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ‘ইবাদাত করার ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার আহ্বান জানান। আল্লাহকে ছাড়া অন্য যে সব বস্তু তথা পাথর ও মূর্তি ইত্যাদির পূজা আমরা করতাম, তিনি তা ছাড়তে বললেন। তিনি সত্য বলা,

আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং নিষিদ্ধ কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীল কাজ করতে, মিথ্যা বলতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করতে ও সতী-সাক্ষী নারীদের প্রতি অপবাদ দিতে নিষেধ করলেন। আমাদেরকে এক আল্লাহর 'ইবাদাত করতে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে বললেন। সালাত আদায় করতে ও যাকাত দিতে বললেন।"- এভাবে জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) একে একে ইসলামের বিধানগুলো তুলে ধরলেন।

জা'ফার (রা) আরো বললেন: আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব বিধান দিলেন তার অনুসরণ করতে লাগলাম। এক আল্লাহর 'ইবাদাত করতে লাগলাম এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করলাম না। তিনি যা কিছু হারাম ঘোষণা করলেন, আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম, আর যা কিছু হালাল ঘোষণা করলেন, আমরা তা হালাল বলে মেনে নিলাম। এতে আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেল, তারা আমাদের উপর নির্যাতন চালাতে লাগলো এবং আমাদেরকে এক আল্লাহর 'ইবাদাত থেকে মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে লাগলো যেন আমরা ঘৃণ্য অপকর্মসমূহকে আবার হালাল মনে করি।

বুদ্ধিদীপ্ত জা'ফার (রা) তাঁর বক্তব্য যে কথাগুলোর মাধ্যমে শেষ করেন তা ছিল একদিকে কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচারের বর্ণনা, অন্যদিকে আশ্রয়দানকারী রাজা নাজাশীর প্রশংসা মূলক। তিনি বলেন:”

فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورجبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

“তারা যখন এভাবে আমাদের উপর বল প্রয়োগ করতে লাগলো, জুলুম-নির্যাতন দ্বারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুললো এবং আমাদের ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমরা আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিলাম। অন্যদের চেয়ে আপনাকেই উত্তম মনে করলাম এবং আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে আগ্রহী হলাম। মাহমান্য রাজা! আমাদের আশা এই যে, আপনার কাছে আমরা অত্যাচারের শিকার হবো না।”

নাজাশী জা'ফারের কথার সত্যতা যাঁচায়ের জন্য কিছু প্রমাণ চাইলেন। প্রথমেই তিনি জা'ফারকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর যে বাণী নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ কি তোমার কাছে আছে?

জা'ফার (রা) বললেন: হ্যাঁ, আছে।

নাজাশী বললেন: আমাকে পড়ে শোনাও।

জা'ফার (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করলেন। তারপর সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে পাঠ করতে শুরু করলেন:^{২২}

كهيعص- ذكر رحمت ربك عبده زكريا- إذ نادى ربه نداءً خفياً- قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً ... (مریم- ۱- ۴)

“কাফ-হা-যা-‘অয়ন-সাদ; এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃত। সে বলেছিল, ‘হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়েছে, বার্ষিক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।’

এভাবে পড়তে পড়তে তিনি নিম্নের আয়াতগুলোতে পৌঁছে গেলেন:^{২৩}

واذكر في الكتاب مريم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهن حجانا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراسويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً. قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسبا منسا. فنادها من تحتها ألا تحزنى نجعل ربك تحتك سرياً. (مریم ۱۶- ৪৪)

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো। মারইয়াম বললো, আল্লাহকে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও, আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় চাচ্ছি। সে বললো, আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য। মারইয়াম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই? সে বললো, একরূপেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এ আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করবো যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এ তো এক স্থিরিকৃত ব্যাপার। তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো, অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো।

সে বললো, হায়, এর পূর্বে আমি যদি মারা যেতাম ও মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম। ফেরেশতা তার নিম্নপার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বললো, তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন।”

উল্লেখিত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করার পর জা'ফার (রা) চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন রাজা নাজাশী কাঁদছেন, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজ়ে গেছে। আর তার সাথে ধর্ম যাজকরাও কাঁদতে কাঁদতে ইনজীল ডিজিয়ে ফেলেছেন। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। নাজাশী বস্তব্য করলেন:

إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَىٰ مِنْ مَّشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ.

“আমি নিশ্চিত যে, এই বাণী এবং ঈসার কাছে যে বাণী আসতো, উভয়ই একই উৎস থেকে নির্গত।”

তারপর তিনি ‘আমর ইবন আল-‘আস ও তার সঙ্গীর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন:

انطلقا، فلا ولا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون.

“হে কুরাইশদের দূতদ্বয়! তোমরা চলে যাও। আল্লাহর কসম! না, আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে সর্মপণ করবো না। তারা এখানেই থাকবে।”

ন্যায়পরায়ণ রাজা নাজাশীর উপস্থিতি ও মধ্যস্থতায় মক্কার কুরাইশ প্রতিনিধি ও মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিতর্ক যুদ্ধ হয়, এ ছিল তার একটি অংশ। এই বিতর্ক ও সংলাপের আরো কিছু অংশ ও চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে এভাবে:

‘আমর ইবন আল-‘আস তার সঙ্গীকে নিয়ে আগেই নাজাশীর দরবারে হাজির হন। দরবারে ঢুকে তারা হাবশার রীতি অনুযায়ী নাজাশীকে সাজদা ও সালাম করেন। তবে জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) দরবারের দরজায় দাড়িয়ে অনুমতি চান এভাবে:

আল্লাহর দল আপনার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। নাজাশী তার প্রহরীদেরকে বললেন: তোমরা এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তার কথাটি আবার উচ্চারণ করতে বল। জা'ফার (রা) এবার উচ্চ স্বরে বললেন: আল্লাহর দল আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছে। নাজাশী বললেন: হা, আপনারা আল্লাহর নিরাপত্তা ও জিম্মাদারিতে প্রবেশ করুন।

অতঃপর ‘আমর ইবন আল-‘আস তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন: দেখেছেন, তারা কিভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর দল বলে দাবী করছে? নাজাশী তার কথার কোন জবাব দিলেন না। এতে ‘আমর ও তার সঙ্গী কষ্ট পেলেন। অতঃপর জা'ফার (রা) ও তার সঙ্গীরা দরবারে প্রবেশ করলেন। তবে নাজাশীকে সাজদা করলেন না। ‘আমর ইবন আল-‘আস নাজাশীকে বললেন:

মহামান্য রাজা: আপনি দেখলেন তো, তারা আপনাকে সাজদা করার ব্যাপারে কত অহংকারী!

নাজাশী বললেন: আপনারা আমাকে সাজদা করলেন না কেন এবং মানুষ আমাকে যেভাবে অভিবাদন জানায় সেভাবে অভিবাদন জানালেন না কেন?

জা'ফার অন্যান্য মুহাজিরদের পক্ষ থেকে বললেন:

تسجد لله الذي خلقك مَلَكًا، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأصنام، فبعث الله فينا نبياً صادقاً، منا نعرف نسبه وصدقه، وأمرنا بالتحية التي رضىها الله تعالى، وهي السلام، تحية أهل الجنة.

“আমরা সেই আল্লাহকে সাজদা করি যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনাকে রাজা বানিয়েছেন। আমাদের অভিবাদন ছিল আপনাদের মত, যখন আমরা মূর্তির পূজা করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মাঝে একজন সত্যবাদীকে নবী হিসেবে পাঠালেন, যার বংশ পরিচয় ও সততা সম্পর্কে আমরা জানি। তিনি আমাদেরকে যে অভিবাদনের নির্দেশ দেন তাতে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি রয়েছে, আর তা হলো- সালাম। আর তা হলো জান্নাতের অধিবাসীদের অভিবাদন।”^{২৪}

নাজাশী বুঝে গেলেন, জা'ফারের বক্তব্য সত্য। তাওরাত ও ইনজীলে এমন কথাই এসেছে। তারপর তিনি বললেন: ‘আল্লাহর দল আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছে’- আপনাদের মধ্যে কথাটি কে বলেছিলেন জা'ফার বললেন: আমি। নাজাশী বললেন: আপনি কথা বলুন।

জা'ফার বললেন: আপনি পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন রাজা। আপনি আহলি কিতাব তথা আসমানী কিতাবধারীদের একজন। আপনার নিকট বেশি কথা বলা শোভনীয় নয়। আমি আমার দলের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। আপনি আমার প্রতিপক্ষ দু'জনের একজনকে কথা বলার নির্দেশ দিন এবং অন্য জনকে চুপ থাকতে বলুন। তারপর আপনি মনোযোগ সহকারে আমাদের সংলাপটি শুনুন।^{২৫}

জা'ফারের কথা শেষ না হতে ‘আমর ইবন আল-‘আস বলে উঠলেন: জা'ফার, তুমিই আগে বল। জা'ফার নাজাশীকে বললেন: আপনি এই দু'ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করুন তো, আমরা দাস না স্বাধীন? আমরা যদি দাস হই তাহলে আমরা কি মনীবের নিকট থেকে পালিয়ে এসেছি? নাজাশী ‘আমরকে জিজ্ঞেস করলেন: তারা দাস না স্বাধীন? ‘আমর বললেন: না, তারা সম্ভ্রান্ত স্বাধীন। দীর্ঘ বক্তৃতা না করে কেবল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে পারঙ্গম জা'ফার (রা) এবার ‘আমরের দিকে আরেকটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন: আচ্ছা, আমরা কি অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছি? নাজাশী এবার

২৪. আভ-তিরায় আল-মানকুশ, উদ্ধৃত: ‘আসরুত তারি'ঈন, পৃ. ৬৯২-৬৯৩

২৫. প্রাণ্ড, ৬৯৩

জা'ফারকে লক্ষ্য করে বললেন: যদি তেমন কিছু হয় তাহলে সে সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন, আমি তা পরিশোধ করবো। তবে 'আমর ইবন আল-'আস বললেন: না, তারা কোন অর্থ-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে আসেনি। এবার নাজাশী 'আমরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এত জেদ ধরে আছ কেন? 'আমর তার পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন: তারা তাদের পূর্ব পুরুষের দীন ত্যাগ করেছে।^{২৬}

মক্কার কুরাইশ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য এভাবে ব্যর্থ হলো। তবে এতে তারা একেবারে আশা ছেড়ে দিল না। তাদের মাথায় তখনো আরো কিছু ষড়যন্ত্র বাকী ছিল। সে সম্পর্কে উম্মু সালাম (রা) বলেছেন, দরবার থেকে বেরিয়ে 'আমর ইবন আল-'আস বললেন: আল্লাহর কসম! আগামীকাল আমি আবার নাজাশীর কাছে আসবো। তখন তাকে এমন কথা বলবো যা আশ্রিত মুসলিমদের সমূলে উৎখাত করে দেবে। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ আশ্রিত মুসলিমদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সংযত ছিলেন। তিনি বললেন: এমন করো না। যদিও তারা আমাদের বিরোধী, তাহলেও আমাদের এত দূর যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, তাদের বহু রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। 'আমর ইবন আল-'আস বললেন: আমি নাজাশীকে জানাবো যে, মুসলিমরা 'ঈসা ইবন মারইয়ামকে আল্লাহর বান্দা বলে বিশ্বাস করে।

পরদিন 'আমর ইবন আল-'আস নাজাশীর দরবারে আবার হাজির হয়ে তাকে বললেন: হে রাজা! আশ্রিতরা 'ঈসা ইবন মারইয়াম সম্পর্কে একটা মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি তাদের ডাকুন এবং 'ঈসা সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রাজা নাজাশী আবার মুসলিমদেরকে দরবারে ডাকলেন ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মতামত জানার জন্য। উম্মু সালাম (রা) বলেন, এবার আমরা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। মুসলিম মুহাজিররা আবার পরামর্শের জন্য সমবেত হলেন। সবার সামনে এখন নতুন প্রশ্ন: নাজাশী 'ঈসা (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কি বলবো? অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, আল্লাহ যা বলেছেন এবং আমাদের নবী যে সত্য ধারণা দিয়েছেন, আমরা ঠিক তাই বলবো। এর পরিণতি যা হওয়ার, হবে।

মুহাজিররা দরবারে উপস্থিত হলে নাজাশী তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? জা'ফার (রা) বললেন: আমাদের নবী (সা) তার সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন, আমরা তাই বলে থাকি। তিনি বলে: 'ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তারই ফুঁকে দেওয়া রুহ এবং তারই বাণী যা তিনি কুমারী ও পুরুষদের স্পর্শমুক্ত মারইয়ামের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এ কথা শুনা মাত্র নাজাশী প্রবল আবেগে-উচ্চাসের বশে মাটিতে হাত চাপড়িয়ে একখানা ছোট কাঠ হাতে নিলেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম! তুমি যা বলেছো তার সাথে মারইয়ামের পুত্র ঈসার এই কাঠের পরিমাণ পার্থক্যও নেই।

নাজাশীর মুখ থেকে একথা বের হওয়ার সময় দরবারে উপস্থিত লোকেরা ফিসফিস করে কি যেন বললো। তিনি তা শুনে বললেন: যতই ফিসফিস করো না কেন, আমার মত অপরিবর্তিত থাকবে।

তারপর তিনি জা'ফার ও তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমরা এখন নিজ নিজ বাসস্থানে যাও। আমার রাজ্যে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে থাকবে। যে তোমাদের গালাগাল করবে তাকে জরিমানা করা হবে। তোমাদের কোন একজনকেও কষ্ট দিয়ে আমি যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ লাভ করি, তবুও আমি তা পছন্দ করি না। তারপর তিনি হাত দিয়ে রাজকর্মচারী ও নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে ইঙ্গিত করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দেন: তোমরা এই দৃতত্বয়ের দেওয়া উপহার সামগ্রী ফিরিয়ে দাও। ওগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর তারা উভয়ে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিলে গেলেন। তাদের দেওয়া উপহারও ফেরত দেওয়া হলো। অন্য দিকে মুহাজিরগণ অত্যন্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশে ও পরম সুজন প্রতিবেশীর সাহচর্যে বসবাস করতে লাগলেন।^{২৭}

এক রকম নিরুদ্বেগ পরিবেশে মুসলিম মুহাজিরগণ জীবনযাপন করছিলেন। হঠাৎ হাবশার এক ব্যক্তি নাজাশীর সাথে তাঁর রাজত্বের অধিকার নিয়ে দ্বন্দে লিপ্ত হলো। তখন মুহাজিরগণ যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পড়েন তেমন আর কখনো তারা পড়েননি। তাদের আশংকা ছিল ঐ ব্যক্তি যদি নাজাশীর বিরুদ্ধে জয়ী হয় তাহলে সে হয়তো নাজাশীর মত তাদের আশ্রয় দিতে চাইবে না এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও স্বীকার করবে না। নাজাশী তার ঐ প্রতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। দু'প্রতিপক্ষের মাঝখানে পড়লো নীল নদ। মুহাজিরগণ বললেন: আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে হাবশার জনগণের এই যুদ্ধের সময় রনাজনে উপস্থিত হবে এবং যুদ্ধের ফলাফল কি হয় তা দেখে এসে আমাদের জানাবে? যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম (রা) বললেন: আমি যাবো। বয়সে ছোট এই সাহাবীর ইচ্ছায় সবাই সম্মতি দিলেন।

একটা চামড়ার মশকে হাওয়া ভরে যুবাইরের সঙ্গে দেওয়া হলো। তিনি ওটা বুকের উপর বেধে তার উপর ভর করে সাতার কেটে নীল নদের অপর পাড়ে গিয়ে ওঠেন। তারপর হেটে রনাজনে হাজির হন।

এসময় মুহাজিরগণ আল্লাহর কাছে নাজাশীর বিজয় এবং দেশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য দু'আ করতে থাকেন। যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য মুহাজিরগণ যখন অধীর অপেক্ষায় তখন একদিন যুবাইর (রা) দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললেন: সুসংবাদ! নাজাশী জয়লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করেছেন এবং হাবশায় তাঁর কর্তৃত্ব বহাল রেখেছেন। এরপর হাবশায় তাঁর শাসন সুসংহত হয়।^{২৮}

এ সময় হাবশার রাজনীতিতে আরেকটি ঘটনা ঘটে। নাজাশী কুরাইশ প্রতিনিধিত্বের দাবী প্রত্যাখ্যান করে মুসলিম মুহাজিরদের পক্ষ অবলম্বন করায় রাজ দরবারের ধর্ম গুরুরা ক্ষেপে যায়। তারা প্রচার করতে থাকে যে, নাজাশী স্বধর্ম ত্যাগ করে আরেকটি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তিনি হাবশার রাজত্বের অধিকার হারিয়েছেন। হাবশার জনগণও ধর্মগুরুদের এ প্রচারে বিশ্বাস করলো এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। নাজাশী আশ্রিত মুহাজিরদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি জা'ফার (রা) ও তার সঙ্গীদেরকে সার্বিক অবস্থা অবহিত করলেন। তাদের জন্য একটি সামুদ্রিক জাহাজ প্রস্তুত রাখলেন এবং তাদেরকে বললেন: ভবিষ্যতে যদি খারাপ কিছু ঘটে তার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আমার পরাজয় ঘটলে আপনারা এই জাহাজে চড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। আর আমি বিজয়ী হলে আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।

অতঃপর তিনি কিছু লেখার জন্য হরিনের কিছু মসৃণ চামড়া আনতে বললেন। চামড়া আনা হলে তার উপর লিখলেন:

أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده وخاتم رسله. وأشهد أن عيسى عبده ورسوله،
وكلمته التي ألقاها إلى مريم.

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তা ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও তাঁর সর্বশেষ রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর রুহ এবং তাঁর কালিমা (বাণী) যা তিনি মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।”

তিনি এই লিখিত চামড়াটি নিজের ডান কাঁধ বরাবর বুকের উপর ঝুলিয়ে বিদ্রোহীদের মুখোমুখী হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাদের সামনে পৌঁছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: ওহে হাবশার জনগণ! আপনাদের মাঝে আমার জীবন-আচরণ কেমন দেখেছেন? তারা বললো: উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দেখেছি। তিনি বললেন: তাহলে আমার বিরুদ্ধে কেন ক্ষেপেছেন? তারা বললো: আপনি আমাদের ধর্মত্যাগ করেছেন এবং আপনি বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা। নাজাশী বললেন: তোমরা ঈসা (আ) সম্পর্কে কি বলে থাক? তারা বললো: তিনি ‘ইবনুল্লাহ’ আল্লাহর পুত্র। নাজাশী তাঁর গলায় ঝুলানো সেই লিখিত

চামড়ার দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন: আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি ঈসা (আ) এর চেয়ে মোটেও বেশি কিছু নন। আসলে নাজাশীর গলায় ঝুলানো চামড়ায় ‘ঈসা আল্লাহর পুত্র’- একথা লেখা ছিল না। নাজাশী কিছুটা চালাকির আশ্রয় নেন। তার একথায় উত্তেজিত জনগণ খুশি হয়ে গেল। তারা সকলে যার যার বাড়িতে ফিরে গেল আর এভাবে ধর্মগুরুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল।

এদিকে মক্কায় অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ (সা) হাবশায় যা কিছু ঘটছে, আশ্রিত মুসলিমদের সাথে নাজাশীর আচরণ, তাদেরকে শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে বসবাসের সুযোগ দান, কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে রূঢ় ব্যবহার, খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের বিদ্রোহ ও নাজাশীর বিজয়, কুরআনের পক্ষে তাঁর অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও নাজাশীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ না হলেও দু’জনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সপ্তম হিজরীর ১ম মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) তৎকালীন বিশ্বের ছয় জন শ্রেষ্ঠ রাজা ও শাসককে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি প্রত্যেকের নামে একটি করে পত্র লিখেন। তাতে তিনি ইসলামের পরিচয়, ঈমানের তাৎপর্য এবং কুফর ও শিরকের ভ্রান্তি ও অপকারিতা তুলে ধরেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ছয়জন সেরা সাহাবীকে বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেন। তাদেরকে যে যে জাতির নিকট পাঠানো হবে তারা সেই জাতির ভাষা শেখেন। অতঃপর তারা একই দিন মদীনা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে বেরিয়ে পড়েন। হাবশার রাজা নাজাশীর নিকট যাকৈ পাঠানো হয় তিনি হলেন ‘আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দুমারী (রা)। ‘আমর ইবন উমাইয়্যা (রা) হাবশায় পৌঁছে নাজাশীর সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলামী কায়দায় তাকে সালাম দেন। নাজাশী ও একই কায়দায় সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগতম জানান। মাজলিসে প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষে ‘আমর রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রটি নাজাশীর হাতে তুলে দেন। নাজাশী দ্রুততার সাথে পত্রটি খুলে পাঠ করেন। পত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) নাজাশীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং কুরআনের কিছু আয়াতও লিখে পাঠিয়েছেন। নাজাশী পত্রটি নিজের চোখের উপর রেখে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং পত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি বিনীত ভাব প্রদর্শনের জন্য সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। তারপর সভাসদদের সামনে তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে বলেন: আমার পক্ষে সম্ভব হলে, আমি মুহাম্মাদের (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর দু’পায়ের উপর আমার মাথাটি রাখতাম, অথবা তিনি বলেন, আমি তাঁর জুতা বহন করতাম।^{২৯}

অতঃপর নাজাশী রাসূলুল্লাহকে (সা) একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বান মেনে নেওয়ার এবং ইসলাম গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করেন। ঠিক সে সময় দূত ‘আমর ইবন উমাইয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) লিখিত আরেকটি পত্র নাজাশীর হাতে তুলে

দেন। এই পথে তিনি হাবশায় অবস্থানরত রামলা বিন্ত আবী সুফইয়ান (রা) ইবন হারব-এর সাথে নিজের বিয়ের কাজটি সম্পাদনের জন্য নাজাশীকে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, রামলা (রা)-এর ডাকনাম, উম্মু হাবীবা।

এই উম্মু হাবীবার (রা) পিছনের জীবনের একটি দুঃখজনক ইতিহাস আছে। তিনি ছিলেন মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলিমদের চরম দুশমন আবু সুফইয়ানের (রা) কন্যা। তার মায়ের নাম সাফিয়া বিন্ত আবিল আস। মু'আবিয়া (রা) ছিলেন উম্মু হাবীবার (রা) বৈমাত্রীয় ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সতেরো বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।^{৩০}

আবু সুফইয়ানের (রা) এক কন্যা যায়নাব। তাঁর বিয়ে হয় তারিফের দাউদ ইবন 'উরওয়া আছ-ছাফাফীর সাথে। অপর দু'কন্যার বিয়ে হয় উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিন্ত জাহাশের (রা) দু'ভাইয়ের সাথে। ফারি'আকে আবু আহমাদ ইবন জাহাশ এবং উম্মু হাবীবাকে 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ বিয়ে করেন। উম্মু হাবীবা এবং ফারি'আর (রা) পিতৃ পরিবার মক্কা বিজয় পর্যন্ত চরম ইসলাম বিদ্রোহী থাকলেও তাদের স্বামীর পরিবার দুটি কিন্তু ইসলামের সূচনা পর্বেরই মুসলিম হয়ে যায়। তাঁরাও তাদের স্বামীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর স্বামী 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশসহ মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে 'উবায়দুল্লাহর উরসে কন্যা হাবীবার জন্ম হয়। তবে ইবন সাদ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় তার জন্ম হয়। আর এই কন্যার নামে তাঁর উপনাম হয় 'উম্মু হাবীবা'- বা হাবীবার মা। তাঁর আসল নাম 'রামলা' হারিয়ে যায় এবং এই উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।^{৩১}

হাবশায় স্বামী-সন্তান নিয়ে উম্মু হাবীবার দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু সুখ যে কোন চিরস্থায়ী বিষয় নয় তা উম্মু হাবীবা (রা) খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন। প্রবাসে আত্মীয়-পরিজন থেকে বহু দূরে তিনি এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। যে স্বামীর হাত ধরে তিনি মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে একদিন হাবশায় গিয়েছিলেন। তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিছুদিন হাবশায় অবস্থানের পর তাঁর স্বামী 'উবায়দুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তার ধর্মত্যাগের পূর্বে উম্মু হাবীবা (রা) রাতে স্বপ্নে তাকে বিভৎসরূপে দেখেন। তিনি ভীত-শংকিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে আপন মনে বলেন, নিশ্চয় তার কোন খারাপ পরিণতি হতে যাচ্ছে। পরদিন সকাল বেলা স্বামী 'উবায়দুল্লাহ তাকে বললো:^{৩২}

৩০. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৩০৫, আনসাব আল-আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

৩১. আনসাব আল-আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

৩২. 'আসরুত তারি'ঈন, পৃ. ৭০৮

يا أم حبيبة! إني نظرت في الدين، فلم أَرِدْنِي خيراً من النصرانية، وكنت قد دنت بها، ثم دخلت دين محمد، ثم هأنذا أعود فأرجع إلى النصرانية.

“উম্মু হাবীবা! আমি দীন-ধর্মের ব্যাপারে ভেবে দেখেছি, তবে খ্রিস্টধর্ম থেকে উত্তম কিছু দেখিনি। আমি সেই দীন ধারণ করেছিলাম। তারপর মুহাম্মাদের দীনে প্রবেশ করি। অতঃপর আমি এখন আবার খ্রিস্টধর্মের দিকে ফিরে যাচ্ছি।”

উম্মু হাবীবা (রা) স্বামীর এহেন পথভ্রষ্টতায় ভীষণ কষ্ট পেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। নিজের স্বপ্নের কথাও তাকে বললেন, কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হলো না। সে খ্রিস্টান থেকে গেল। সে উম্মু হাবীবাকে দু’টি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বললো: তালাক, অথবা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ। এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে উম্মু হাবীবার (রা) সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল: ১. স্বামীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা, আর সে ক্ষেত্রে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে শাস্তি। ২. মক্কায় পিতার কাছে ফিরে যাওয়া; কিন্তু বাড়িটি তো তখনও পৌত্তলিকতার দুর্গ। ৩. ছোট্ট শিশু হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় একাকী জীবন যাপন করা। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে শেষোক্ত পথটিই বেছে নেন।

উম্মু হাবীবা (রা) ও তাঁর স্বামীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ‘উবায়দুল্লাহ এখন বেপরোয়াভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করলো। একদিন অতিরিক্ত মদ পান অবস্থায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মতান্তরে মাতাল অবস্থায় সাগরে ডুবে মারা যায়।’^{৩৩}

উম্মু হাবীবা (রা) আরো বলেছেন, আমি সেই স্বপ্নে আরো দেখলাম যে, কেউ আমাকে ‘ইয়া উম্মাল মু‘মিনীন’- হে মু‘মিনদের মা, বলে ডাকছে। আমি ভয় পেলাম। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করবেন।^{৩৪}

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর উম্মু হাবীবা (রা) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। এ খবর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলো। উম্মু হাবীবার (রা) ‘ইদত পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে ‘আমর ইবন উমাইয়্যাকে (রা) রাজা নাজাশীর নামে একটি চিঠি এবং চার শো দীনার মাহরের অর্থ সহ হাবশায় পাঠান। চিঠিতে তিনি নাজাশীকে লেখেন- ‘আমার সাথে উম্মু হাবীবার বিয়ের কাজটি সমাধা করে দাও।’ চিঠি পাওয়ার পর নাজাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবার নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। তাঁকে একথাও জানান যে, “রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নাজাশীকে লিখেছেন। এখন এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য আপনার পক্ষের একজন উকিল মনোনীত করুন।” উম্মু হাবীবা (রা) এ সুসংবাদ দানের জন্য আবরাহাকে নিজের দু’টি

৩৩. আনসাব আল-আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

৩৪. ইবন সা‘দ, আত-তাবাকাত, খ. ৮, পৃ. ৯৭; আল-হাকিম, আল মুসতাদরিক, খ. ৪, পৃ. ২০, ২২; আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, খ. ৫, পৃ. ২৭৯

রূপোর চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি দান করেন। আর খালাতো ভাই খালিদ ইবন সাদ্দ ইবন আবিল 'আসকে উকিল নিয়োগ করে নাজাশীর নিকট পাঠান।^{৩৫}

সন্ধ্যার সময় নাজাশী হাবশায় বসবাসরত জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) ও অন্যান্য মুহাজিরগণকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাদের সবার উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।^{৩৬}

নাজাশী নিজেই বিয়ের খুঁতবা পাঠ করেন এবং চার শো দীনার মাহরের অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে খালিদ ইবন সাদ্দদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন নাজাশী সবাইকে উঠতে বারন করে বললেন, নবীদের সুনাহ বা রীতি হচ্ছে বিয়ের পর আহা করানো। তারপর তিনি সকলকে আহা করিয়ে বিদায় দেন।^{৩৭}

এ বিয়ের মাহরের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। মুসতাদরিকে একটি বর্ণনায় চার হাজার দীনারের কথা এসেছে। আবু দাউদের বর্ণনায় চার হাজার দিরহাম এসেছে। ইবন আবী খায়সামা ইমাম যুহরী (রহ) থেকে চল্লিশ উকিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে 'আল্লামা যুরকানী চার শো দীনারের বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনুল আছীরের বর্ণনায় ও চার শো দীনারের কথা এসেছে।^{৩৮}

একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর এই বিয়েতে যাকে উকিল নিয়োগ করেন তিনি হলেন 'উছমান ইবন 'আফ্ফান ইবন আবিল 'আস (রা)। কারণ, উম্মু হাবীবার (রা) মা সাক্ফিয়া বিনত আবিল 'আস ছিলেন 'উছমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) যুফু।^{৩৯}

মাহরের অর্থ উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পৌঁছলে তার থেকে পঞ্চাশ দীনার তিনি দাসী আবরাহাকে দিতে চান। কিন্তু আবরাহা তা গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, নাজাশী আমাকে এখান থেকে কিছু নিতে বারণ করেছেন। উম্মু হাবীবা (রা) পূর্বে যা কিছু তাঁকে দিয়েছিলেন, সবই ফিরিয়ে দেন। বিয়ের পর নাজাশী বহু মিশক, আঘার, সুগন্ধি এবং আরও অনেক জিনিস উপহার হিসেবে উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পাঠান। এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় হিজরী ৬ষ্ঠ, মতান্তরে ৭ম সনে। তখন উম্মু হাবীবার (রা) বয়স ত্রিশ বছরের উর্দ্ধে।^{৪০}

নাজাশী এবার উম্মু হাবীবা (রা) ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে মদীনায় পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করলেন। দুটি বড় আকারের বজরা নৌকা প্রস্তুত করলেন। তারপর উম্মু হাবীবা রামলা, তাঁর মেয়ে হাবীবা ও হাবশায় অবস্থানরত অবশিষ্ট সাহাবীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে দিলেন। তাঁদের

৩৫. উসুদুল গাবা, খ. ৬, পৃ. ৩২৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; আত-তাবাকাত, খ. ৮, পৃ. ৯৮, ৯৯

৩৬. সিয়াকু আ'লাম আন-নুবালা', খ. ২, পৃ. ২২১

৩৭. ইবন হিশাম, খ. ১ পৃ. ২২২; মুসনাদে আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ৪২১; উসুদুল গাবা, খ. ৬, পৃ. ৩২৪

৩৮. উসুদুল গাবা, খ. ৬, পৃ. ৩২৩; আল-ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ১২৪

৩৯. উসুদুল গাবা, খ. ৬, পৃ. ৩২৪

৪০. 'উমার রিদা কাহালা, আ'লাম আন-নিসা', খ. ১, পৃ. ৪৯৪

সাথে সেই নৌকায় উঠলেন হাবশার কিছু লোক। যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর পিছনে সালাত আদায় করার। মদীনাগামী এই দলটির আমীর নিয়োগ করা হয় জা'ফার ইবন আবী তালিবকে (রা)।

নাজাশী বিদায়কালে উম্মু হাবীবাকে (রা) বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য অনেক উপহার পাঠান। তার মধ্যে হাবশার উন্নতমানের তিনটি লাঠিও ছিল। তার একটি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ব্যবহার করতেন। অন্য দু'টি 'উমার ও 'আলীকে (রা) ব্যবহার করতে দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সেই লাঠিটি বিলাল (রা) রাসূল. আবাসে-প্রবাসে (সা) যখন মাঠে-ময়দানে সালাত আদায় করতেন, 'সুতরাই' হিসেবে সামনে গুঁড়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তিকালের পর বিলাল (রা) লাঠিটি হাতে নিয়ে আবু বাকরের (রা) আগে আগে চলতেন। আর একই সৌভাগ্যের প্রতীক লাঠিটি হাতে নিয়ে 'উমার ও 'উছমানের (রা) আগে আগে চলতেন সা'দ আল-কারাজী (রা)।

নাজাশী রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার হিসেবে একসেট মূল্যবান পোশাক ও পাঠান। তার মধ্যে একটি সোনার আংটিও ছিল। সেটি রাসূল (সা) তার দৌহিত্রী উমামা বিনত যায়নাবের (রা) হাতে দিয়ে বলেন: মেয়ে, এটি পর।

হিজরী ৯ম সনের রজব মাসে নাজাশী ইত্তিকাল করেন।^{৪১}

তাঁর ইত্তিকালের খবর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছালে তিনি তাঁর জানাযার সালাত আদায়ের জন্য সকলকে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। সকলে সমবেত হলে তিনি ঘোষণা করেন:

"إن أخاكم "أصحمة" النجاشي قد توفي فصلوا عليه."

"তোমাদের ভাই আসহামা আন-নাজাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা তার জানাযার নামায পড়।"

তারপর রাসূলুল্লাহর ইমামতিতে নাজাশীর গাযেবানা জানাযার সালাত আদায় করা হয়। একমাত্র নাজাশী ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) আর কারো গাযেবানা জানাযা আদায় করেননি।^{৪২}

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বাকী কবর স্থানে যান এবং সেখান থেকে হাবশা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে সকল আড়াল সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি নাজাশীর সবদেহের খাটিয়া দেখতে পান। অতঃপর চার তাকবীরের সাথে তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন।^{৪৩} তাঁর জন্য ইসতিগফার কামনা করেন।

৪১. 'আসরুত তারিখীন, পৃ. ৭২৫

৪২. সুওয়ারুন্ মিন হায়াত আত-তারিখীন, পৃ. ৪৪০-৪৪১

৪৩. 'আসরুত তারিখীন, পৃ. ৭২৫

সীরাতে ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) ও নাজাশীর উপহার-উপঢৌকন ও বেশ কয়েকটি পত্র বিনিময়ের তথ্য পাওয়া যায়। তবে সেই সব পত্র আদান-প্রদানের সুনির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ‘আল্লামা ইবন কাছীরের (রহ) মতে রাসূলুল্লাহ (সা) ‘আমর ইবন উমাইয়া আদ-দুমারীর (রা) হাতে নাজাশীকে যে পত্রটি পাঠান এবং উত্তরে নাজাশী যে পত্রটি লেখেন তা নিম্নরূপ: ^{৪৪}

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة. سلام عليك.
فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيم، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها
إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقته من روحه ونفخته كما خلق
آدم بيده ونفخه، وإنني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالة على طاعته وأن تبغني
فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من
المسلمين، فإذا جاؤوك فاقرهم ودع النجير فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد
بلغت ونصحت، فاقبلولا نصيحتي، والسلام على من البع الهدى.

“দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নামে”

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে হাবশার রাজা আল-আসহাম আন-নাজাশীর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার নিকট প্রশংসা করছি আল্লাহর, যিনি অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা বিধায়ক ও রক্ষক। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘ঈসা আল্লাহর রূহ এবং তার বাণী যা তিনি কুমারী, সুরক্ষিত ও পুতঃপবিত্র মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেন। তিনি ঈসাকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আদমকে যেমন নিজের হাতে তৈরী করেন তেমনি ঈসাকে স্বীয় রূহ ও ফুঁক দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আমি আপনাকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যার কোন শরীক নেই। আর আহ্বান জানাই তাঁর আনুগত্যের প্রতি। আর আপনি আমার অনুসরণ করবেন, আমার প্রতি ও আমার নিকট যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান আনবেন। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আমার চাচাতো ভাই জা‘ফার ইবন আবী তালিবকে এবং আরো কিছু মুসলিমকে আপনার নিকট পাঠিয়েছি। তাদেরকে সেখানে থাকার সুযোগ করে দিন। তাদের উপর কোন রকম জোর-জবরদস্তী করবেন না। আমি মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট আপনার ও আপনার সৈনিকদের জন্য দু‘আ করি। আমি আপনার নিকট আমার বক্তব্য পৌছিয়েছি এবং আপনাকে

উপদেশ দিয়েছি। অতএব, আমার উপদেশ আপনি গ্রহণ করুন। যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম।”

উল্লেখিত পত্রের জবাবে নাজাশী রাসূলুল্লাহকে (সা) নিম্নের পত্রটি লেখেন:^{৪৫}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام. فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقربنا ابن عمك وأصحابه، فاشهد أنك رسول الله صادقاً ومصداقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آيتك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حق.

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি আল-আসহাম ইবন আবজার-আন নাজাশীর পত্র। হে আল্লাহর নবী, আপনার প্রতি আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। হে আল্লাহর রাসূল! ‘ঈসার বিষয়টি উল্লেখ করে যে পত্রটি আপনি পাঠিয়েছেন তা আমার নিকট পৌছেছে। আকাশ ও যমীনের প্রভু ও পালনকর্তার শপথ, আপনি যা উল্লেখ করেছেন, ‘ঈসা তার চেয়ে একটু ও বেশি কিছু নন। আপনি যার মাধ্যমে আমাদের নিকট এ পত্র পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমরা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে আমরা নৈকট্য দান করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার বাই‘আত গ্রহণ করলাম এবং সেই সাথে আপনার চাচাতো ভাইয়ের ও বাই‘আত করলাম। আমার নিজের ছাড়া অন্য কারো উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। হে আল্লাহর রাসূল। আপনি চাইলে, আমি আপনার নিকট উপস্থিত হবো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যা বলেন তা সবই সত্য।”

রাসূলুল্লাহকে (সা) লেখা নাজাশীর আরো দু’টি পত্র এখানে উল্লেখ করা হলো:^{৪৬}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته! أما بعد:

فإني زوجتك امرأة من قومك، وعلى دينك، هي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأهديتك هدية جامعة: قميصًا، وسراويل، وعطافا وخفين ساذجين، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

توقيع النجاشي

দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি আসহামা ইবন আল-আবজার এর পক্ষ থেকে।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর এই যে, আমি আপনার স্বজাতির ও স্বধর্মের মহিলাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছি। তিনি হলেন সাইয়েদা উম্মু হাবীবা বিন্ত ‘আবী সুফইয়ান। আমি আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কিছু উপহার পাঠিয়েছি। যেমন: জামা, পায়জামা, ওভারকোট ও অতি সাধারণ এক জোড়া মোজা।

ওয়াস সালামু ‘আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়বারাকাতুহ।

নাজাশীর স্বাক্ষর

উপরোক্ত পত্রটির সাথে নাজাশী নিম্নের পত্রটিও সংযুক্ত করেন:^{৪৭}

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى محمد صلى الله عليه وسلم من النجاشي الأصحة بن الأبيجر، سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله الذي هداني للإسلام. أما بعد :

فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي، وها أنا أرسلت إليك ابني أريحاى ستين رجلا من أهل الحبشة، وإن شئت إن آيتك بنفسى فعلت يا رسول الله! فأني أشهد أن ما تقوله حق. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته!

দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি আসহামা ইবন আল-আবজার আন নাজাশীর পক্ষ থেকে।

৪৭. আত-তাবারী, তারীখ, খ. ২, পৃ. ৬৫৩; আল-বিলায়া ওয়াল নিহায়া, খ. ৩, পৃ. ৮৪; যাদুল মা‘আদ, খ. ৩, পৃ.

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যিনি আমাকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন।

অতঃপর এই যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা মক্কা থেকে হিজরাত করে আমার দেশে এসে আমার নিকট অবস্থান করছিল, আমি তাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম। আর আমি আমার ছেলে আরীহাকে ষাটজন হাবশী লোকের সাথে আপনার নিকট পাঠালাম। আপনি যদি চান আমি নিজেই আসি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি চলে আসবো। কারণ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি যা কিছু বলেন সবই সত্য।

ওয়াস সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ পত্রটির বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায়, জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে উম্মু হাবীবাকে (রা) পাঠানোর সময় নাজাশী তাঁর ছেলে ও ষাটজন হাবশী লোককেও মদীনায় পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরে এসে হাবশা থেকে প্রত্যাভর্জনকারী এই দলটিকে দেখে দারুন খুশী হন। এই দলটি মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মদীনায় পৌছেন।

তাবারানী ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে নাজাশীর চল্লিশজন সঙ্গী-সাথী মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে উহুদ যুদ্ধেও যোগদান করেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আহত হন, তবে কেউ শাহাদাত বরণ করেননি, তারা যখন দেখলো, মুসলিমগণ দারুন অর্থ ও খাদ্য সংকটে আছে, তখন তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বেশ অর্থ-বিস্তের মালিক। আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের দেশ থেকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে পারি। রাসূল (সা) অনুমতি দিলেন। তারা দেশে ফিরে যান এবং প্রচুর অর্থ-বিস্ত নিয়ে এসে দুঃস্থ-অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন।^{৪৮}

হাবশার এই দলটি মদীনায় পৌছালে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁদের সেবা করতে আরম্ভ করেন। সাহাবীরা বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিরত থাকুন। আমরা তাদের দেখাশুনা ও সেবা করছি। তিনি বললেন: তা হয় না। কারণ, তারা আমার সঙ্গী-সাথীদের সম্মান করেছে, সেবা করেছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই।^{৪৯}

আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে নাজাশী রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ের মানুষ, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে তার মৃত্যু হয় এবং তিনি প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যাকে রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র লেখেন। রাজা-বাদশাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪৮. ইমাম আল-বাগবী, মা'আলিম আত-তানযীল, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯

৪৯. 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ৭০০; আস-সুফুতী, আযহার আল'উরুস, পৃ. ৫৯

নাজাশী (রহ) একজন তাবি'ঈ ছিলেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখা, সাক্ষাৎ বা সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কূটনীতিক ও সমর বিশারদ প্রখ্যাত সাহাবী 'আমর ইবন আল-'আস (রা) তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে।^{৫০}

'আমর ইবন আল-'আস (রা) যখন নাজাশীর নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হাবশায় যান তখন একদিন নাজাশী একান্তে তার সংগে কথা বলেন। তিনি বলেন: 'আমর! আমাকে একটু সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন তো যার নিকট বিশেষ দূত আসে, যেমন 'ঈসা ইবন মারইয়ামের নিকট আসতো। 'আমর বললেন: মহামান্য রাজা! ব্যাপারটি কি সত্য? নাজাশী বললেন: হ্যাঁ, সত্য। 'আমর বললেন: আমি আপনার হাতে ইসলামের বাই'য়াত করলাম। এভাবে 'আমর (রা) নাজাশীর নিকট ইসলামের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ ও 'উছমান তালহাকে (রা)- তা জানান। তারপর তাঁরা একসাথে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট ইসলামের ঘোষণা দেন।^{৫১}

৫০. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, পৃ. ৬৭; 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ৬৯৯

৫১. আল-ফাসী, শিফা' আল-গারাম বিআখবারিল বালাদ আল-হারাম, পৃ. ১৫৭; 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ৬৯৯

সিলা ইবন আশইয়াম আল-'আদাবী (রহ)

সিলা ইবন আশইয়াম আল-'আদাবী (রহ) বসরার একজন মহান তাবি'ঈ। শেষ রাতে তিনি কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এসে গেলে একত্রিংশে কুরআন নিয়ে বসে যেতেন এবং তারতীলের সাথে তিলাওয়াত শুরু করতেন। কুরআনের কোন সৌন্দর্য অনুভব করলে তা তাঁর মন মাসনে এমন প্রভাব ফেলতো যে, পরম করুণাময় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন। কুরআন পাঠের মধ্যে যেমন তাঁর সকাল হতো, তেমনি সন্ধ্যাও হতো কুরআন পাঠের মধ্যে।

তিনি ছিলেন মুসলিমদের জন্য একজন মহা মুরব্বী, সম্মানীয় 'আলিম, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত যাহিদ ও অনুসরণীয় মু'আল্লিম। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এত ক্লাস্ত হয়ে পড়তেন যে, হামাগুঁড়িয়ে বিছানায় যেতেন।

বসরার এই মহান তাবি'ঈর জীবনের কিছু খণ্ডচিত্র আমরা এখানে উপস্থাপন করবো। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর জা'ফর ইবন ইয়াযীদ (রহ) বলেন' কাবুল অভিযানে একটি বাহিনী বের হলো। আমরাও আল্লাহর সম্ভ্রুতি লাভে উদ্দেশ্যে এই বাহিনীতে যোগ দিলাম। সিলআ ইবন আশইয়ামও আমাদের সংগে ছিলেন। এই অীভযানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কাবুলের অধিবাসীদের ইসলামের দা'ওয়াত পৌছানো এবং কাবুলকে ইসলামী খিলাফাতের সাথে সংযুক্ত করা।

আমরা চলতে শুরু করলাম। দিন শেষে রাত নে মে এলো। ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত বাহিনী রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে যাত্রাবিরত করলো। বাহিনীর সদস্যরা যার যার মত বিশ্রাম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। অনেকে 'ইবাদাত বেদেগীর জন্য শিবির থেকে দূরে নিরিবিলিতে চলে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি সিলা ইবন আশইয়ামকে নজরদারিতে রাখবো। কিভাবে তাঁর রাত কাটে তা দেখবো। দেখলাম, তিনি সালাম আদায় করে বিছানায় ঘুরিয়ে গেলেন। আমি কিছুটা ধোঁকা খেলাম। কারণ মানুষের মধ্যে একথা প্রচলিত ছিল যে, রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'পা ফুলে যায়।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম, তিনি মানুষের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ ওঠে পড়েন এবং খুব দ্রুত গতিতে সৈন্য-শিবির ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। জঙ্গলের এত গভীরে ঢুকে গেলেন যে, সেখানে হিংস্র জন্তুজানোয়ার বিচরণ করে, মানুষের যাতায়াত খুব একটা হয় না।

আমি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে একেবারে নিরিবিল একটি স্থানে তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত খুশ'-খুদু' (বিনয়-ভীতির) সাথে সালাত আদয় করতে থাকেন। কোন দিকেই তাঁর কোন মনোযোগ নেই। এক সময় দেখলাম, একটি হিংস্র ভাগ তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, দৌড়ে একটি গাছে উঠে বসলাম। সেখান থেকে দেখলাম, বাঘটি সিল্লা ইবন আশইয়ামের একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে। মাত্র কয়েক পা দূরে আছে। কিন্তু সিল্লা ইবন আশইয়ামের সে দিকে মোটেই ক্রক্ষেপ নেই। একগ্রচিন্তে সালাতে নিমগ্ন। তিনি যখন সাজদায় গেলেন, আমি মনে মনে বললাম এই বুঝি বাঘ তাকে কামড়ে-খামছে ছিড়ে খেয়ে ফেলবে। তিনি সাজদা থেকে উঠামাত্র বাঘটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো যেন তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি স্বাভাবিকভাবে সালাম ফিরিয়ে বাঘটির দিকে তাকিয়ে বলেন : 'তুমি খাবারের খোঁজে অন্য কোথাও যাও।' কথাটি বলার সাথে সাথে বাঘটি চলে গেল। আমি গাছের ডালে বসে এ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলাম। আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যখন প্রভাত হলো, তিনি সালাতুল ফাজর আদায় করলেন। তারপর এমনভাবে আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের হামদ ও ছানা পাঠ করতে লাগলেন যা আমি পূর্বে আর ককনো শুনিনি। যেমনে তিনি বলছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُجَبِّرَنیْ مِنَ النَّارِ، اَوْ مِثْلِیْ یَجْتَرِیْ اَنْ یَسْتَئَلَكَ الْجَنَّةَ؟

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দিন। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি। আমার মত মানুষ কি আপনার নিকট জান্নাত চাওয়ার সাহস করতে পারে?’

তিনি ছিলেন দৃঢ় ও স্থির চিন্তের মানুষ। একদিন তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে বসে আহার করছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার ভাই মারা গেছে। তিনি ইল্লালিহ্বাহ পাঠ করে বললেন, আমার কাছে এসে বস, আমার সাথে আহার কর। এই একটু আগে এক ব্যক্তি এসে আমার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর দিয়ে গেল। তাঁর কথা শুনে লোকটি কিছুক্ষণ চূপ করে থাকলো। তার মনের এমন দৃঢ়তা ও জোর দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তখন সিল্লা ইবন আশইয়াম (রা) তাকে এ আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন :

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّیِّتُوْنَ. (الزمر- ৩০)

“তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।”^২

বিষয়

সিল্লা ইবন আশইয়ামের (রহ) বিষয়ের কাহিনীটি বড় চমৎকার। আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন তাঁকে একজন নেক স্ত্রীও দান করেন। তাঁদের বাসর রাতের অতি চমৎকার ঘটনার কথা

২. ইবন সা‘দ, আত-তাবাকাত, খ-৭, পৃ.১৩৭; আসরুত তারিখীন, পৃ-৩৭৩-৩৭৪

দীর্ঘকাল মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, যা ঈমানের মাধুর্য ও সত্যতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণক।

মু'আযা আল-আদিবয়্যাহ নাম্নী তাঁর এক চাচাতো বোন ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন 'আযিশার (রা) ছাত্রী। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনাও করেছেন। সিহাহ সিন্তার গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংকলিত হয়েছে।^৩ সুতরাং সিল্লা ইবন আশইয়ামের (রহ) মত তিনিও ছিলেন একজন উঁচু স্তরের মহিলা তাবি'ঈ। তাছাড়া তিনি বসরার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 'আলিম, তাবি'ঈকুল শিরোমনি শায়খ হাসান আল বসরীর (র) সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ শোনেন।

মু'আযা, (রা) ছিলেন তাকওয়া ও দীনদারির জন্য খ্যাত। তাঁর ইবাদাতবন্দেগী ও পার্থিব ভোগবিলাস বিমুখ জীবনের কথা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। লোক মুখে একথা প্রচলিত ছিল যে, রাত হলে তিনি বলতেন : এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ রাত। তারপর সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। আর সকাল হলে বলতেন, এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ দিন। তাপরের সন্ধ্যা পর্যন্ত আর বিছানায় পাশ দিতেন না।

তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে ও কুরআন তিলাওয়াত করে রাত কাটিয়ে দিতেন। যখন তন্দ্রা ও ঘুম পেত তখন ঘরে পায়চারী করতেন, আর বলতেন, হে আমার নাফস! তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ ঘুম। আগামীকাল কবরে তোমার ঘুম হবে অনেক দীর্ঘ। সে ঘুম হবে হয় কষ্টের, নয়তো আনন্দের। হে মু'আযা! তুমি আজই তোমার জন্য যে ঘুম পছন্দ কর, বেছে নাও।

মু'আযার (রহ) সাথে সিল্লা বিন আশইয়ামের (রহ) বিয়ে হলো। বাসর ঘরে তাদের মিলনের পূর্বে সিল্লা'র এক ভাতিজা তাঁকে হাম্পামে ঢুকিয়ে গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। তারপর তাঁদের দু'জনকে সুন্দরভাবে সজ্জিত একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। তাঁরা দু'জন এখন বাসর ঘরে। সিল্লা নিয় অনুযায়ী দু'রাকয়াত সুন্নাত সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। মু'আযাও আর বসে থাকবেন কেন। তিনিও সালাতে দাঁড়ালেন। সকাল পর্যন্ত চললো তাদের সালাত আদায়ের পালা। তাঁরা ভুলেই গেলেন এটা তাঁদের বাসর রাত।

সকালে ভাতিজা এলো চাচা-চাচীর খোঁজ নিতে। সালাম বিনিময়ের পর সিল্লা বললেন : ভাতিজা গতকাল তুমি আমাকে একটি গরম পানির ঘরে ঢুকিয়ে দিলে, তাতে আমার জাহান্নামের আগুনের কথা মনে পড়ে গেল, তারপর ঢুকিয়ে দিলে এক সুসজ্জিত মনোরম ঘরে এবং তা আমাকে জান্নাতের কথা মনে করিয়ে দিল। এই জান্নাত ও জাহান্নামের কথা চিন্তা করতে করতেই আমার রাত কেটে গেল।

এই মু'মিন দম্পতির বাসর রাত কাটে এভাবে। তাঁদের জীবনের প্রথম রাতটি কাটে নফল সালাত আ'দায়ের মাধ্যমে। একথা জানানাজি হলে এই পরিবারের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্মান ও শ্রদ্ধা দারুণভাবে বেড়ে যায়।

মানুষ সিলা ইবনু আশইয়ামের নিকট আসতো, তাঁর মজলিসে বসতো। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন। মানুষ মনোযোগ সহকারে তাঁর উপদেশ শুনতো। একবার বসরার এক যুবক তাঁর কাছে এসে বললো : চাচা! আল্লাহ আপনাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু দান করুন।

তিনি একটু হেসে উৎফুল্লভাবে তাকে বললেন : ভাতিজা! তুমি আমাকে আমার একটি অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছো, যা আমি কখনো ভুলবোনা। তখন আমি তোমারই মত একজন যুবক। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল সাহাবী জীবিত ছিলেন, একদিন আমি তাদের কয়েকজনের একটি বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বললাম : আল্লাহ আপনাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার কিছু আপনারা আমাকে শিখিয়ে দিন। তাঁরা বললেন : কুরআনকে তুমি তোমার নাফসের লাগাম এবং অন্তরের বসন্তকাল বানাবে। নিজে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ কবে এবং তা দ্বারা মুসলিমদেরকে উপদেশ দিবে। আর তোমার সাধ্যমত আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি বেশি দু'আ করবে।

যুবক বললো : চাচা! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। আর আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আপনাকে প্রতিদান দিন।

সিলা ইবন আশইয়াম (রহ) বললেন : যা চিরস্থায়ী তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা তোমার আশ্রয় আর যা ধ্বংসশীল তার প্রতি তোমার অনাশ্রয় সৃষ্টি করুন। আল্লাহ তোমাকে ইয়াকীন তথা দৃঢ় প্রত্যয় দান করুন যা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করে।

যুবককে বিদায় করে সিলা ইবন আশইয়াম (রহ) বসরা নগরীর বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য নিরিবিলিতে ও নির্জনে আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীনের ইবাদাত ও তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। হঠাৎ বসরার কিছু যুবককে দল বেঁধে যেতে দেখলেন। তাদের চোখে মুখে আনন্দ-উল্লাসের ছবি, রক্তে যৌবনের উন্মাদনা। কখনো উঁচু টিলায় উঠছে কখনো সমতলে দৌড়াপ করছে, আবার কখনো হাসি-তামাশা করছে।

বসরার এই যুবকগণ যখন তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল, তিনি নরম সুরে তাদেরকে ডাকলেন, তারা সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : এমন একটি দল সম্পর্কে তোমাদের মত কী যারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ তারা দিনের বেলায় রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়, খেলা-ধুলা করে সময় কাটায় এবং বিছানায় ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়? তোমরা কি মনে কর তারা সময় মত বের হতে পারবে এবং লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে?

কথাগুলো বলে তিনি নিজের গন্তব্যের দিকে চলতে শুরু করলেন। তারা কী জবাব দেয় তা শোনার জন্যও অপেক্ষা করলেন না। যুবকরা চলে গেল। তবে যখনই যুবকদের দেখা পেতে তিনি তাদের ঐ একই কথা বলতে থাকে।

ঐ যুবক দলের একজন সদস্য তার বন্ধুদের বললো : শায়খ নিশ্চয় আমাদের লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলে থাকেন। কারণ, আমরা দিনের বেলায় খেলা-ধুলা ও গল্প-আড্ডার মধ্যে থাকি, আর লম্বা ঘুমে রাত কাটিয়ে দিই। অতঃপর তারা সকালে সিলা ইবন আশইয়ামের (রহ) নিকট যায়, তার সাথে ওঠাবসা করতে থাকে। তারা সকলে তাঁর অনুসারীতে পরিণত হয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।^৪

তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ধৈর্য-সহনশীলতা ও প্রেম-প্রীতি শিক্ষা দিতেন। তাঁরা যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হতো, কোলাকুলি করতো। তারা এ শিক্ষা লাভ করে সিলা ইবন উশাইমের (রাহ) নিকট থেকে। এ ছিল তাঁর সাহচর্যের রীতি ও বৈশিষ্ট্য। এতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়।^৫

আমরা যাকে আলৌকিক ঘটনা বলি, সিলা ইবন উশাইমের (রহ) জীবনে তেমন কিছু ঘটনার কথা জানা যায়। যেমন তিনি নিজে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

একবার আমি একটি গ্রাম থেকে একটি বাহনের পিঠে সাওয়ার হয়ে বের হলাম। সময়টি ছিল বর্ষা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের মওসুম। আমি একটি পানির বাঁধের উপর দিয়ে চলছিলাম। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল, সংগে খাবার কিছু ছিল না। দেখলাম একটি লোক কাঁধে করে কিছু জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। আমি লোকটিকে তামিয়ে তাঁর কাঁধের বোঝা নামাতে বললাম। দেখলাম তাতে রুটি। আমি লোকটিকে বললাম, আমাকে কিছু রুটি খেতে দাও। সে বললো : ইচ্ছা করলে তুমি খেতে পার, তবে এতে শুকরের চর্বি মেশানো আছে। আমি লোকটিকে ছেড়ে দিলাম।

একটু পরেই আরেকটি লোকের দেখা পেলাম। তাকে বললাম : আমার সংগে আমার কয়েকদিনের পাথেয় আছে। যদি এর থেকে আপনি কিছু খান তাহলে আমাকে সেই পরিমাণ অভূক্ত থাকতে হবে। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি চলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার পিছনে কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি, সাদা একটা জিনিস দ্বারা কিছু জিনিস জড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। আমি ফিরে গিয়ে তা উঠিয়ে নিলাম। খুলে দেখি, তার মধ্যে পাকা খেঁজুর। তখন কিন্তু খেঁজুরের মওসুম না। আমি তার থেকে কিছু খেলাম এবং অবশিষ্টগুলো আবার জড়িয়ে রেখে দিলাম। আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে এলাম। সংগে নিয়ে এলাম সে খেঁজুর আমি খেয়েছিলাম তার আটিগুলো। তখন কিন্তু খেঁজুরের মওসুম ছিল না।^৬

৪. 'আসরুত তাবি'ঈন, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৭৮, সিয়াকু আ'লাম আন-নুবালা, খ-৩, পৃ. ৪৯৮

মানুষকে কিভাবে উদেশ্য দিতে হয় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। একদিন তিনি তাঁর বাছাই করা সংগী-সাথীদের নিয়ে দীর্ঘ বিষয়ে আলোচনা করছেন। এমন সময় দেখলেন, পাশ দিয়ে এক সুদর্শন যুবক গর্ব ভরে হেঁটে যাচ্ছে। তার পরনের কাপড় পায়ের গোড়ালীর নিচ পর্যন্ত মাটিতে টেনে চলছে। সীলা ইবন আশ'ইয়ামের (রহ) সংগীরা যুবকটির উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা তাকে কিছু কটুকথা শুনিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু সীলা বললেন : তোমরা বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দাও। তারপর তিনি অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে যুবককে ডেকে বললেন : ভাজিঙ্গা! তোমার সাথে আমার কিছু কাজ আছে। যুবকটি দাঁড়িয়ে বললো : চাচা, কী কাজ? সীলা (রহ) বললেন : আগে তোমার কাপড় পায়ের গিরার উপরে উঠাও। এতে তুমিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, তোমার কাপড়ও থাকবে মাটির ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত। আর একাজ হবে তোমার রব ও নবীর পছন্দ মত।

যুবকটি লজ্জিত হলো। সে বললো : চাচা, আমি আপনার উপদেশ মেনে চলবো। তারপর সে কাপড় উঠু করে অত্যন্ত নম্রভাবে স্থান ত্যাগ করে।

সীলা (রহ) তাঁর সংগীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা যা করতে চাচ্ছিলে তার চেয়ে আমার এ পছাটি কি ভালো নয়? তোমরা যদি তাকে মারতে তাহলে সেও হয়তো তোমাদেরকে মারতো এবং তার কাপড় আরো বেশি বেশি ঝুলিয়ে দিয়ে চলতো। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ধৈর্য দেখে তাঁর সংগীরা দারুণ মুগ্ধ হলো।

তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু জা'ফর ইবন ইয়াযিদ একটি যুদ্ধে তাঁর সংগে ছিলেন। শত্রুবাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে দুই বন্ধুর তীব্র আক্রমণে শত্রুবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তারা এ দু'জনের যুদ্ধ কৌশল দেখে ভীত-শংকিত হয়ে পড়ে। তাদের সেনাপতি মন্তব্য করে : মাত্র দুই জনের কাজ যদি এমন মারাত্মক হয়, তাহলে তাদের গোটা বাহিনীর আক্রমণ কেমন হবে? অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে।^৭

শাহাদাত

হিজরী ৭৬ সনে মুসলিম বাহিনী আধুনিক তুরস্কের রুশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি অভিযান চালায়। সীলা ইবন আশ'ইয়াম (রহ) এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর এক ছেলেও পিতার সংগে ছিলেন। দু'বাহিনী মুখোমুখি হলো। এক সময় প্রচণ্ড যুদ্ধও শুরু হয়ে গেল। তখন পিতা পুত্রকে বললেন : “ছেলে, সামনে এগিয়ে যাও এবং আল্লাহর দূশমনদের বিরুদ্ধে এমনভাবে যুদ্ধ কর, যাতে আমি আল্লাহকে বলতে পারি, আমার নিকট গচ্ছিত তাঁর সম্পদ আমি বিনষ্ট করিনি।” ছেলে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শত্রুবাহিনীর

হাতে শহীদ হলেন। ছেলেকে অনুসরণ করে সিল্লা ইবন আশ'ইয়াম (রহ) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।^৮

স্বামী ও ছেলের শাহাদাতের খবর বসরায় অবস্থানরত মু'আযা আল-আদাবিয়ার নিকট পৌঁছলো। তাঁকে সমবেদনা জানানোর জন্য বসরার মহিলারা তাঁর বাড়িতে ভীর করলো। মু'আযা (রহ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন : আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য যদি আপনারা এসে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তাহলে আপনারা যেতে পারেন।^৯

ইবন হাজার 'আসকিলানী (রহ) তাঁকে একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন শাহীন ও সা'ঈদ ইবন ইয়া'কুব তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে ইমাম আল-বুখারী, ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু হিব্বান তাঁকে তাবি'ঈদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।^{১০}

সিল্লা ইবন আশ'ইয়ামের (রহ) মৃত্যুর স্থান ও সন সম্পর্কে বেশ মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, ইরাকে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের শাসনকালের প্রথম দিকে হিজরী ৭৫ সনে তিনি শহীদ হন। আবার কেউ কেউ ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের কথা বলেছেন। তবে আবু মূসা বলেছেন, হিজরী ৩৫ সনে জিজিস্তানে তিনি শহীদ হন এবং তখন তাঁর বয়স ১৩০ বছর। ইবন হাজার (রহ) বলে, আবু মূসার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি জাহিলী যুগ লাভ করেছিলেন। আবু নু'আইম তাঁর “আল-হিলিয়াতুল আওলিয়া” গ্রন্থে ইবনুল মুবারাকের সূত্রে এবং তিনি ‘আবদূর রহমান ইবন ইয়াযিদ ইবন জাবির থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমার কাছে ননবীর (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বাণীটি পৌঁছেছে :

يكون في أمي رجل يقال له صيلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا.

“আমার উম্মাতের মধ্যে একজন লোক হবে যাকে বলা হবে সিল্লা, যার সুপারিশে অমুম অমুক জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{১১}

৮. প্রাগুক্ত

৯. সিয়রু আ'লাম আন-নুবালা, খ-৩, পৃ. ৪৯৮

১০. ইবন হাজার আল আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, খ-২, পৃ. ২০০

১১. প্রাগুক্ত

আবু হানীফা আন-নু'মান ইবন ছাবিত (রহ)

ইতিহাসে যিনি ইমাম আজম নামে পরিচিত তাঁরই ডাকনাম আবু হানীফা এবং আসল নাম আন-নু'মান। পিতার নাম ছাবিত। তাঁর পূর্ব পুরুষ আরবের বানু তায়মুল্লাহ ইবন ছা'লাবার আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্য তাঁকে “আত-তায়মী” এবং কৃষার অধিবাসী হওয়ার কারণে “আল-কৃষী” বলা হয়। তবে আবু হানীফার পূর্ব পুরুষের আদি-বাসস্থান সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মতপার্থক্য আছে। যেমন আবু হানীফার পৌত্র ‘উমার ইবন হাম্মাদের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-বাক্কাঈ বলেন:*

أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى، فأما زوطى فإنه من أهل كابل، ولد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكا لبنى تيم الله بن ثعلبة، فأعتق، فولأه لبنى تيم الله بن ثعلبة.

আবু হানীফা আন-নু'মানের পিতা ছাবিত এবং দাদা যূতা। যূতা হলেন কাবুলের একজন অধিবাসী। ছাবিতের জন্ম হয় ইসলামের উপরে। আর যূতা ছিলেন বানু তায়মুল্লাহ ইবন ছা'লাবার দাস। অতঃপর তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং বানু ছা'লাবার সাথে তাঁর ‘ওয়ালা’ বা ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে।

সুলায়মান ইবন আর-রাবী বলেন, আবু হানীফার মূল হচ্ছে ‘তিরমিয়’-এর। এমনভাবে অনেকে তাঁর পিতা ছাবিতকে ‘আনবার’-এর, অনেকে ‘নাসা’-এর অধিবাসী বলেছেন। ইসমাঈল ইবন ‘আবদিদ্বাহ ইবন মায়মুন বলেন, আবু হানীফা ছিলেন ব্যাবিলনের অধিবাসী।^১ একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ বলতেন, আমার পূর্ব পুরুষ আল-মারযুবান ছিলেন পারস্যের সন্তান। তিনি দাস নন, স্বাধীন ছিলেন। তিনি আরো বলেন:*

والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدى فى سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى على بن أبى طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفى ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلى بن أبى طالب فينا.

আল্লাহর কসম! দাসত্ব কখনো আমাদের ঘাড়ে পতিত হয়নি। আমার দাদা হি. ৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাবিত খুব ছোট অবস্থায় ‘আলী ইবন আবী

১. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা’ আর-রিজাল, খ: ১৯, পৃ. ১০৪

২. প্রাণ্ড, খ. ১৯, পৃ. ১০৫

৩. প্রাণ্ড

তালিবের (রা) নিকট যান। তিনি ছাবিত ও তাঁর বংশধরদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দু'আ করেন। আমরা আল্লাহর নিকট আশা করি, আমাদের ব্যাপারে 'আলী ইবন আবী তালিবের এই দু'আ তিনি কবুল করেছেন।

তিনি আরো বলেন, ছাবিতের পিতা আন-নু'মান ইবন আল-মারযুবান নওরোজ উপলক্ষ্যে 'আলী ইবন আবী তালিবকে 'ফালুদা' (খাদ্য) উপহার দেন। 'আলী (রা) তাঁকে বলেন, প্রতিদিনই আমাদের নওরোজ।^৪ এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তাঁর বংশের উর্দ্ধতন পুরুষের সাথে 'আলীর (রা) পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। কিছু চরিতকারের মতে তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজাদের বংশধর ছিলেন।

জন্ম সন

ইমাম আবু হানীফার (রহ) জন্ম সন সম্পর্কে কয়েকটি মত দেখা যায়। যেমন: হিজরী ৬০, ৬১, ৭০ ও ৮০ সন। তবে অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্র (চরিতশাস্ত্র) বিশেষজ্ঞের মতে তিনি হিজরী ৮০, খ্রি. ৬৯৯ সনে উমাইয়া খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক কালের গবেষকদের অনেকে হি. ৭০ সনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।^৫ আবু হানীফা (রহ) একজন তাবি'ঈ ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে তাবি'ঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম আয-যাহ্বী (রহ) বলেন:^৬

رأى أنس بن مالك رض غير مرة لما قدم عليهم الكوفة رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله.

তিনি একাধিকবার আনাস ইবন মালিকের (রা) (মৃ. ৯৩ হি.) দর্শন লাভ করেছেন, যখন তিনি কূফায় তাঁদের ওখানে আসতেন। একথা ইবন সা'দ সাইফ ইবন জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সাইফ বলেন, তিনি আবু হানীফাকে একথা বলতে শুনেছেন।

তাছাড়া তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (মৃ. ৮৭ হি.), সাহল ইবন সা'দ (মৃ. ৯১ হি.) ও আবুত-তুফায়ল 'আমির ইবন ওয়াছিলা (মৃ. ১০২ হি.) প্রমুখ সাহাবীগণের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শায়খুল ইসলাম আবুল ফাদল আহমাদ (রহ) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ) একদল সাহাবীকে দেখেন, কারণ, তিনি কূফায় ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।^৭

^৪ ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা) খ. ২, পৃ. ১৭২

^৫ প্রাগুক্ত

^৬ তায়কিরাতুল হুফাজ, খ. ১, পৃ. ১৬৮

^৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ১৭৩

তাবি'ঈ কারা, সে সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের মতপার্থক্য আছে। অনেকে বলেছেন, যিনি কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তিনি তাবি'ঈ-তা স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর সুহবত বা সাহচর্য লাভে ধন্য হোন বা না হোন। এ মতে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সাহাবীর ক্ষণিকের সাক্ষাৎ বা দর্শন লাভ করলেই কোন ব্যক্তি তাবি'ঈর দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হবেন। এমত অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (রহ) অবশ্যই তাবি'ঈ ছিলেন। আবার অনেকে বলেন, শুধু সাক্ষাৎ বা দর্শনই যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্য এবং তাঁর থেকে জ্ঞানগত উপকারও লাভ করতে হবে। এ সংজ্ঞামতে তিনি তাবি'ঈ নাও হতে পারেন। তবে কোন সাহাবীর সূত্রে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ ও সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

আবু হানীফা (রহ) যে সকল সাহাবীর দর্শন লাভ করেন, যাঁদের নিকট হাদীছ শোনেন তাঁরা হলেন:

১. আনাস ইবন মালিক (রা): তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে জীবনীকারদের মতপার্থক্য আছে। যেমন- হি. ৯১, ৯২ ও ৯৩ সনের কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। অধিকাংশ জীবনীকারের মতে আবু হানীফার (রহ) জন্ম হয় হি. ৮০ সনে, তবে ইবন 'আলীয়ায়র মতে তাঁর জন্ম হয় ৬১ হিজরীতে। হি. ৮০ অথবা ৬১ যে সনেই আবু হানীফার (রহ) জন্ম হোক না কেন সাহাবী আনাসের (রা) দর্শন ও তাঁর মুখ থেকে হাদীছ শোনা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়।
২. জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। 'আকাবার সর্বশেষ বাই'য়াতে অংশগ্রহণ করেন। খন্দক যুদ্ধ ও বাই'য়াতে রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর সময়ের মদীনার মুফতী ছিলেন। একজন দীর্ঘজীবী মানুষ ছিলেন। হি. ৭৮ মতান্তরে ৭৯ সনে ৯৪ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। যদি হি. ৮০ সনে আবু হানীফার (রহ) জন্ম হয় তাহলে সাহাবী জাবিরের (রা) সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। আর যদি হি. ৬১ সনের ইবন 'আলীয়ায়র মতটি সঠিক হয় তাহলে জাবিরের (রা) সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব।
৩. 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস (রা) হিজরী ৯৪ সনে কুফা যান। ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, তখন আমার বয়স ১৪ বছর এবং আমি তাঁর মুখ থেকে হাদীছ শুনেছি। এই 'আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন মদীনার একজন আনসারী সাহাবী।
৪. 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা আল-আসলামী (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাই'য়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পরে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। আবু নু'আইম বলেন, হিজরী ৮৭ সনে তিনি কুফায়

মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কৃষায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। হিজরী ৮৭ সনে ইমাম আবু হানীফার বয়স ৭ বছর। মুহাদ্দিছগণ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের শ্রবণ ও বর্ণনাকে শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর ইবন 'আলীয়ার মত অনুযায়ী আবু হানীফা (রহ) তখন ২৭ বছরের যুবক। সুতরাং 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফাকে (রা) দেখা ও তাঁর নিকট হাদীস শোনা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫. ওয়াছিলা ইবন আল-আসকা' আল-লায়ছী (রা) একজন বিখ্যাত সাহাবী। শামে আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানে হিজরী ৮৫ সনে ১০৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।^৮

৬. 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ (রা)

৭. মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা)

৮. একজন মহিলা সাহাবী 'আয়িশা বিন্ত আজযাদ (রা)। কোন কোন গ্রন্থের লেখক বলেছেন, আবু হানীফা (রহ) আবুত তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিল (রা) এর থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি মতবিশেষে হিজরী ১১০ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু হানীফা (রহ) নিম্নে উল্লেখিত সাহাবীদেরকে দেখেছেন:

১. সাহল ইবন সা'দ (রা) (মৃ. ৮৮ হি.), ২. সাযিব ইবন খাল্লাদ (রা) (মৃ. ৯১ হি.), ৩. সাযিব ইবন ইয়াযিদ (রা) (মৃ. ৯১-৯৪ হি.), ৪. মাহমূদ ইবন রাবী (রা) (মৃ. ৯৯ হি.), ৫. মাহমূদ ইবন লাবীদ (রা) (মৃ. ৯৬ হি.), ৬. 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা), ৭. আবু উমামা (রা) (মৃ. ৮৮ হি.)।^৯

'আল্লামা ইবন হাজার মাক্কী (রহ) লিখেছেন:^{১০}

أنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بما سنة ثمانين، فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من الأئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري ومالك بالمدينة المشرفة والليث بن سعد بمصر.

তিনি সাহাবীদের একটি দলকে পেয়েছেন, যাঁরা হিজরী ৮০ সনে তাঁর জন্মের পর কৃষায় ছিলেন। সুতরাং তিনি তাবি'ঈ শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু বিভিন্ন শহরে বসবাসরত তাঁর সমকালীন ইমামদের কেউই এ মর্যাদা লাভ করেছেন বলে প্রমাণ নেই। যেমন: শামের আল-আওয়া'ঈ, বসরার দুই হাম্মাদ-হাম্মাদ ইবন সালমা ও

^৮. জামি'উ মাসানীদ আল-ইমাম আল-আ'জাম, খ. ২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৮

^৯. আন-নাওয়াদির আল-মুনীফা ফী মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৩০-৩১

^{১০}. আল-খায়রাত আল-হিসান, ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২২

হাম্মাদ ইবন য়াদ, কূফার সুফইয়ান আছ-ছাওরী, মদীনার মালিক ও মিসরের আল-লাইছ ইবন সা'দ (রহ)।

অর্থাৎ তাঁদের কেউই তাবিঈ নন।

ইবন হাজার মাক্কী (রহ) আরো বলেন:^{১১}

أدرك الإمام الأعظم ثمانية من الصحابة منهم أنس و'عبدالله بن أبي أوفى وسهل بن سعد و أبو الطفيلرض.

ইমাম আ'জাম (রহ) আটজন সাহাবী পেয়েছেন। তার মধ্যে আনাস ইবন মালিক, আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা, সাহুল ইবন সা'দ এবং আবুত তুফাইল (রা) অন্যতম।

'আল্লামা 'আলাউদ্দীন (রহ) 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন:^{১২}

وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا.

বয়সের হিসাব অনুযায়ী তিনি বিশজন সাহাবীকে পেয়েছেন।

'মুনিয়াতুল মুফতী' গ্রন্থের বরাতে 'আল্লামা 'আলাউদ্দীন আরো বলেন:^{১৩}

وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من صحابة.

একথা সঠিক যে, আবু হানীফা (রহ) সাতজন সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন।

'আল্লামা ইবনু 'আবিদীন (রহ) বলেন:^{১৪}

و على كل فهو من التابعين ومن حرم بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني.

সকল দিক বিবেচনায় তিনি তাবিঈ ছিলেন। হাফিজ আয-যাহাবী ও হাফিজ আল-'আসকিলানী (রহ) দৃঢ়তার সাথে একথা বলেছেন।

শিক্ষা

ইমাম আবু হানীফা (রহ) প্রাথমিক জীবনে কুরআন, হাদীছ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের পর দীর্ঘকাল দর্শন ও কালাম শাস্ত্র চর্চায় অতিবাহিত করেন। পরে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন। তিনি জ্ঞানার্জন ও বিষয় নির্বাচনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

আমি যখন জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা করলাম তখন একেকটি বিষয় নির্বাচন করে এর পরিণতি ও

^{১১}. প্রাণ্ড: মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ২৪

^{১২}. রাদুল মুখতার, খ. ১, পৃ. ৫৯

^{১৩}. প্রাণ্ড

^{১৪}. প্রাণ্ড

ফলাফল সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদের নিকট জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। আমাকে বলা হলো: তুমি আল-কুরআন শেখ। বললাম: আমি আল-কুরআন শিখলাম, হিফজ (মুখস্ত) করলাম, কিন্তু এর ফলাফল কি হবে? তাঁরা বললেন: তুমি মাসজিদে বসবে এবং শিশু-কিশোররা তোমার নিকট আল-কুরআন পড়বে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে তোমার চাইতে বড় অথবা তোমার সমকক্ষ কোন হাফিজ তৈরি হয়ে যাবে। আর তখন তোমার নেতৃত্ব চলে যাবে। বললাম: আমি যদি হাদীছ শুনি ও লিখি, এমন কি আমিই যদি হই দুনিয়ার সবচাইতে বড় হাদীছ সংরক্ষণকারী? তাঁরা বললেন: তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শিশু-কিশোরদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করবে, তখন তুমি ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে না। তোমাকে তখন মিথ্যাবাদী বলা হবে। যা তোমার লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে। বললাম: এ আমার প্রয়োজন নেই। বললাম: তাহলে আমি “নাহু” (আরবী ব্যাকরণ) শিখবো। জানতে চাইলাম: যদি ভাষা ও ব্যাকরণ শিখি তাহলে এর ফলাফল কি হবে? তাঁরা বললেন: তুমি একজন মু‘আল্লিম (শিক্ষক) হবে এবং তোমার সর্বাধিক আয় হবে দু’ অথবা তিন দীনার। বললাম: এর কোন ভালো পরিণতি নেই।

আমি বললাম: যদি কবিতার জ্ঞান অর্জন করি এবং আমার চাইতে বড় কবি যদি কেউ না থাকে, তাহলে ব্যাপারটি কেমন হবে? তাঁরা বললেন: তুমি কারো প্রশংসা করবে, সে তোমাকে কিছু দান করবে অথবা কোন বাহনের পিঠে আরোহন করাবে অথবা তোমাকে কিছু পোশাকে সজ্জিত করবে। আর তোমাকে না দিলে, তার নিন্দা-বিত্রপ করে কিছু কবিতা লিখবে, অথবা কোন সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে কবিতা রচনা করবে। বললাম : এ আমার প্রয়োজন নেই। বললাম: যদি ‘ইলমুল কলাম (ধর্মতত্ত্ব) শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তাহলে তার ফলাফল কি হবে? তাঁরা বললেন, এ শাস্ত্র যারা অধ্যয়ন করে তারা মানুষের গালি ও নিন্দা থেকে রেহাই পায় না। নাস্তিকতার অপবাদও তার কপালে জুটে যায়। সবশেষে হয় তাকে ধোঁয়াস্তর করে হত্যা করা হয়, অথবা বেঁচে গেলে নিন্দিত, দ্বিকৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে। বললাম: যদি আমি ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তাহলে কেমন হয়? তাঁরা বললেন: তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি মানুষকে ফাতওয়া দেবে। আর তুমি যুবক হলেও তোমাকে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আহ্বানও জানানো হতে পারে। আমি বললাম, এই জ্ঞানের চাইতে অধিক কল্যাণকর আর কোন জ্ঞান নেই। অতঃপর আমি ফিক্হ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলাম এবং তা শিখলাম।^{১৫}

ফিক্হ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন কূফার খ্যাতনামা ফাকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মান (মৃ. ১২০ হি.) এর শিক্ষা মাজলিসে নিয়মিত যোগদান করতেন। এই হাম্মাদের মাজলিসে যোগদানের পিছনে একটা চমকপ্রদ ঘটনা আছে যা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

^{১৫}. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা’ আর রিজাল, খ. ১৯, পৃ. ১০৬

আমি ‘আল-কালাম’ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এমন বুৎপত্তি অর্জন করলাম যে, এক্ষেত্রে আমাকে আংগুল দিয়ে ইঙ্গিত করা হতো। আমরা হাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মানের হালকা বা দারসের আসরের পাশেই আমাদের ‘আল-কালাম’ এর আসর বসাতাম। একদিন এক মহিলা আমার কাছে এসে বললো: একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে সুল্লাত অনুযায়ী তালাক দিতে চায়, সে কয়টি তালাক দিবে? আমি যে কী বলবো তা ভেবে পেলাম না। তাকে বললাম, আপনি হাম্মাদের নিকট যান, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। তারপর তিনি যে জবাব দেন তা আমাকে জানিয়ে যাবেন। মহিলা হাম্মাদের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে হাম্মাদ বলেন, ঋতুস্রাব ও দৈহিক মিলনমুক্ত পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দিবে। তারপর পরপর দুই ঋতুস্রাব কাল অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করবে। উল্লেখিত সময় অতিক্রান্ত হলে গোসল শেষে পবিত্র হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ বৈধ হবে। মহিলা ফিরে এসে আমাকে সবকথা অবহিত করেন। আমি মনে মনে বললাম: এই ‘ইলমুল কালাম’ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই। তখনই আমি আমার জুতা জোড়া হাতে নিয়ে হাম্মাদের মাজলিসে গিয়ে বসলাম।

আমি হাম্মাদের মাজলিসে বসতাম, বিভিন্ন মাসয়ালায় তাঁর সিদ্ধান্ত ও মতামত শুনতাম এবং মুখস্ত করে নিতাম। পরের দিন তিনি কোন সিদ্ধান্ত পাষ্টালে আমি তাও মুখস্ত করে ফেলতাম। কিন্তু তাঁর অন্য শিক্ষার্থী ও সাথীরা তা ভুল করতো। আমার এমন তীক্ষ্ণ মেধা লক্ষ্য করে তিনি ঘোষণা দিলেন, মাজলিসের সম্মুখভাগে আমার পাশাপাশি একমাত্র আবু হানীফা ছাড়া আর কেউ বসবে না। দশ বছর যাবত তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করি। অতঃপর নেতৃত্বের জন্য আমার অন্তর আগ্রহী হয়ে উঠলো, এবং আমি মাজলিস ত্যাগ করাকে শ্রেয় মনে করলাম। এমন সিদ্ধান্তের পর আমি তাঁর মাজলিসে গিয়ে বসলাম এবং সেই রাতেই খবর এলো যে, বসরায় হাম্মাদের এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে। সে অনেক অনেক সম্পদ রেখে গেছে, কিন্তু তার কোন উত্তরাধিকারী নেই।

হাম্মাদ বসরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আমাকে শিক্ষা মাজলিসে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমার নিকট এমন কিছু মাসয়ালা উপস্থাপিত হয় যার জবাব আমি হাম্মাদের নিকট কখনো শুনিনি। আমি সেইসব মাসয়ালায় জবাব দিতাম এবং তা লিখে রাখতাম। দু’মাস পর হাম্মাদ ফিরে আসেন। আমি সেই সব মাসয়ালা এবং তার যে জবাব আমি দিয়েছিলাম তা হাম্মাদের নিকট উপস্থাপন করলাম। তা ছিল প্রায় ৬০টি মাসয়ালা। ৪০টি মাসয়ালায় তিনি আমার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন এবং ২০টি মাসয়ালায় আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। অতঃপর আমি অঙ্গীকার করি যে, যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবো না। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।^{১৬}

হাম্মাদের (রহ) সঙ্গ অবলম্বনের আরেকটি কারণ তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে: “আমি বসরায় গেলাম। ধারণা করলাম আমাকে যে কোন প্রশ্ন করা হোক না কেন আমি তার জবাব দিব। সেখানকার লোকেরা আমাকে অনেক প্রশ্ন করলো যার কোন জবাব আমার কাছে ছিলনা। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, হাম্মাদের মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবো না।”^{১৭} তাঁর সাথে আমি ১৮ (আঠারো) বছর কাটিয়েছি। হাম্মাদের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এক বছর ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং সমসাময়িক যুগে ইসলামী আইন শাস্ত্রের অ-প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ও ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। ইসলামী ফিকহ ও আইন শাস্ত্রে তাঁর এমন পাণ্ডিত্যের পশ্চাতে তাঁর শিক্ষক হাম্মাদের অবদান যেমন সত্য, তেমনি একটি স্বপ্নও এর পিছনে ভূমিকা রেখেছে। যেমন তিনি বলতেন:^{১৮}

رَأَيْتُ رُؤْيَا فَأَفْزَعْتُ، رَأَيْتُ كَأَنِّي أَنْبَشُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُ
الْبَصْرَةَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : هَذَا رَجُلٌ يَنْبَشُ
أَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি একটি স্বপ্ন দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। দেখলাম, আমি যেন নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর খুঁড়ছি। অতঃপর বসরায় আসলাম এবং এক ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের নিকট পাঠালাম। সে তাঁকে স্বপ্নটির তা’বীর (অর্থ) জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, “এই স্বপ্ন যিনি দেখেছেন তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ খোঁড়া-খুঁড়ি করবেন।

জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা

তিনি কিরাআত, হাদীছ, আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি সে সময়ের প্রচলিত সকল জ্ঞানই অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি কালাম শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এতটুকু পর্যন্ত উন্নতি করেন যে, এ বিষয়ে তাঁর দিকে সবাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করে। ইমাম সাহেব নিজেই বলেছেন:

আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, ‘ইলমে কালামের আলোচনায় যার দক্ষতা ছিল। এক সময় এমন ছিল যে, আমি এসব বিতর্ক ও আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। অধিকাংশ মতবিরোধের কেন্দ্রস্থল যেহেতু বসরায়ই ছিল, তাই আনুমানিক বিশ বার আমি সেখানে গিয়েছি। কখনো কখনো ছ’মাস-এক বছর সেখানে অবস্থান করে খারিজীদের বিভিন্ন দল-উপদলের সাথে বিতর্ক-যুদ্ধ করেছি।”^{১৯}

তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় যে, তিনি তৎকালীন দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং

^{১৭}. প্রাণ্ডক্ত

^{১৮}. প্রাণ্ডক্ত

^{১৯}. আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, মানাকিব আল-ইমাম আল-আ’জাম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৫৮-৫৯

ধর্মীয় বিরোধ ও মতপার্থক্য বিষয়াবলীতেও অবশ্যই প্রচুর জ্ঞান লাভ করে থাকবেন। কারণ, এ সকল জ্ঞান ছাড়া কেউ আল-কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করতে পারে না। পরবর্তীকালে তিনি আইন শাস্ত্রে ন্যায্যানুগ যুক্তি প্রয়োগ এবং বুদ্ধি ব্যবহারের যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, বড় বড় জটিল সমস্যা সমাধানে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা ছিল এ প্রাথমিক মানস গঠনের ফলশ্রুতি। দীর্ঘ দিন যাবত এ কাজে নিমগ্ন থাকার পর কালাম শাস্ত্রের কুটতর্ক এবং বাদানুবাদের প্রতি তার মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তিনি ফিকহ (ইসলামী আইন) এর প্রতি মনোযোগ দেন। তবে তিনি আহলুল হাদীছদের মত ও চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহী হননি। যারা কেবল কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধি-বিধান নির্ধারণ করতো, কিয়াস ও চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে উপস্থাপিত মতামতের কোন স্বীকৃতি দিতনা। এর পাশাপাশি তখন আরেকটি ধারা গড়ে উঠেছিল, যারা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমেও হুকুম-আহকাম নির্ধারণ করতো। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই শেষোক্ত দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। এই দলটিকে বলা হয় 'আসহাবুর রায়' (স্বাধীন মত ও সিদ্ধান্তের অধিকারী)। আবু হানীফার (রহ) সময়কালে ইরাকে তাঁদের কেন্দ্র ছিল কূফা। মূলত: এ চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে প্রখ্যাত সাহাবী 'আলী ইবন আবী তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকেই। অত:পর তাঁদের তিন সুযোগ্য ছাত্র কাজী শুরাইহ (মৃ. ৭৬ হি.), 'আলকামা (মৃ. ৬২ হি.) এবং মাসরুর (মৃ. ৬৩ হি.) এ চিন্তাধারাকে একটি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাঁড় করান। অত:পর ইবরাহীম নাখা'ঈ (মৃ. ৯৫ হি.) এবং তাঁর পরে হাম্মাদ (রহ) পর্যন্ত এর নেতৃত্ব পৌঁছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এই হাম্মাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। কিন্তু কূফায় তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তিনি শুধু তাতেই তুষ্ট হননি; বরং হজ্জ উপলক্ষ্যে বারবার হিজায় গিয়ে ফিকহ এবং হাদীছের অন্য বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন।

ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম আবু হানীফার (রহ) অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং তাঁর প্রখর মেধা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। হিজরী ১২০ সনে তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের (রহ) ইনতিকাল হলে তাঁর চিন্তাধারার অনুসারীরা সকলে একমত হয়ে তাঁকে উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। এ পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর যাবত পঠন-পাঠন এবং ফাতওয়া দানের এমন অক্ষয়কীর্তি তিনি রচনা করেন, আজ যা হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ তিরিশ বছর সময়ে তিনি কারো মতে ৬০ হাজার, আর কারো মতে ৮৩ হাজার আইন সংক্রান্ত মাসয়ালায় সমাধান দেন, যা তাঁর জীবনকালেই বিভিন্ন শিরোনামে সংগৃহীত হয়েছিল।^{২০}

^{২০}. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬; খ. ২, পৃ. ১৩২-১৩৬

কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়নে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা, গভীর মননশীলতা ও পরিশীলিত যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে একটি বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন শাস্ত্রের (ফিক্‌হ) প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের সকল আইন শাস্ত্রবিদ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফাকীহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবন বিশর বলেন, আমি আবু হানীফা ও সুফইয়ান আছ-ছাওরীর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। আবু হানীফার নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তুমি কার নিকট থেকে আসছো? বলতাম, সুফইয়ানের নিকট থেকে। তিনি বলতেন, তুমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছো, যার নিকট 'আলকামা ও আল-আসওয়াদ উপস্থিত হলেও তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন। আমি সুফইয়ানের নিকট গেলে তিনিও প্রশ্ন করতেন, কোথা থেকে আসছো? বলতাম, আবু হানীফার নিকট থেকে। তিনি বলতেন:^{২১}

لقد جئت من عند أئمة أهل الأرض.

তুমি এসেছো পৃথিবীবাসীর মধ্যে সবচাইতে বড় ফাকীহ (আইন শাস্ত্রবিদ) এর নিকট থেকে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ)ও আবু হানীফার (রহ) শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। যেমন তিনি বলতেন:^{২২}

الناس عيال على هؤلاء الخمسة : من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، كان أبو حنيفة من وفق له الفقه، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن اسحاق، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان.

মানুষ এই পঁচজনের উপর নির্ভরশীল : ১. যে ফিক্‌হ (আইন) শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় সে আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্রে যাঁদেরকে দক্ষতা দান করা হয়েছে তিনি তাঁদের একজন। ২. যে কাব্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় সে নির্ভরশীল যুহায়র ইবন আবী সুলমার উপরে। ৩. মাগাযী শাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় সে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, ৪. নাহু (ব্যাকরণ) শাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় সে আল-কাসাসী এবং ৫. যে আল-কুরআনের তাফসীরে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় সে মুকাতিল ইবন সুলায়মানের উপর নির্ভরশীল।

প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিছ 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) আবু হানীফার (রহ)

^{২১}. তাহযীব আল-কামাল-ফী আসমা' আর-রিজাল, খ. ১৯, পৃ. ১১০

^{২২}. প্রাণ্ডক্ত, খ-১, পৃ-১১১; তাযকিরাতুল হফফাজ, খ-১. পৃ-১৬৮

পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে:^{২০}

رأيت أعبد الناس، ورأيت أروع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس، فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أروع الناس فالفضل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة ثم قال : ما رأيت في الفقه مثله.

আমি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক 'ইবাদাতকারী' ব্যক্তি দেখেছি। আমি দেখেছি, সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু, সবচাইতে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সবচাইতে বড় ফাকীহ (ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ) মানুষটিকে। সর্বাধিক 'ইবাদাতকারী' ব্যক্তি হলেন 'আবদুল 'আযীয ইবন আবী রাওয়াদ, সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু হলেন ফাদল ইবন 'আয্যাদ, সবচাইতে বড় জ্ঞানী হলেন সুফইয়ান আছ-ছাওরী এবং সবচাইতে বড় ফাকীহ হলেন আবু হানীফা। আমি ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর মত পণ্ডিত আর দেখিনি।

কোন কোন মুহাদ্দিছ তাঁর মাযহাবকে ব্যক্তিগত বা 'রায়' ভিত্তিক বলে অমূলক ধারণা পোষণ করেন। আসলে তা মোটেই সঠিক নয়। ইসলামী জীবন-ধারার বিভিন্ন দিক, যেমন : ইবাদাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প, রাজস্ব, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি, মোটকথা মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের সমাধানে তাঁর অভিমতের মূল সূর কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী আইন উদ্ভাবন ও সংকলনের ব্যাপারে তিনি যে পছন্দ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা ছিল অতি ব্যাপক ও দুরূহ। তিনি তাঁর সাত শতাধিক সুযোগ্য ছাত্র-সহকর্মীদের মধ্য হতে চল্লিশ জনের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ গঠন করেন, যাঁদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.), ইমাম যুফার (মৃ. ১৫৮ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি.) এবং ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারকের (রহ) মত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও আইনবিদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতের সংগে পরিষদ সদস্যগণের মতামত সুস্বভাবে যাচাই করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী আইন উদ্ভাবন ও সংকলন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং আবু হানীফার (রহ) নেতৃত্বে তিরিশ বছর যাবত ইসলামী শরী'আ আইনের সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধকরণের কাজ অব্যাহত থাকে। তাঁর জীবনকালেই তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়া ও আইন সংক্রান্ত অভিমত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি এমন সাত আট শো ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ছাত্র তৈরি করেন যারা মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দারস এবং ফাতওয়ার মসনদ অলঙ্কৃত

করেন এবং জনগণের ভক্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। আবার তাঁদের সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে এমন প্রায় পঞ্চাশজনের সন্ধান পাওয়া যায় যারা তাঁর পরে আব্বাসীয় খিলাফতের কাজী (বিচারপতি) নিযুক্ত হন। তাঁর মায়হাব মুসলিম জাহানের বিশাল অংশের আইনে পরিণত হয়। তা আব্বাসী, সালজুকী, 'উছমানী এবং মোঘল সাম্রাজ্যেরও আইন ছিল। আর আজ চীন থেকে তুরস্ক পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলিম তারই ফিক্হ অনুসরণ করে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ইসলামী আইন বিধি প্রণয়নে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। ঘটনাটি এ রকম : একদিন সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো: আপনি আবু হানীফাকে কি শাস্তি দেবেন? সুফইয়ান বললেন : কেন, তাঁর অপরাধ কি? লোকটি বললো : আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি :

أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله، فما لم أجد في كتاب الله و لا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم و أدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، و عطاء، وسعيد بن المسيب، وعدد رجالاتنا، فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا.

আমি সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহর (আল-কুরআন) অনুসরণ করবো, যদি সেখানে কোন নির্দেশ না পাই, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর অনুসরণ করবো। যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ রাসূলুল্লাহ তে নির্দেশ না পাই তাহলে সাহাবীদের কথার অনুসরণ করবো। তাঁদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছামত কারো কথা গ্রহণ করবো, আবার কারো কথা বর্জন করবো। তবে তাঁদের সকলের কথা পরিভাগ করে অন্য কারো কথা গ্রহণের দিকে যাব না। যদি তাঁদের কারও কোন কথা না পাওয়া যায় এবং বিষয়টি ইবরাহীম আন-নাখাঈ, আশ-শাবী, ইবন সীরীন, হাসান আল-বাসরী, 'আতা', সাঈদ-ইবন আল-মুসায়্যিব- এভাবে তিনি আরো কয়েকজনের নাম বললেন- পর্যন্ত গড়ায় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা সকলে ছিলেন মুজতাহিদ। আমি ইজতিহাদ করবো, যেমন তাঁরা করেছিলেন।

লোকটির বর্ণনা শুনে সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর নিম্নের কথাগুলো বলেন :

نسمع الشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه ولا نحاسب الأحياء،

ولانقضى على الأموات، نسلم ما سمعنا، ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، وننتهم رأينا
لرأيهم.

আমরা হাদীছের শক্ত কথা শুনি এবং ভয় পাই। তেমনিভাবে নরম কথা শুনি ও আশাবাদী হই। আমরা জীবিতদের (ভুল-ত্রুটির) হিসাব-নিকাশ করবো না এবং মৃতদের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নিব না। যা কিছু আমরা শুনেছি মেনে নিব, যা আমরা জানিনা, যে জানে তার উপর ছেড়ে দেব। তাদের অভিমতের বিপরীতে নিজেদের মতামতকে দোষারোপ করবো।^{২৪}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) সবচেয়ে বড় কীর্তি যা তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে, তাহলো খিলাফতে রাশিদার পর শূরার পদ্ধতি বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণ করা। এ শূন্যতার মধ্য দিয়ে প্রায় এক শতাব্দী কাল কেটে যাওয়ার ফলে যে কত ক্ষতি হতে থাকে, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করতেন। এক দিকে সিদ্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত মুসলিম দেশের সীমা বিস্তার ঝাড করেছিল। নিজেদের স্বতন্ত্র কৃষ্টি-কালচার, পৃথক আচার-প্রথা এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিয়ে অসংখ্য জাতি মুসলিম দেশের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল, দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতি, শিল্পকলা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদী, শাসনতান্ত্রিক এবং দেওয়ানী, ফৌজদারি আইন-বিধানের সমস্যা দিন দিন উদ্ভূত হচ্ছিল। দেশের বাইরে বিশ্বের বহু জাতির সাথে এ বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল। তাদের সাথে যুদ্ধ-সন্ধি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক লেনদেন, জল ও স্থল পথে যাতায়াত, কাষ্টম ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। মুসলিমদের যেহেতু এক স্বতন্ত্র দর্শন, জীবনধারা এবং মৌলনীতি ছিল, তাই নিজেদের আইন-বিধান অনুযায়ী এসব নিত্য নতুন সমস্যা সমাধান করা তাদের জন্য ছিল একান্ত অপরিহার্য। মোট কথা, একদিকে সময়ের এ বিরাট চ্যালেঞ্জ ইসলামকে মুকাবিলা করতে হচ্ছিল। অপর দিকে খিলাফতে রাশিদার অবসানের পর এমন কোন স্বীকৃত আইন সংস্থা অবশিষ্ট ছিল না যেখানে মুসলিমদের জ্ঞানী ফাকীহ এবং বিশেষজ্ঞরা বসে সেসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন, শরী'আতের মূলনীতির আলোকে সে সব সমস্যার নির্ভরযোগ্য সমাধান পেশ করবেন, যে সমাধান দেশের আদালত এবং সরকারি বিভাগগুলোর জন্য আইন বলে স্বীকৃত হবে, সমগ্র দেশে সমভাবে তা কার্যকরী হবে।

খলীফা, আঞ্চলিক গভর্নর, শাসক, কাজী-বিচারপতি সকলেই এ ক্ষতি উপলব্ধি করছিলেন। কারণ, ব্যক্তিগত ইজতিহাদ এবং চিন্তা-গবেষণার জোরে দৈনন্দিন উদ্ভূত এতসব সমস্যা যথাসময় সমাধান করা কোন মুফতী, 'আলিম, শাসক, বিচারক এবং কোন একটি বিভাগের পরিচালকের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। বিভিন্ন ব্যক্তি একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে তা সমাধান

^{২৪}. মুহাম্মাদ আল-খুদরী, তারীখ আত-তাশরী'উ আল-ইসলামী, পৃ. ১২৮; তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৮; তাহযীব আত-তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৫১

করলেও তার ফলে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের এক মহা সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। আসলে সরকার গঠিত একটি সংস্থা বা পরিষদই পারতো সকল সমস্যার সমাধান দিতে। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল তারা নিজেরা জানতো যে, মুসলিমদের মধ্যে তাদের কোন নৈতিক মর্যাদা এবং আস্থা নেই। সুতরাং তাদের পক্ষে ফাকীহদের সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের সহ্য করাই ছিল কঠিন ব্যাপার। এই শাসকদের অধীনে প্রণীত আইন কোন অবস্থায়ই মুসলিমদের নিকট ইসলামী আইন-বিধানের অংশ হতে পারতো না।

এ শূন্যতা পূরণের জন্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক ইবনুল মুকাফ্ফা খলীফা আল-মানসুরের নিকট প্রস্তাব পেশ করেন : খলীফা জ্ঞানী ব্যক্তিদের একটি পরিষদ গঠন করবেন, এতে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ধারার সুধীজনরা নিজ নিজ জ্ঞান ও মতামত পেশ করবেন। অতঃপর খলীফা নিজে প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত দেবেন। আর খলীফার সিদ্ধান্তই হবে আইন। কিন্তু খলীফা মানসুর এমন বোকামী করার মত লোক ছিলেন না। তিনি জানতেন তাঁর সিদ্ধান্ত আবু বাকর-উমারের (রা) সিদ্ধান্তের মত মানুষের নিকট গৃহীত হবে না। তাঁর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের বয়স তাঁর নিজের বয়সের চেয়ে বেশি হতে পারবে না। একজন মুসলিমও পাওয়া যাবে না যে স্বেচ্ছায় ও নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলবে। তা একটি ধর্মহীন আইন হয়তো হবে, কিন্তু ইসলামী আইনের একটা অংশ কখনো হবে না।

এ পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা একটি ভিন্ন পথ বেছে নেন। রাষ্ট্র-সরকার থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে তিনি নিজে এক বেসরকারি আইন পরিষদ (Private Legislative) গঠন করেন। একজন একান্ত স্বতন্ত্র চিন্তাধারার ব্যক্তিই এমন পরিষদ গঠন করার কথা ভাবতে পারেন। তাছাড়া কেবল তিনিই এমন সাহস করতে পারেন, স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা, চরিত্র এবং নৈতিক মান-মর্যাদার প্রতি যার এতটুকু আস্থা আছে যে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আইন প্রণয়ন করলে তা কোন রাজনৈতিক অনুমোদন ছাড়াই স্বীয় সৌন্দর্য, বৈচিত্র, বিশুদ্ধতা, পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং আইন প্রণয়নকারীদের নৈতিক প্রভাব বলে আপনা আপনিই তা কার্যকরী হবে, জাতি নিজেই তা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র-সরকার তা মেনে নিতে বাধ্য হবে। তিনি তৎকালীন মুসলিম জনসাধারণের মন-মানস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সমকালীন বাস্তবতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। এ কারণে তাঁর চিন্তা মাত্র অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে শতভাগ বাস্তব রূপ লাভ করে। একজন বিজ্ঞ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি একান্ত সঠিক ধারণাই করে নিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা দিয়ে এ শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন, আর তাঁর পূরণ করা দ্বারা এ শূন্যতা সত্যিই পূরণ হবে।

এ পরিষদের সদস্যরা ছিলেন ইমামের বাছাইকরা ছাত্র-শিষ্য, যাঁদেরকে তিনি বছরের পর বছর স্বীয় আইন পরিষদে নিয়মিত আইন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে, তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে এবং যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে

উপনীত হতে শিক্ষা দান করেছেন। তাঁদের প্রায় সকলেই ইমাম সাহেব ছাড়াও সেকালের অন্যান্য বড় শিক্ষকদের নিকট কুরআন, হাদীছ, ফিকহ এবং অন্যান্য সহায়ক জ্ঞান, যথা ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস এবং চরিত্রশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন ছাত্রকে বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী মনে করা হতো। যেমন, কিয়াস ও রায় (অনুমান ও যুক্তি)-এ কারো বিশেষ স্থান ছিল, কারো ছিল হাদীছ, সাহাবীদের ফাতওয়া, মতামত এবং অতীত খলীফা ও কাজীদের ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের বিপুল জ্ঞান। আর কেউ ছিলেন ইলমে তাফসীর, বা আইনের কোন বিশেষ বিভাগে, ভাষা বিজ্ঞান, ব্যাকরণ এবং মাগাযীশাত্তে বিশেষ পারদর্শী। তাঁরা কোন পর্যায়ের এবং কি মর্যাদার লোক ছিলেন, সে সম্পর্কে ইমাম নিজেই একবার তার এক বৈঠকে বলেন : ‘এরা ছত্রিশজন, তাদের মধ্যে বাইশজন কাজী হওয়ার যোগ্য, ছয়জন ফাতওয়া দানের যোগ্যতা রাখে, আর দু’জন এমন যোগ্যতা সম্পন্ন যে, তারা কাযী ও মুফতী তৈরি করতে পারে।’^{২৫}

পরিষদের কর্মপদ্ধতি

ইমাম আবু হানীফার (রহ) নির্ভরযোগ্য জীবনী লেখকগণ তার আইন পরিষদের যে কর্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন আমরা তার কিছু কথা তাঁদের ভাষায় উপস্থাপন করছি। আল-মুওয়াফফাক ইবন আহমাদ আল-মাক্কী (মৃ. ৫৬৮ হি./১১৭২ খ্রী.) লিখেছেন :

আবু হানীফা (রহ) তাঁর মাযহাব তাঁদের (তাঁর নিজের যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ ছাত্রদের) পরামর্শক্রমে সংকলন করেছেন। নিজের সাধ্যানুযায়ী দীনের জন্য চরম চেষ্টা সাধনা করার যে উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁর ছিল এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ঈমানদারদের জন্য পূর্ণমানের যে নিষ্ঠা ও সততা তাঁর অন্তরে ছিল, তার কারণে ছাত্র-শিষ্যদের বাদ দিয়ে নিছক নিজের ব্যক্তিগত মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ কাজ করে ফেলা তিনি পসন্দ করেন নি। এক একটি সমস্যা তিনি তাদের সামনে পেশ করতেন, সমস্যার বিভিন্ন দিক তাঁদের সামনে তুলে ধরতেন, তাঁদের উপস্থাপিত দলীল প্রমাণ, যুক্তি ও মতামতও শুনতেন এবং নিজের মতও ব্যক্ত করতেন। এমন কি, কখনো কখনো এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে মাসের পর মাস কেটে যেত। শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হলে কাজী আবু ইউসুফ তাঁর ‘কুতুবুল উসুলে’ (মূলনীতি গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করতেন।^{২৬}

ইবনুল বাযযায় আল- কারদারী (মৃ. ৮২৭হি.) বলেন: “তাঁর ছাত্ররা একান্ত খোলা মনে এক একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, সকল বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতেন। এ সময় ইমাম নীরবতার সাথে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন। অতঃপর আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে

^{২৫} আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ২৪৬

^{২৬} প্রান্তক, খ. ২, পৃ. ১৩৩

নিজের বক্তব্য শুরু করতেন, তখন মাজলিসে এমন নীরবতা বিরাজ করতো, যেন তিনি ছাড়া আর কেউ-ই সেখানে উপস্থিত নেই।^{২৭}

‘আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলেন, একবার এ মাজলিসে একটি সমস্যা নিয়ে একাধারে তিন দিন আলোচনা চলে। তৃতীয় দিন বিকেলে আমি যখন “আল্লাহ্ আকবার” ধ্বনি শুনি, তখন বুঝতে পারলাম যে, আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।^{২৮}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) অপর এক ছাত্র আবু ‘আবদিল্লাহ বলেন, এ মাজলিসে ইমাম যে সব মতামত ব্যক্ত করতেন, পরে তিনি তা পড়িয়ে শুনে নিতেন। আমি ইমামের বক্তব্য তাঁকে পাঠ করে শোনতাম। আবু ইউসুফ (মাজলিসের সিদ্ধান্ত লিখতে গিয়ে) সঙ্গে সঙ্গে নিজের বক্তব্যও লিখতেন। তাই পড়ার সময় আমি চেষ্টা করতাম তাঁর বক্তব্য বাদ দিয়ে যেতে। একদিন আমি ভুলে ভিন্ন বক্তব্যও পড়ে ফেলি। ইমাম জিজ্ঞেস করেন, এ ভিন্ন বক্তব্যটি কার।^{২৯}

আল-মাক্কীর বর্ণনা থেকে এও জানা যায় যে, যে সিদ্ধান্ত এ মাজলিসে লিপিবদ্ধ করা হতো, ইমাম আবু হানীফার (রহ) জীবদ্দশায়ই তা স্বতন্ত্র শিরোনামের অধীনে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিতও হয়েছিল।^{৩০}

ইতিপূর্বে আমরা আল-মাক্কীর সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, এ মাজলিসে ৮৩ হাজার আইন সংক্রান্ত সমস্যা মীমাংসা করা হয়েছে। সে সময় পর্যন্ত ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, এ মাজলিসে কেবল সেসব সমস্যাই আলোচিত হতো না, বরং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা কল্পনা করেও তার সমাধান তালাশ করা হতো, যাতে আগামীতে দেখা দিলে আইনে তার সমাধান পাওয়া যায়। এসব সম্ভাব্য সমস্যা আইনের প্রায় সকল বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। আন্তর্জাতিক আইন, শাসনতান্ত্রিক আইন, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আইন, সাক্ষ্য আইন, আদালতের নীতিমালা, অর্থনৈতিক জীবনের সকল বিভাগের স্বতন্ত্র আইন, বিয়ে-তলাক, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, ইবাদাতের বিধি-বিধান-এ মাজলিসের সংগৃহীত তথ্যাবলী দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ, অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান আশ-শায়বানী (রহ) পরবর্তীকালে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার সূচীপত্রেই আমরা এসব শিরোনাম দেখতে পাই।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান কালের মানুষের এ ভুল ধারণা রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আইন একটা নতুন জিনিস। প্রথম যে ব্যক্তি আইনের এ বিভাগের পত্তন করেন, তিনি হলেন হল্যান্ডের গ্রেটিয়াস (Grotious-1583-1645)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার (রহ) ছাত্র

^{২৭} ইবনুল বাযযায আল-কারদারী, মানাকিব আল ইমাম আল-আ'জাম, খ. ২, পৃ. ১০৮

^{২৮} আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ১০৮

^{২৯} আল-কারদারী, খ. ২, পৃ. ১০৯

^{৩০} আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ১০৬

মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান আশ-শায়বানী (হি. ১৩২-১৮৯) (রহ) এর কিতাবুস সিয়্যার' যিনি দেখেছেন, তিনি জানেন যে, খ্রোটিয়াসের নয় শো বছর পূর্বে ইমাম আবু হানীফার (রহ) হাতে এ জ্ঞান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর মাজলিসে আন্তর্জাতিক আইনের অধিকাংশ দিক এবং এর জটিল সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। আধুনিক যুগে জ্ঞানীদের একটি দল এ সত্য স্বীকারও করেছেন এবং জার্মানে 'Shaibani Society of International Law' নামে একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।^{৩১}

ফলাফল

এভাবে যথার্থি আইন বিধিবদ্ধ করণের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সকল মুজতাহিদ, মুফতী এবং কাজী কাজ করেন, তাদের কাজে মানুষের আস্থা হারাতে থাকে। ইমাম আবু হানীফার (রহ) মত সুস্বন্দর্শী বিজ্ঞ ফাকীহর নেতৃত্বে ফাকীহদের একটি পরিষদ শরী'আতের মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে জীবনের সকল অধ্যায়ের জন্য প্রযোজ্য যে আইন বিধিবদ্ধ করেন। তারপর বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সংকলিত বিধান কোন ভাবেই তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারতো না। তাই, ইমাম সাহেবের এ কর্মধারা জনগণের সামনে উপস্থাপিত হলেই জনগণ, শাসক, বিচারক-সকলেই সে দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। কারণ তা ছিল সময়ের দাবী, আর মানুষ দীর্ঘদিন থেকে এমনই একটি জিনিসের অভাব বোধ করছিল। তাই প্রসিদ্ধ ফাকীহ ইয়াহইয়া ইবন আদম (মৃ. ২৫৩ হি.) বলেন: 'ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর বক্তব্যের সামনে অন্যান্য ফাকীহর বক্তব্য শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তার জ্ঞানই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা, ইমাম এবং শাসকরা তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিচার-ফয়সালা করতে শুরু করে এবং তার আলোকেই সকল লেনদেন চলতে শুরু করে।'^{৩২}

খলীফা মা'মূনের (হি. ১৯৮-২১৮) সময় পর্যন্ত পৌছে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আবু হানীফার (রহ) একজন বিরুদ্ধবাদী ফাকীহ একবার উযীরে আজম ফাদল ইবন সাহলকে হানীফী ফিকহের প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন। উযীরে আজম বিশেষজ্ঞদের ডেকে এ ব্যাপারে তাদের মতামত চান। তারা সকলে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে এমন পরামর্শ দিয়েছে তার জ্ঞান অপূর্ণ। এ কাজ করলে দেশের জনগণ আপনার বিরুদ্ধে ফেটে পড়বে। উযীর বলেন, আমি নিজেও তার সাথে একমত নই। আর আমীরুল মু'মিনীনও এতে রাজী হবেন না।^{৩৩}

এভাবে ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী আইন প্রণয়ন সংস্থার প্রণীত আইন নিছক নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সদস্যদের নৈতিক মর্যাদা বলে নানাদেশ এবং নানা রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়। সাথে সাথে

^{৩১}. শিলাফত ও মুলুকিয়াত (বাংলা অনুবাদ), পৃ. ২০৩, টীকা নং- ৪১

^{৩২}. আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ৪১

^{৩৩}. প্রাশস্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৭-১৫৮; আল-কারদারী, খ. ২, পৃ. ১০৬

এর আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল এও পরিলক্ষিত হয় যে, তা মুসলিম আইন গবেষকদের জন্য পথিকৃ্তের ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ইসলামী আইনের ওপর যত গবেষণা হয়েছে সবই হানাফী ফিকহের নিকট দায়বদ্ধ।

তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

জীবনীকারগণ তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও ফাকীহগণের এক বিরাট তালিকা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আয-যাহাবী 'তায়কিরাতুল হুযফাজ' গ্রন্থে, আল মাক্কী 'মানাকিবু আবী হানীফা, গ্রন্থে, আবুল মাহসিন 'উকদুল জুমান' গ্রন্থে এবং ইউসুফ আল-মিয্বী তাঁর তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল' গ্রন্থে তাঁর শতাধিক উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। যে তালিকায় সাতজন সাহাবী ও তিরানব্বই জন তাবি'ঈ রয়েছেন। সাহাবীগণের নাম পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হলো :

'আতা' ইবন আস-সায়িব, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ আল-মুনতশির, ইসমাঈল ইবন 'আবদিল মালিক, জাবালা ইবন সুহাইম, আবু হিন্দ আল-হারিছ ইবন 'আবদির রাহমান আল-হামদানী, আল-হাসান ইবন 'উবায়দিল্লাহ, আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা, হাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মান, খালিদ ইবন 'আলকামা, রাবী'আ ইবন আবী 'আবদির রাহমান, যুবাঈদ আল-ইয়ামী, যিয়াদ ইবন 'ইলাকা, সা'ঈদ ইবন মাসরুক আছ-ছাওরী, সালামা ইবন কুহাইল, সিমাক ইবন হারব, তাউস ইবন কায়সান, তারীফ ইবন সুফইয়ান আস-সা'দী, আবু সুফইয়ান তালহা ইবন নাফি', 'আসিম ইবন কুলাইব, আসিম ইবন আবিন নাজ্জুদ, আমির আশ-শা'বী, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা, 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার, 'আবদুর রাহমান ইবন হুরমুয আল-আ'রাজ, 'আবদুল-আযীয ইবন রুফাহ, 'আবদুল কারীম ইবন আবী উমাইয়া আল-বাসরী, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর, আদী ইবন ছাবিত আল-আনসারী, 'আতা ইবন আবী রাবাহ, 'ইকরামা মাওলা ইবন 'আব্বাস, 'আলকামা ইবন মারছাদ, 'আলী ইবন আল-হুসায়ন আয-যাররাদ, 'আমর ইবন দীনার, কাতাদা ইবন দি'আমা, মুহাম্মাদ ইবন আয-যুবার আল-হানজালী, মুহাম্মাদ ইবন আস-সায়িব আল-কালবী, আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন আল-হুসাইন, মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-হামদানী, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, নাফি 'মাওলা ইবন 'উমার, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, আবু ইসহাক আস-সা'বী'ঈ (রহ) ও আরো অনেকে। তবে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর প্রধান শিক্ষক হলেন হাম্মাদ (রহ)।^{৩৪}

তাঁর খ্যাতিমান ছাত্রদের তালিকাও অনেক দীর্ঘ। এখানে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো:

^{৩৪}. তায়কিরাতুল হুযফাজ, খ. ১, পৃ. ১৬৮; তাহযীব আল কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১০২-১০৩

ইবরাহীম ইবন তাহমান, আসবান ইবন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী, ইসহাক ইবন ইউসুফ আল-আযরাক, আইউব ইবন হানী আল-জুফী, আল-জারুদ ইবন ইয়াযীদ আন-নিসাবুরী, জা'ফার ইবন 'আওন, আল-হাসান ইবন ফুরাত আল-কাযযায, কাজী হাফস ইবন 'আবদির রহমান আল-বালখী, হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা, হামযা ইবন হাবীব আয-যায্যাত, খারিজা ইবন মুস'আব আস-সারাখসী, দাউদ ইবন নুসাইর আত-তায়ী, আবুল হুযাইল যুফার ইবন আল-হুসাইন আত-তামীমী, যায়দ-ইবন আল-হুবার আল-'উকলী, শীরাযের কাজী সা'দ ইবন আস-সুলত, সালম ইবন সালিম আল-বালখী, সুলায়মান ইবন 'আমর আন-নাখা'ঈ, সাহল ইবন মুযাহিম, আস-সালত ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুফী, আবু 'আসিম আদ-দাহহাক ইবন মাখলাদ, 'আমির ইবন ফুরাত আন-নাসাবী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মুকরী, 'আবদুল 'আযীয ইবন খালিদ আত্ তিরমিযী, 'আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, মুহাম্মাদ ইবন আল-হাসান আশ-শায়বানী, কাজী আবু ইউসুফ, ইয়াযীদ ইবন হারুন, ইউনুস ইবন বুকাইর আশ-শায়বানী, ওয়াকী' ইবন আল-জাররাহ, ইয়াহইয়া ইবন আইউব আল-মিসরী (রহ) ও আরো অনেকে।^{৭৭}

তবে উল্লেখিত ছাত্রদের মধ্যে হতে যে কয়েকজন তাঁদের শিক্ষকদের ফিকহ বিষয়ক চিন্তা, যুক্তি ও মতামত সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচার প্রসারে সর্বাধিক ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন : আবু ইউসুফ আল-আনসারী (মৃ. ১৮২ হি./৭৯৮ খ্রী.), মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি./৮০৪ খ্রী.), যুফার ইবন আল-হুযায়ল ও হাসান ইবন যিয়াদ আল-লু'লুয়ী (রহ)।

ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইমাম আবু হানীফার (রহ) জীবদ্দশাতেই তাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হয় যে, তিনি কিয়াসকে (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) 'নস' (কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনা) এর উপর অগ্রাধিকার দেন। এ অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেন :^{৭৮}

আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যে বলে আমরা কিয়াসকে নস-এর ওপর অগ্রাধিকার দেই, সে মিথ্যা বলে, আমাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে। আচ্ছা, নস-এর পরও কি কিয়াসের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে?

একবার খলীফা আল-মানসুর ইমামকে লেখেন, আমি শুনেছি, আপনি কিয়াসকে হাদীছের উপর অগ্রাধিকার দান করেন। জবাবে তিনি লেখেন :

আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য নয়। আমি সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহর উপর আমল করি। তারপর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর উপর, অতঃপর

^{৭৭} প্রাগুক্ত

^{৭৮} আশ-শি'রানী, কিতাবুল মীযান, খ. ১, পৃ. ৬১

আবু বাকর, 'উমার, 'উসমান, 'আলী (রা) এর ফয়সালা উপর। অবশ্য তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে আমি কিয়াস করি।^{৩৭}

ইবন হাযম (রহ) বলেন, আবু হানীফা (রহ)-এর মাযহাব হলো, কোন দা'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ পাওয়া গেলে তার মুকাবিলায় কিয়াস এবং ব্যক্তিগত যুক্তি ও মত পরিত্যাগ করা হবে। তাঁর সকল ছাত্র-শিষ্য এ ব্যাপারে একমত।^{৩৮}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) শেষোক্ত ক্ষেত্রেও নিজের মতের ব্যাপারে তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের সংগে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিখিয়ে রাখতেন। মূলত: তিনি নিজে কোন লেখক ছিলেন না। তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁর চিন্তা, মতামত ও ইজতিহাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবন আবী লায়লা, আর-রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওয়াঈ ও কিতাবুল খারাজ; ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানীর আল-মাবসূত, আল-জামি' আস-সাগীর, আল-জামি' আল-কাবীর, আস-সিয়ারুল কাবীর, আস-সিয়ারুস সাগীর ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ ইমাম আবু হানীফার (রহ) আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মৌলিক উৎস।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাঁর সম্মানীয় শিক্ষক হাম্মাদ (রহ) হতে ফিকহ তথা আইন সংক্রান্ত তত্ত্ব অর্জন করেন। সে সম্পর্কে তথ্যলাভের প্রধান উৎস ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) আল-আছার এবং ইমাম আশ-শায়বানীর (রহ) 'আল-আছার' নামক গ্রন্থ দু'টি। ইমাম আবু হানীফার (রহ) ছাত্র ও অনুসারীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি আইনের উৎস নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের সমসাময়িক ধরন-পদ্ধতির তাত্ত্বিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামী আইনের প্রায়োগিক বিধি-বিধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। তিনি সরকারী কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকার কারণে তার চিন্তা-ভাবনা সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমসাময়িক বিচার পদ্ধতিরও কোন রকম পরোয়া করতেন না। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারাও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায়োগিক বিচার-বিশ্লেষণে তা ছিল অধিকতর পূর্ণাঙ্গ, বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সমসাময়িক কালের অন্যান্য ফাকীহগণ ফিকহী বিষয়াদিতে রায় (যুক্তি) ও কিয়াসকে যতটুকু স্থান দেন, তিনিও ততটুকুই গুরুত্ব দেন। সমকালীন অন্যান্য ফাকীহদের ন্যায়, যেমন মদীনার ফাকীহগণ, তিনিও খাবর-ই-আহাদ এর ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়কাল হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কোন আকীদা (বিশ্বাস) পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

^{৩৭}. প্রাপ্ত, খ. ১, পৃ. ৬২

^{৩৮}. আয-যাহবী, মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবায়হি, পৃ. ২০

ইমাম আবু হানীফার (রহ) সবচেয়ে বড় অবদান হলো, ইসলামী আইন ও বিধানের চারটি মৌলিক উৎস নির্ধারণ করা। আর তা হলো : আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ, আল-ইজমা, ও আল-কিয়াস। এছাড়া তিনি আল-ইসতিহসান-কেও পঞ্চম উৎস হিসেবে গণ্য করেন। আল-কুরআনের শাস্তিক ব্যাখ্যার অনুসারী জাহিরী সম্প্রদায় এবং নিছক যুক্তিবাদের অনুসারী মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী একটা পন্থা ইমাম আবু হানীফা (রহ) কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। আল-কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে এবং বিশুদ্ধ হাদীছের ভিত্তিতে তিনি আল-কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন। পরস্পর বিরোধী হাদীছের ক্ষেত্রে যে হাদীছটির মর্ম সবদিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতো তিনি সেটিই গ্রহণ করতেন। বিরোধীয় বা বিতর্কিত ভাবের সকল হাদীছ ছেড়ে অন্য কোন নতুন অভিমত তিনি পোষণ করতেন না। সাহাবীদের মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট হতে সাহাবীর তা শোনার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তিনি সকল ব্যক্তিগত অভিমতের উপর সাহাবীদের অভিমতের প্রাধান্য দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের মর্মানুযায়ী বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে, কিয়াস-ই-জলী বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অধিক সমীচীন মনে করতেন। এটাকে উসূলের পরিভাষায় আল-ইসতিহসান' বলা হয়। যেমন ভবিষ্যতে কোন জিনিস প্রস্তুত করে দিবে, অথবা উৎপন্ন হলে সরবরাহ করবে এ ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় কিয়াস অনুযায়ী সিদ্ধ নয়। কিন্তু জনস্বার্থে কখনও কখনও তা করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। কাজেই কিয়াস বিরোধী হলেও ইমাম সাহেব এ ধরনের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শারী'আতসম্মত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। একথাগুলো এযুগের একজন আরব লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :^{৩৯}

يتبين لنا أن أهم الأصول التي اعتمدها في مذهبه هي : القرآن الكريم، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم الإجماع، وكان يكثر من القياس حتى جعله أساسا هاما من أسس التشريع ثم الا استحسان وهو العدول عن القياس لظهور دليل آخر أقوى منه، وأخيرا عرف الناس.

আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে মূলনীতিগুলোর উপর তাঁর মায়হাব ভিত্তিশীল, পর্যায়ক্রমে তা হলো : আল-কুরআন আল-কারীম, আস-সুন্নাহ, সাহাবীর কাওল বা কথা, আল-ইজমা' ও আল-কিয়াস। কিয়াসকে (অনুসিদ্ধান্ত) তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন এবং তা শারী'আতের অন্যতম মূল ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন। তারপর 'আল-ইসতিহসান' (ভালো বিবেচনা করা),

আর তা হলো, অন্য কোন দলীল পাওয়ার কারণে কিয়াসকে ত্যাগ করা।

সর্বশেষটি হলো ‘উরফুন নাস বা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রীতি-প্রথা।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এরূপ নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ফিক্হ শাস্ত্রকে গতিময়, যুগোপযোগী এবং যে কোন যুগের যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা ও সমস্যার সমাধানের উপযোগী অবলম্বন ও সূত্র হিসেবে বিকশিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের কোন কোন প্রাচীন বিধি-বিধান পরিহার করে তাতে নিজের মত সংযোজন করেছেন। খাতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) এইসব বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখপাত্রের পরিগণিত হন। এরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা তাঁর নিজস্ব উক্তি, অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি এবং তাঁর সংকলিত ফিক্হ হতেই তা প্রমাণিত হয়। শারী‘আ আইন সংক্রান্ত তাঁর প্রত্যেকটি অভিমত ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস যে আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফাকীগণ তাঁদের বহু গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার (রহ) সংকলিত ফিক্হ মুসলিম বিশ্বে আব্বাসী যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামী সমাজের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা এবং জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদীছ এবং ইজমা ও কিয়াসের আলোকে একটি উদার বিবেক-বুদ্ধিসম্মত মধ্যম পন্থা অবলম্বিত হয়েছে। আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শগত মতপার্থক্যজনিত অনৈক্য, বিশৃংখলা ও সংঘাত হতে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে রক্ষায় এর সফলতা অনস্বীকার্য।

পেশা

ইমাম আবু হানীফা (রহ) পৈত্রিক পেশা ব্যবসাকে জীবিকার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। কুফায় ‘খায়’ (রেশম ও পশম দ্বারা তৈরি এক বিশেষ ধরনের কাপড়)-এর ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়ে তিনি অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করেন। নিজের একটি বিরাট কারখানা ছিল, সেখানে ‘খায়’ তৈরি করা হতো।^{৪০} তাঁর কারখানায় তৈরি কাপড় কেবল কুফাতে তাঁর নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রী হতো না, বরং দেশের দূর-দূরান্তেও তাঁর পণ্য যেত। তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে বিক্রয়কেন্দ্রটি কার্যত একটি ব্যাংক-এর রূপ ধারণ করে। মানুষ সেখানে প্রচুর অর্থ আমানত রাখতো। তার ইনতিকালের সময় তাঁর নিকট পাঁচ কোটি দিরহাম আমানত জমা ছিল।^{৪১} অর্থ ও ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এ ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে আইনের বহু বিভাগে এমন সব দূরদর্শিতা সৃষ্টি করেছিল, নিছক তাত্ত্বিক

^{৪০}. আল-ইয়াফি‘ঈ, মিরআতুল জ্ঞানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান, খ. ১, পৃ. ৩১০; তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা’ আর রিজাল, খ. ১৯, পৃ. ১০১

^{৪১}. আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ১, পৃ. ২২০

আইনবিদরা যা অর্জন করতে পারতেন না। তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ফিক্‌ শাস্ত্রে তাঁর অবদানের পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পার্শ্ব কাজ-কারবারেও যে তিনি ভীষণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন, তার প্রমাণ হলো, হিজরী ১৪৫, খ্রীস্টাব্দ ৭৬২ সনে আল-মানসুর বাগদাদ নগরের নির্মাণ কাজ শুরু করলে তাকেই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত তিনি এ প্রকল্পের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন।^{৪২}

সততা ও আমানতদারী

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও বিশ্বস্ত। তাঁর ব্যবসায়িক সততা ও আমানতদারীর অনেক ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। যেমন তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন হাফস ইবন 'আবদির রহমান। তাঁর ছেলে আলী ইবন হাফস বর্ণনা করছেন:^{৪৩}

كان أبو حنيفة يجهز عليه، فبعث إليه في رفقة بمناخ وأعلمه أن في ثوب كذا عيباً، فإذا بعته فبين، فباع حفص المناخ ونسى أن يبين، ولم يعلم من باعه، فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمان المناخ كله.

একবার আবু হানীফা (রহ) পণ্য সাজালেন এবং তা হাফসের দায়িত্বে দিয়ে বিক্রয়ের জন্য পাঠালেন। যাবার সময় তাকে বলে দিলেন কিছু কাপড়ে এই ক্রটি আছে। যখন তা বিক্রী করবে, ক্রেতাকে ক্রটির কথা বলে দিবে। হাফস পণ্যগুলো বিক্রি করলেন, কিন্তু ক্রটির কথা বলতে ভুলে গেলেন। যার কাছে পণ্যগুলো বিক্রি করেন তার পরিচয়ও তার জানা ছিল না। (হাফস ফিরে আসলেন।) আবু হানীফা (রহ) বিষয়টি অবগত হয়ে পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ (তা ছিল ৩৫ হাজার দিরহাম) দান করে দেন।

ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির তাদের পণ্য বিক্রয় করার জন্য তাঁর দোকানে এসে দাম কম চাইলে ইমাম নিজে তাদেরকে বলতেন, তোমার এ পণ্যের মূল্য আরো বেশি। তিনি তাদেরকে সঠিক মূল্য দিতেন।^{৪৪}

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তার সমকালীন মনীষীগণ তাঁর তাকওয়া পরহেযগারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দিহ 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলেছেন:^{৪৫}

ما رأيت أحدا أروع من أبي حنيفة، وقد جرب بالسياط والأموال.

^{৪২} ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১০, পৃ. ৯৭

^{৪৩} খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮; তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৩

^{৪৪} আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মাল্কী, খ. ১, পৃ. ২১৯-২২০

^{৪৫} তাহযীব আল-কামাল-ফী আসমা' আর-রিজাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৩

আমি আবু হানীফার (রহ) চেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু মানুষ আর দেখিনি। তাকে চাবুক ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে।

যে সব পদমর্যাদা লাভ করার জন্য মানুষ দৌড়-ঝাপ করে, তিনি কখনো তা গ্রহণ করেন নি। কাযী ইবনু শুবরামা বলেন : ‘দুনিয়া তাঁর পেছনে দৌড়ায় কিন্তু তিনি তার থেকে দূরে সরে যান। আর আমাদের কাছ থেকে তা দূরে সরে যায়, কিন্তু আমরা তার পেছনে ছুটি।’^{৪৬}

‘আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) বলেন :

قدمت الكوفة فسألت عن أروع أهلها، فقالوا: أبو حنيفة.

আমি কুফা আসলাম এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু কে তা জানতে চাইলাম। লোকেরা বললো : আবু হানীফা।

মাককী ইবন ইবরাহীম বলতেন :

جالست الكوفيين فما رأيت منهم أروع من أبي حنيفة.

আমি কুফাবাসীদের সাথে উঠাবসা করলাম। তাদের মধ্যে আবু হানীফার (রহ) চেয়ে আল্লাহভীরু আর কাউকে দেখলাম না।^{৪৭}

খারিজা ইবন মাস‘আব বলেন, খলীফা আল-মানসুর একবার আবু হানীফার (রহ) জন্য দশ হাজার দিরহাম অনুদান বরাদ্দ করেন। সেই অনুদান গ্রহণের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। তিনি আমার সাথে পরামর্শ করলেন। বললেন, যদি আমি এই অনুদান প্রত্যাখ্যান করি তাহলে এই লোকটি আমার উপর ক্ষেপে যাবে, আর যদি আমি তা গ্রহণ করি তাহলে আমি যা অপছন্দ করি তা আমার দীনের মধ্যে ঢুকে যাবে। আমি বললাম: খলীফার দৃষ্টিতে এই অর্থ বিশাল অংকের। আপনাকে যখন তা গ্রহণের জন্য ডাকা হবে, আপনি বলবেন, আমীরুল মু‘মিনীনের পক্ষ থেকে এত অল্প পরিমাণের প্রত্যাশা আমার ছিল না। তাঁকে ডাকা হলো এবং তিনি আমার শেখানো কথাটি বললেন। সাথে সাথে আল-মানসুরের নিকট আমার কথাটি পৌঁছানো হলো এবং তিনি সেই বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশ দিলেন।^{৪৮}

হাসান ইবন যিয়াদ বলেন : আল্লাহর কসম! ইমাম আবু হানীফা (রহ) কখনো কোন আমীরের উপহার-উপঢৌকন তথা হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করেন নি। একবার খলীফা হারুনুর রাশীদ ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) নিকট ইমাম আবু হানীফার (রহ) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন :

আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ (হারামকৃত) জিনিস কঠোরভাবে পরিহারকারী, দুনিয়াদার থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং বেশিরভাগ সময় মৌনতা অবলম্বনকারী মানুষ

^{৪৬}. রাগিব আল-ইসফাহানী, মুহাদ্দারাতু আল-‘উদাবা’, পৃ. ২০৬

^{৪৭}. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৪

^{৪৮}. প্রাগুক্ত

ছিলেন। সব সময় চিন্তা-অনুধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কখনো বাজে কথা বলতেন না। তাঁকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকলে জবাব দিতেন। আমীরুল মু'মিনীন। আমি তো শুধু এতটুকু জানি যে, তিনি নিজের নাকস এবং দীনকে মন্দ কাজ থেকে সংরক্ষণ করতেন এবং মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকতেন। তিনি কখনো কারো চরিত্রের খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করতেন না।^{৪৯}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) বিত্তশালী ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন উদার ও দানশীল। জ্ঞানচর্চার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য দু'হাতে অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়ের লভ্যাংশের একটি বিশেষ অংশ এজন্য পৃথক করে রাখতেন। সেখান থেকে সারা বছর 'আলিম এবং শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। বছর শেষে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাও তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তাদেরকে অর্থ দানকালে বলতেন, আপনারা এ অর্থ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করুন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদেরকে আমার নিজের কাছ থেকে কিছুই দেইনি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি আপনাদের জন্যই আমাকে দান করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক এমন ছিলেন, যাঁদের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) পরিবারের সকল ব্যয়ভারই তিনি নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি তাঁর ছেলেকে জ্ঞানচর্চা থেকে সরিয়ে নিয়ে কোন অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করতে চাইতেন।^{৫০}

খলীফা আল-মানসুর একবার সাক্ষাতের জন্য ইমাম আবু হানীফাকে (রহ) দরবারে আমন্ত্রণ জানালেন। খলীফার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি হাজির হলেন। খলীফা তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের পাশেই বসালেন। তারপর দীর্ঘ সময় দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হলো। ইমাম সাহেব যখন মাজলিস ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিরিশ হাজার দিরহাম ভর্তি একটি থলে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশাল অংকের অর্থ উপহার হিসেবে যিনি দিচ্ছেন তিনি কিন্তু এত দরাজহস্তের মানুষ ছিলেন না। আবু হানীফা (রহ) বিনীতভাবে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন। বাগদাদে আমি একজন আগন্তুক। এই বিপুল অংকের অর্থ রাখার মত স্থান আমার নেই। এ অর্থ আমি নিয়ে গেলে নষ্ট হওয়ার আশংকা করছি। এ অর্থ আপনি বায়তুল মালে রেখে দিন, আমার প্রয়োজন মত আমি আপনার নিকট থেকে চেয়ে নিব। আল-মানসুর সরল বিশ্বাসে ইমাম সাহেবের প্রস্তাব মেনে নিলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই ইমাম আবু হানীফা (রহ) মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল উল্লেখিত অর্থের চেয়ে অনেকগুন বেশি

^{৪৯}. আয-যাহবী, মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৯, ২৬

^{৫০}. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ২৬০; মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ১, পৃ. ২৬২; ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান, খ. ৫, পৃ. ৪২২-৪২৩

মানুষের অর্থ আমানাত হিসেবে তাঁর ঘরে জমা রয়েছে। খলীফা আল-মানসূর একথা শুনে মন্তব্য করেন:

يرحم الله أبا حنيفة، فقد خدعنا، وأبي أن يأخذ شيئا منا، وتلطف في ردنا.

‘আল্লাহ আবু হানীফার (রহ) প্রতি দয়া করুন। তিনি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন। আমাদের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে দারুণ শিষ্টতা দেখিয়েছেন।’^{৫১}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) একজন বৈঠকী বন্ধু একদিন তাঁর দোকানে এসে বললেন : আবু হানীফা! আমার একখানা ‘খায়’ কাপড়ের প্রয়োজন। তিনি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী রং এর? তিনি রং এর বর্ণনা দিলেন। ইমাম সাহেব বললেন, এখন নেই। একটু অপেক্ষা করুন, হাতে এলে আপনার জন্য রেখে দিব। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই কাজিত কাপড় পেয়ে গেলেন। একদিন দেখলেন, সেই বন্ধুটিও পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাকে ডেকে বলেন : আপনার কাপড়টি পাওয়া গেছে। তারপর কাড়পটি তাঁর সামনে মেলে ধরেন। বন্ধুটির খুব পছন্দ হলো এবং দাম কত দিতে হবে তা জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন: এক দিরহাম। বিস্ময়ের সাথে লোকটি বলে উঠলেন, মাত্র এক দিরহাম? ইমাম সাহেব বললেন : হ্যাঁ, এক দিরহাম। লোকটি বললেন : আবু হানীফা, আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। আবু হানীফা (রহ) বললেন : আমি আপনার সাথে ঠাট্টা করছি না। আসলে আমি এই কাপড়টি এবং এর সাথে আরেকটি কাপড় বিশ স্বর্ণমুদ্রা ও এক রৌপ্য মুদ্রাদিয়ে কিনেছিলাম। তারপর দ্বিতীয় কাপড়টি বিশ দিনারে বিক্রী করেছি, এখন এটির মূল্য এক দিরহাম মাত্র বাকী আছে। আর আমি তো বন্ধু ও সাথী-সহচরদের নিকট থেকে লাভ করি না।^{৫২}

একবার একজন বৃদ্ধা ইমাম আবু হানীফার (রহ) দোকানে এসে তার পছন্দনীয় একখানা ‘খায়’ কাপড় চাইলো। তাকে কাপড় দেখানো হলো এবং তার পছন্দ হলো। তখন বৃদ্ধা বললো : আমি একজন বৃদ্ধা মানুষ, কাপড়ের মূল্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। এই কাপড়খানার মূল্যটা আপনার আমানাতদারীর উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার ক্রয়মূল্যের উপর সামান্য কিছু লাভ নিয়ে কাপড়খানা আমাকে দিয়ে দিন। আমি একজন দুর্বল মানুষ।

ইমাম সাহেব বললেন : আমি একসাথে দু’খানা কাপড় কিনেছিলাম। একখানা কাপড় মোট ক্রয়মূল্য থেকে চারদিরহাম কমে বিক্রী করেছি। এখন আপনি বাকী চারদিরহাম দিয়ে কাপড় খানা নিয়ে যান। আপনার নিকট থেকে কোন লাভ নিব না।^{৫৩}

^{৫১}. সুওরুন মিন হায়াত আত-তারিখীন, পৃ. ৪৮৫

^{৫২}. প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮

^{৫৩}. প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৮৮

একদিন তিনি তাঁর এক বৈঠকী বন্ধুর পরনে ময়লা-পুরনো কাপড় দেখতে পেলেন। মাজলিস ভাঙ্গার পর সবাই যখন চলে গেল তখন তিনি সেই বন্ধুকে বললেন : এই জায়নামাযটা উঠাও এবং ওর নীচে যা আছে সবই নিয়ে নাও। লোকটি জায়নামায উঁচু করে দেখলেন ওর নীচে এক হাজার দিরহাম রয়েছে। আবু হানীফা (রহ) তাকে বললেন: এগুলো নিয়ে তুমি তোমার এ দৈন্যদশার পরিবর্তন কর। লোকটি বললো : আমি তো ধনী মানুষ, আল্লাহ আমাকে অর্থবিস্ত দিয়েছেন। এ অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। আবু হানীফা (রহ) তাঁকে বললেন : আল্লাহ যদি তোমাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই অনুগ্রহের প্রকাশ পায় না কেন? তুমি কি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী শোননি:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

‘আল্লাহ তাঁর দান-অনুগ্রহের প্রভাব তার বান্দার উপর দেখতে ভালোবাসেন।’

অতএব এ দৈন্যদশার পরিবর্তন ঘটিয়ে তোমার বন্ধুর দুঃখ দূর করা তোমার উচিত।^{৫৪}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) বদান্যতার আরেকটি চমৎকার রূপ এই যে, তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ কোন অর্থ ব্যয় করলে সমপরিমাণ অর্থ বাইরের অভাবীদের জন্য খরচ করতেন। পরিবারের লোকদের জন্য নতুন পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করলে সমপরিমাণ অর্থের পোশাক গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলি করতেন। যখন তাঁর সামনে খাবার উপস্থাপন করা হতো, যতটুকু তিনি সাধারণত খেতেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ হাত দিয়ে উঠাতেন এবং বেশিটুকু অভাবীদেরকে খাওয়াতেন।

তাঁর সম্পর্কে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর জীবনের একটি অধ্যায় এই অঙ্গীকারের উপর কাটান যে, কথার মধ্যে আল্লাহর নামে কসম করলেই এক দিরহাম সাদাকা করবেন। এক পর্যায়ে সাদাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কসম করলেই এক দীনার সাদাকা করতেন।^{৫৫}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ছিলেন একজন মিষ্টভাষী ও সদাচারী মানুষ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিত জনদের সাথে উঠাবসায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত ও বিনয়ী। শত্রু-মিত্র যেই হোক না কেন কারো গীবত করতেন না, কাউকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। তাঁর সঙ্গী-সহচরদের একজন বলেন, আমি শুনেছি ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) সুফইয়ান আছ-ছাওরীকে (রহ) বলছেন :

يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، فإن ما سمعته يذكر عدوا له بسوء قط.

হে আবু আবদুল্লাহ, গীবত বা পরনিন্দা থেকে কোন জিনিস আবু হানীফাকে

^{৫৪}. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

^{৫৫}. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

দূরে রেখেছে? আমি তাঁর কোন শত্রু সম্পর্কেও খারাপ কোন কথা তাঁকে কখনো উচ্চারণ করতে শুনিনি।

সুফইয়ান আছ-ছাত্তরী (রহ) বলেন :

ان أبا حنيفة أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها.

আবু হানীফা তাঁর ভালো কাজসমূহকে ধ্বংস করে দেয় এমন কোন কিছুকে নিজের উপর বিজয়ী করার ব্যাপারে বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন।

আবু হানীফা (রহ) মানুষের প্রীতি ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য এবং অর্জিত ভালোবাসা স্থায়ী করণের জন্য ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একথা প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মাজলিসে একটু বসতো তাহলে যখন সে যাওয়ার জন্য উঠতে যেত তখন তিনি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। তার যদি অভাব থাকতো, তিনি তা পূরণ করতেন, যদি রোগ থাকতো, সেবা করতেন, প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করতেন। এমন কি পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগও রাখতেন।

হুজর ইবন আবদিল জাব্বার বলেন :

ما رأى الناس أكرم مجالسة من أبي حنيفة، ولا إكراما لأصحابه.

মানুষ আবু হানীফার (রহ) চেয়ে অধিক সম্মানীয় বৈঠক এবং সঙ্গী-সাথীদেরকে অধিক সম্মানদানকারী তাঁর চেয়ে আর কাউকে দেখেনি।

হুজর ইবন আবদিল জাব্বার বর্ণনা করেছেন, একবার আল-কাসিম ইবন মা'নকে বলা হলো, তুমি কি আবু হানীফার চাকর-বাকরদের একজন হতে চাও? মানুষ আবু হানীফার মাজলিসের চেয়ে অধিকতর উপকারী অন্য কারোর নিকট বসেনি। একথা শুনে আল-কাসিম বললেন : ঠিক আছে, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। সেখানে যাওয়ার পর আবু হানীফার (রহ) সঙ্গ আর তিনি ত্যাগ করেন নি। তিনি বলতেন : এই ব্যক্তির মত আর কাউকে আমি দেখিনি। সুলায়মান ইবন আবী শায়খ বলেন : আবু হানীফা (রহ) ছিলেন একজন আল্লাহ ভীরু দানশীল মানুষ।^{৫৬}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ছিলেন বহুগুণে গুণাশ্রিত মানুষ। একজন সত্যিকার আলিমের মধ্যে যেসব গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়, তা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, গভীর চিন্তা ও মননশীল, সুস্বপ্ন অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

তিনি ছিলেন আত্ম-সংযমী, আত্ম-নিয়ন্ত্রণে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী। নিজের আবেগ অনুভূতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রশংসনীয়। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে অবৈধ সম্ভান

বলে গালি দিল। কিন্তু তাতেও তাঁর চেহারায কোন পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। তাঁর মুখে প্রায়ই নিম্নের কথাগুলো উচ্চারিত হতো :

اللهم من ضاق صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له.

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি কারো বক্ষ সংকীর্ণ হলেও তার প্রতি আমাদের অন্তর প্রশস্ত হয়ে গেছে।^{৫৭}

‘আবদুল্লাহ ইবন দাউদ বলতেন :

الناس في أبي حنيفة رجلا : جاهل به و حاسد له.

আবু হানীফার (রহ) (সমালোচনার) ব্যাপারে মানুষ দু'ধরনের : ১. তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ, ২. তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণকারী।^{৫৮}

‘আবদুল্লাহ ইবন দাউদ আরো বলতেন, এই দু'ধরনের মানুষের মধ্যে অজ্ঞ-মূর্খরা অধিকতর ভালো বলে আমি মনে করি।

শুরাইক নামের এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। একদিন ইমাম ওয়াকী' (রহ) ইমাম সাহেবের নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি মাথা নীচু করে চিন্তামগ্ন অবস্থায় আছেন। ইমাম সাহেব ওয়াকী'র (রহ) উপস্থিতি বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে আসছো? ওয়াকী' বললেন : শুরাইকের নিকট থেকে। অতঃপর ইমাম সাহেব নিম্নের শ্লোক দু'টি আবৃত্তি করেন :^{৫৯}

إن يحسد وني فإنني غير لا ثمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم ما ي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد.

তারা আমাকে হিংসা করলে আমি তাদেরকে তিরস্কার করি না। আমার পূর্বে মর্মান্বাদান ব্যক্তিগণকেও হিংসা করা হয়েছে। আমার ও তাদের এ কর্মধারা চিরকাল চলে আসছে এবং আমাদের অধিকাংশ যে রাগ ও রোষ লাভ করে তা সহ মৃত্যুবরণ করেছে।

মুসাবির আল-ওয়াররাক নামক একজন কবি ইমাম আবু হানীফার (রহ) সমালোচনা করতো। একবার একটি কবিতায় সে আবু হানীফাকে (রহ) ‘আহলুর রায়’-যুক্তিবাদী বলে বিদ্রোপ করে। সেই কবিতার দু'টি চরণ নিম্নরূপ :

كنا من الدين قبل اليوم في سعة + حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس

قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم + فاستعملو الرأي عند الفقرو البؤس.

^{৫৭}. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৪২

^{৫৮}. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৬

^{৫৯}. প্রাণ্ড

‘বর্তমান সময়ের পূর্বে আমরা দীনের ব্যাপারে উদারতার মধ্যে ছিলাম। অবশেষে আমরা কিয়াসপন্থী বা যুক্তিবাদীদের দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। যখন তাদের আয়-রোযগার কমে গেল তারা ক্ষুধা দারিদ্রের সময় রায় তথা যুক্তিকে কাজে লাগালো।

কবিতাটি আবু হানীফার (রহ) কানে গেলে তিনি মুসাভির এর সাথে দেখা করে বলেন, তুমি আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছো, আমরা তোমাকে খুশী করবো। তিনি ফিরে এসে তার নিকট বহু দিরহাম পাঠিয়ে দেন। অতঃপর মুসাভির আল-ওয়ারাক আবু হানীফা (রহ)-এর প্রশংসায় একটি কবিতা লেখেন, যার তিনটি শ্লোক নিম্নরূপ :

إذا ما أهل مصر باد هونا + بدهية من الفتيا لطيفة.

أتيناهم بمقياس صحيح + صليب من طراز أبي حنيفة.

إذ سمع الفقيه به حيواه + وأثبتته بحبر في صحيفة.

মিসরবাসী যখন ফাতওয়ার সুস্ব চাতুর্যে আমাদেরকে অবাক করে দিল, আমরা তখন আবু হানীফার পদ্ধতিতে শুদ্ধ-সঠিক ও শক্তিশালী কিয়াস (যুক্তি) সহকারে তাদের নিকট উপস্থিত হলাম। ফাকীহ (আইনবিদ) যখন তা শুনলো, স্বাগতম জানালো এবং কালি দ্বারা পুস্তিকায় লিখে রাখলো।^{৬০}

তাঁর সবর, সহনশীলতা ও উদারতা গুণের অর্থ এই নয় যে, তাঁর অনুভূতি লোপ পেয়েছিল এবং বোধশক্তি দুর্বল ছিল। বরং তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বোধশক্তি সম্পন্ন, অনুভূতিশীল ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। একবার তাঁর এক প্রতিপক্ষ বিতর্ককালে তাঁকে হে বিদ‘আতী, হে যিনদীক (ধর্মত্যাগী) বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি এমন লোক নই। আমি যখন থেকে আল্লাহকে জেনেছি, তখন থেকে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনি। আমি কেবল তাঁরই ক্ষমার আশাবাদী এবং একমাত্র তাঁর শান্তি কে ভয় করি।’ শান্তির কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। লোকটি বললো, আমাকে ক্ষমা করুন। ইমাম সাহেব বললেন, ‘যদি জাহিল অজ্ঞতাবশত আমাকে কিছু বলে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। আর যদি কোন ‘আলিম একাজ করে, তাহলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’^{৬১}

মূলত: তাঁর আবেগ ও অনুভূতি আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ও তাঁর দীনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি মানুষের নোংরা কথা, সমালোচনা ও অশিষ্ট আচরণে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তাঁর মহান শিক্ষক আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে

^{৬০}. প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ১১৫

^{৬১}. ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ), পৃ. ৯২

বলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার, সর্বদা নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকতেন, বেশির ভাগ সময় নীরব থাকতেন। কোন প্রশ্ন করা হলে, জানা থাকলে উত্তর দিতেন। অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। ভোগ-বিলাস ও ঠাট-বাটের সাথে জীবন যাপন করা মোটেই পছন্দ করতেন না। কারো গীবত করতেন না। তিনি পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়নতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধর্ম, সংযম, মায়ের সেবা, শিক্ষকের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি বহু বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন। চরিতকারগণ তাঁর এসব গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।^{৬২}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান অন্বেষণ ক্ষমতা, নেক আমল ও উন্নত নৈতিকতার সাথে অত্যন্ত 'আবিদ, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী) ও কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ ভীতি, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আল্লাহর আনুগত্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন নির্ভিক ও সত্যবাদী।

সারারাত সালাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন

তিনি ছিলেন একজন উঁচু মানের 'আবিদ ও তাহাজ্জুদ গুয়ার মানুষ। সালাতে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) বর্ণিত একটি ঘটনা নিম্নরূপ :^{৬৩}

عن أبي يوسف قال : بينا أنا أ مشى مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لرجل :
هذا أبو حنيفة لا ينالم الدليل، فقال أبو حنيفة : والله لا يتحدث عني لما لم أفعل،
وكان يحبى الليل صلاة ودعاء وتضرعا.

আবু ইউসুফ (রহ) বলেন : আমি আবু হানীফার (রহ) সংগে হাঁটছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলছে : ইনি হলেন আবু হানীফা, যিনি রাতে ঘুমান না। অতঃপর আবু হানীফা বললেন : আল্লাহর কসম। যে কাজ আমি করি না, তা আমার প্রতি আরোপ করে বলা আমি পছন্দ করি না। তারপর সালাত, দু'আ ও (আল্লাহর নিকট) অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দিতেন।

আসাদ ইবন 'আমর বলতেন: আবু হানীফা (রহ) প্রায় চল্লিশ বছর যাবত একই ওজুতে 'ঈশা ও ফজরের সালাত আদায় করেছেন। অধিকাংশ রাতে এক রাক'আতে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করতেন। রাতে তাঁর কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। এমন কি প্রতিবেশীরা তাঁর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা দেখাতো। একথাও তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, যে স্থানটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই ৭০ (সত্তর) হাজার বার কুরআন খতম করেছেন।^{৬৪}

^{৬২}. প্রাণ্ডক, পৃ. ৯৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ১৭৬

^{৬৩}. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৩; তায়কিরাতুল হফাজ, খ. ১, পৃ. ১৬৮

^{৬৪}. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১২

ইমাম আবু হানীফার (রহ) ছেলে হাম্মাদ বলেন : আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা তাঁর গোসল ও কাফন পরানোর জন্য হাসান ইবন 'উমারাকে অনুরোধ করলাম, তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন। গোসল করানোর সময় তিনি এই কথাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করেন :

رحمك الله غفرلك، لم تفطر منذ ثلاثين سنة، ولم يتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة، وقد أتعبت الفقهاء من بعدك و فضحت القراء.

আল্লাহ আপনার প্রতি অনগ্রহ করুন, আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি তিরিশ বছর যাবত দিনে আহার করেননি (সিয়াম পালন করেছেন) এবং চল্লিশ বছর যাবত আপনার ডান পাশ বিছানা স্পর্শ করেনি। আপনার পরবর্তী ফাকীহদেরকে আপনি কষ্টে ও ক্লান্তিতে এবং কারী তথা কুরআনের পাঠকদেরকে লজ্জায় ফেলে গেছেন।^{৬৫}

প্রখ্যাত তারিখি মিস'আর ইবন কিদাম (রহ) বলতেন :^{৬৬}

دخلت ذات ليلة المسجد، فرأيت رجلاً يصلي، فاستمليت قراءته، فقرأ سبعاً، فقلت يركع، ثم قرأ الثلث، ثم النصف، فلم يزل يقرأ القرآن حتى ختمه كله في ركعة، فنظرت فإذا هو أبو حنيفة.

আমি এক রাতে মাসজিদে ঢুকে দেখলাম এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর কিরা'আত অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি কুরআনের এক সপ্তমাংশ পাঠ করলেন। ভাবলাম, এবার রুকু করবেন (না, তা করলেন না)। তিনি এক তৃতীয়াংশ, অতঃপর অর্ধেক পাঠ করলেন। এভাবে কুরআন পড়তে পড়তে একই রাকআতে শেষ করে ফেললেন। আমি গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি, তিনি আবু হানীফা (রহ)।

খারিজা ইবন মুস'আব (রহ) বলতেন :^{৬৭}

ختم القرآن في ركعة أربعة من الأئمة : عثمان بن عفان، وتيم الدارى، وسعيد بن جبر و أبو حنيفة.

ইমামদের মধ্যে চারজন এক রাকআতে কুরআন খতম করেছেন। তাঁরা হলেন : 'উছমান ইবন 'আফফান (রা), তামীম আদ-দারী, সা'ঈদ ইবন জুবায়র ও আবু হানীফা (রহ)।

ইয়াহইয়া ইবন নাসর (রহ) বলেন :^{৬৮}

^{৬৫} সুওরুন মিন হায়াত আত-তারিখীন, পৃ. ৫০৩

^{৬৬} তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১২

^{৬৭} প্রাণ্ড

كان أبو حنيفة ربما ختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة.

আবু হানীফা (রহ) কোন কোন রামাদান মাসে কুরআনের ষাট খতম দিতেন।

শব-বিদারী ও রাত জেগে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মানুষ তাঁকে وتد অর্থাৎ খুঁটি বলতো। অনেক সময় রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে এক রাকআতে একটি মাত্র আয়াত অসংখ্যবার তিলাওয়াত করতেন। বর্ণিত হয়েছে, একবার সালাতে দাঁড়িয়ে নিম্নের আয়াতটি বার বার তিলাওয়াত করতে করতে রাত কাটিয়ে দেন:^{৬৬}

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرُ

অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিজ্ততর।

সেই সাথে এত ব্যাকুলভাবে কাঁদতেন যে, তা শুনে মানুষের মন বিগলিত হয়ে যেত। তিনি যখন সূরা 'আয-যিলযাল' পাঠ করতেন, ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন, দেহে কাঁপুনি দেখা দিত এবং নিজের দাড়ি মুট করে ধরে নিম্নের কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করতেন :

يا من يجزى بمثقال ذرة خير خيرا

ويا من يجزى بمثقال ذرة شر شرا

أجر عبدك النعمان من النار

وأدخله في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين.

ওহে সেই সত্ত্বা, যিনি অনু পরিমাণ সৎকাজ করলে উত্তম প্রতিদান দিবেন!

ওহে সেই সত্ত্বা, যিনি অনু পরিমাণ অসৎকাজ করলে নিকৃষ্ট প্রতিদান দিবেন!

আপনি নু'মানকে আগুন থেকে রক্ষা করুন এবং

তাকে আপনার দয়া-অনুগ্রাহের প্রশস্ত আঙ্গিনায় ঢুকিয়ে নিন-ইয়া আরহামার রাহিমীন।

মাক্কী ইবন ইবরাহীম (রহ) বলেন :

كان جهاده كله إلى قبر.

‘তঁার সকল কর্মতৎপরতা ছিল কবরমুখী।’

তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চলন-বলন ছিল অতি সাদাসিধে। তিনি বলতেন, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মাসে দু'দিরহামের অধিক নয়। কখনো ছাত্ত, কখনো রুটিই যথেষ্ট। সুহাইল ইবন মুযাহিম (রহ) বলেন : আমরা ইমাম সাহেবের গৃহে যেতাম। সেখানে চাটাই ব্যতীত বসার আর কিছুই থাকতো না। তিনি

^{৬৬}. প্রাণ্ডক্ত, খ. ১৯, পৃ. ১১৩

^{৬৭}. ৫৪ : সূরা আল কামার, আয়াত : ৪৬

বলতেন, যদি আমীর-উমারাদের নিকট আমার হাত পাতার আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি একটি দিরহামও সঞ্চয় করে রাখতাম না।^{১০}

তর্কবাগীশ ও যুক্তিবাদী আবু হানীফা (রহ)

ইমাম আবু হানীফা (রহ) তর্ক-বিতর্কে ও যুক্তি উপস্থাপনে ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। যুক্তি-তর্কে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের নিকট কখনো হার মেনেছেন এমন কোন ঘটনার কথা ইতিহাসে জানা যায় না। বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তাঁর দুই একটি বাক যুদ্ধের ঘটনা এবং তাঁর সমকালীন দু'একজন মনীষীর মূল্যায়ন ও মন্তব্য উপস্থাপন করলে এ বিষয়ে তিনি কতখানি পারঙ্গম ও পারদর্শী ছিলেন তা স্পষ্ট হবে।

একদিন ইমাম মালিক (রহ) তাঁর সঙ্গী-সহচর পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা আছেন। এমন সময় সেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহ) উপস্থিত হলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর চলে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর ইমাম মালিক (রহ) তাঁর বৈঠকে উপস্থিত সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেন : এই ব্যক্তি কে তা কি তোমরা জান? তারা বললেন : না। তিনি বললেন : ইনিই হলেন আন-নু'মান ইবন ছাবিত। তিনি যদি বলেন মাসজিদের এই খুঁটিটি সোনার তাহলে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তা সোনা পরিণত করে ছাড়বেন।^{১১}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) যুক্তি-তর্কে দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও জোরালো উপস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম মালিক (রহ) যে মন্তব্য করেছেন তা মোটেও অতিরঞ্জিত নয়। তিনি যদি শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে মাটিকে সোনা পরিণত করতে পারেন, প্রতিপক্ষকে মানতে বাধ্য করতে সক্ষম হন, তাহলে সত্যকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি কতখানি তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইতিহাস থেকে এখানে মাত্র দু'টি ঘটনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

কুফায় একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছিল। কিছু মানুষ তাকে মানতো ও তার কথা শুনতো। সে বিশ্বাস করতো এবং বলে বেড়াতো যে, 'উছমান ইবন 'আফফান (রা) আসলে ইহুদী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেন নি। উল্লেখ্য যে, 'উছমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই মেয়ের স্বামী ছিলেন। প্রথম মেয়ের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করেন। এ কারণে মুসলিম উম্মাহ তাকে 'যী আন-নুরাইন' (দু' জ্যোতির অধিকারী) উপাধি দান করেছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ। এমন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখিত ব্যক্তি ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো।

^{১০}. সুওয়াবুন মিন হায়াত আভ-তাবি'ঈন, পৃ. ৪৯৩

^{১১}. প্রাণ্ডজ, পৃ. ৪৯৪

কথাটি ইমাম আবু হানীফার (রহ) কানে গেল। তিনি একদিন লোকটির বাড়িতে গেলেন এবং কথা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে বললেন, আমি আপনার নিকট এসেছি মূলত: আমার এক ছাত্রের সাথে আপনার অমুক মেয়ের বিয়ের একটা প্রস্তাব নিয়ে। লোকটি বললো: আপনাকে স্বাগতম, আপনার আগমন শুভ হোক! আবু হানীফা, আপনার মত মানুষের উদ্দেশ্যে অপূর্ণ থাকে না। তবে পাত্রটির পরিচয় কি?

ইমাম সাহেব বললেন : পাত্র বিদ্বৎশালী এবং সমাজে মান-মর্যাদার অধিকারী। উদার হৃদয় ও দানশীল। সালাতের এক রাকআতেই রাত কেটে যায় এবং আল্লাহর ভয়ে অত্যধিক ক্রন্দনশীল।

লোকটি বললো: আবু হানীফা। হয়েছে, হয়েছে। এতটুকুই যথেষ্ট। পাত্রের যে গুণ-বৈশিষ্ট্য আপনি বর্ণনা করলেন, তাতে তো মনে হয় সে আমীরুল মু'মিনীনের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র হবে।

এরপর আবু হানীফা (রহ) বললেন : তবে পাত্রটির একটা দোষ আছে তাও আপনার জানা দরকার। দোষটি কি? বললেন : সে ইহুদী। লোকটি হতাশার সুরে বললো : ইহুদী? আবু হানীফা, আপনি কি মনে করেন, একটা ইহুদী পাত্রের সাথে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিব? আল্লাহর কসম! পৃথিবীর যাবতীয় গুণের অধিকারী হলেও আমি কোন ইহুদী পাত্রের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিব না।

এবার আবু হানীফা (রহ) বললেন : তুমি একটা ইহুদী পাত্রের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং অত্যন্ত শক্তভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছো। অথচ তুমিই মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস ছড়াচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'টি মেয়েকে ইহুদী পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

লোকটির দেহে কম্পন সৃষ্টি হলো। কাঁপা গলায় সে বলে উঠলো : আমি যেসব বাজেকথা বলেছি সেজন্য আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইসতিগফার করছি।^{৭২}

ইসলামের ইতিহাসে চরমপন্থী যে সকল উপদলের কথা জানা যায় তাদের একটি হলো খারেজী সম্প্রদায়। তাঁরা 'আলীর (রা) পক্ষে উট ও সিফফীন যুদ্ধ করেছিল। সিফফীনে আবু মুসা আল-আশ'আরী ও 'আমর ইবনুল আসকে (রা) বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য শালিস নিযুক্ত করায় তাঁরা 'আলীর (রা) পক্ষ ত্যাগ করে 'আলী মু'আবিয়া (রা) উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মূলত: তারা এই শালিস নিয়োগকে সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী বলে ঘোষণা করে। তারা এই বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে শালিস মানা যাবে না, কারো হুকুম পালন করা যাবে না। তাদের এই উগ্র মতবাদ ও হঠকারী

^{৭২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬

কর্মকাণ্ডের ফলে বহু মুসলিমের রক্ত ঝরেছে। ইসলামের ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে।

আদ-দাহহাক আশ-শারী নামক একজন উগ্রপন্থী খারিজী একদিন ইমাম আবু হানীফার (রহ) নিকট আসলো। কুশল বিনিময়ের পর তাদের মধ্যে নিম্নের সংলাপটি হলো :

খারিজী : আবু হানীফা, আপনি তাওবা করুন।

আবু হানীফা : কিসের জন্য তাওবা করবো?

খারিজী : ‘আলী ও মু‘আবিয়ার (রা) মধ্যে যে তাহকীম তথা শালিস নিযুক্ত করা হয়েছিল তা বৈধ বলার কারণে।

আবু হানীফা : আপনি কি এ ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করতে রাজি আছেন?

খারিজী : হ্যাঁ, রাজি আছি।

আবু হানীফা : এই বিতর্কে যদি আমাদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে ফায়সালা করবে কে?

খারিজী : আপনি যাকে ইচ্ছা শালিস (বিচারক) মনোনীত করুন।

এবার আবু হানীফা (রহ) আদ-দাহহাক আশ-শারীর সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিই আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তারপর আশ-শারীকে বললেন : আমি আপনার সঙ্গীকে শালিস মেনেছি, আপনি মানতে রাজি?

খারিজী বললো : হ্যাঁ, রাজি। তার চেহারায় সন্তুষ্টির আভা ফুটে উঠলো।

আবু হানীফা (রহ) এবার বললেন : আপনার অকল্যাণ হোক! আপনার ও আমার মধ্যে যে ঝগড়া ও মত পার্থক্য হবে তা মীমাংসার জন্য শালিস মানা বৈধ মনে করছেন, আর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু’জন সাহাবীর মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসার জন্য শালিস মানা অবৈধ বলছেন?

আদ-দাহহাক আশ-শারী হতভম্ব হয়ে গেল, তার মুখ থেকে আর কোন কথা বের হলো না।^{৭০}

ইসলামে আরেকটি বিভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী উপদলের নাম হলো ‘জাহমিয়া’। এর নেতা হলো জাহ্ম ইবন সাকফওয়ান। ইসলামী বিশ্বে বিদ‘আতী ও বিভ্রান্তিকর কথা ছড়ানোর একজন পুরোধা ছিল সে। সে বলতো যে, কেবল অন্তরে বিশ্বাসের নামই হলো ঈমান, মুখে স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন নেই। সে একবার কিছু বিষয়ে আলোচনার জন্য ইমাম আবু হানীফার (রা) নিকট আসে। তখন তাঁদের মধ্যে একটি বাকযুদ্ধ হয়, যা বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

- জাহ্ম : কয়েকটি বিষয়ে আপনার সাথে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আমি এসেছি।
- আবু হানীফা : তোমার সাথে কথা বলা লজ্জার ব্যাপার এবং তুমি যে সব বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছো তাতে নিবিষ্ট হওয়া জুলন্ত আগুনে ঝাপ দেওয়ার শামিল।
- জাহ্ম : আপনার সাথে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ, আপনি আমার কোন কথাও শোনেন নি, অথচ আপনি আমার ব্যাপারে এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন কিভাবে?
- আবু হানীফা : তোমার অনেক কথা ও মতামত আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা কোন মুসলিমের মুখ থেকে বের হতে পারে না।
- জাহ্ম : আপনি আমার অনুপস্থিতিতেই আমার বক্তব্য না শুনে আমার বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছেন?
- আবু হানীফা : তোমার এসব অভিমত সুপ্রসিদ্ধ, মানুষের মাঝে প্রচলিত এবং সাধারণ অসাধারণ সব মানুষই তা জানে। সুতরাং অসংখ্য মানুষের মুখ থেকে তোমার যে সব মতামত আমার কাছে পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতা আমার আছে।
- জাহ্ম : আমি আপনাকে শুধু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই।
- আবু হানীফা : তুমি এখনও পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ জানতে পারনি যে, সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়লো?
- জাহ্ম : অবশ্যই জেনেছি। তবে ঈমানের একটি বিশেষ ধরন সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তা দূর করতে চাই।
- আবু হানীফা : ঈমানের মাঝে সন্দেহ-সংশয় কুফরীর নামান্তর।
- জাহ্ম : যে সব কথার কারণে একজন মানুষকে কাকির বলা যায়, তার কোন কিছু আমার মুখ থেকে না শুনে আমার প্রতি কুফরী আরোপ করা আপনার জন্য সঙ্গত হবে না।
- আবু হানীফা : বল, কি জানতে চাও?
- জাহ্ম : এক ব্যক্তি তার অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনলো এবং জানলো যে, তিনি এক, একক, তাঁর সমতুল্য ও শরীক নেই, তাঁর গুণাবলীও সে অবগত, তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই-একথা সে ব্যক্তিও মানে, তবে এসব মুখে স্বীকার ব্যতীতই মারা গেল। এ ব্যক্তির মৃত্যু কি মু'মিন অবস্থায়, না কাকির অবস্থায় হলো?
- আবু হানীফা (রহ) দৃঢ়তার সাথে নিম্নের কথাগুলো বলেন :

يَمُوتُ كَافِرًا، وَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِذَا لَمْ يَصْرَحْ بِلِسَانِهِ عَمَّا عَرَفَهُ بِجَنَانِهِ،
مَالَمْ يَمْنَعَهُ مِنَ التَّصْرِيعِ بِاللِّسَانِ مَانِعٌ.

সে ব্যক্তির মৃত্যু হবে কাকির অবস্থায় এবং সে হবে জাহান্নামী। যদি না অন্তরে
যা জেনেছে মুখে তার ঘোষণা দেয়, আর যদি না মুখে ঘোষণা দানে কোন
বাধা থাকে।

জাহ্নম : সে কিভাবে মু'মিন হবে না, অথচ সে আল্লাহকে সটিক ভাবেই জেনেছে?

আবু হানীফা : যদি তুমি আল-কুরআনে বিশ্বাসী হও এবং ইসলামী শারী'আতের হুজ্জাত
(দলীল-প্রমাণ) বলে গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমার সাথে আল-কুরআন
দিয়েই কথা বলবো। আর যদি তুমি আল-কুরআনে বিশ্বাসী না হও এবং
হুজ্জাত বলে স্বীকার না কর, তাহলে আমি একজন ইসলাম বিরোধীর সাথে
যেভাবে কথা বলি তোমার সাথেও সেভাবে কথা বলবো।

জাহ্নম : আমি আল-কুরআনে বিশ্বাসী এবং একে হুজ্জাত হিসেবে মানি।

আবু হানীফা : আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীন ঈমানকে অন্তর ও জিহবা দু'টি অঙ্গের সাথে
সম্পৃক্ত করেছেন, একটির সাথে নয়। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে এর বহু প্রমাণ ছড়িয়ে
আছে।

যেমন আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীন বলেন :^{৭৪}

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ . فَأَنذَرْنَاهُمْ اللَّهَ
بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُخْسِنِينَ.

রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন তারা যে সত্য
উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা
বলে, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি
আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।

আল্লাহ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে

পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি, ‘আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়নদের অন্তর্ভুক্ত করুন?’

এবং এই কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এই হলো সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

তারা অন্তর দ্বারা সত্যকে জেনেছিল এবং জিহ্বা দ্বারা তার স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারা মুখে যে স্বীকৃতি দিয়েছিল তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করেন, যার তলদেশে নদী-প্রবাহিত। এ আয়াতে অন্তরে বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতিকে ঈমানের শর্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ রাসূল ‘আলামীন আরো বলেন :^{৭৫}

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ‘ঈসমাইল, ইসহাক, ইয়া’কুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ‘ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পনকারী।

আল্লাহ রাসূল ‘আলামীন তাদেরকে মুখে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু অন্তরে উপলব্ধি ও জানাকে যথেষ্ট বলেন নি।

এখন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী শোন :

قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا.

তোমরা বল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফলকাম হবে।

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করবে। শুধু অন্তরে জানলেই সফলকাম হবে, তা কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন নি। বরং তার সাথে মুখে স্বীকৃতিও যুক্ত করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন :

يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

যে ব্যক্তি মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে কিন্তু বলেন নি, অন্তরে আল্লাহকে জানলে ও

উপলব্ধি করলেই জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে। যদি মুখে স্বীকৃতির প্রয়োজন না হতো এবং কেবল অন্তরে জানাই যথেষ্ট হতো তাহলে শয়তান ইবলীসও একজন বড় ঈমানদার হয়ে যেত। কারণ, সে তার রবকে জানে। সে এও জানে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে মারবেন, তাকে আবার জীবিত করবেন এবং তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেছেন। আল্লাহ ইবলীসের কথাগুলো বর্ণনা করেছেন এভাবে :

ইবলীস বলেছিলো :^{৭৬}

...خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.

আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

...رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي...

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন।^{৭৭}

قَالَ رَبُّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ.

সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।^{৭৮}

উল্লেখিত আয়াতগুলিতে দেখা যাচ্ছে, ইবলীস জানতো ও বিশ্বাস করতো, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, জীবন দানকারী, জীবন সংহারকারী এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মু'মিন হতে পারেনি কেন?

যদি শুধু আল্লাহর পরিচিতি জানা ও উপলব্ধিই ঈমান হতো তাহলে বহু কাফির মু'মিন বলে স্বীকৃতি পেত। কারণ, তারা মুখে তাদের রব বা প্রতিপালককে অস্বীকার করলেও অন্তরে বিশ্বাস করতো। যেমন আল্লাহ বলেন।^{৭৯}

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا...

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি অস্বীকার করে যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।

এই আয়াতে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মু'মিন বলা হলো না। কারণ, তারা মুখে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ রাক্বুল 'আলামীন আরো বলেছেন :^{৮০}

...يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ...

তারা তোমাকে এমনভাবে চেনে যেমনি তাদের সন্তানদের চেনে।

এ আয়াত দ্বারাও জানা যাচ্ছে, অস্বীকারকারীদের নবী কারীমকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

^{৭৬} ৭ : সূরা আল 'আরাফ, আয়াত : ১২

^{৭৭} ১৫ : সূরা আল হিজর, আয়াত : ৩৯

^{৭৮} প্রাণ্ড-৩৬

^{৭৯} ২৭ : সূরা আন নামল, আয়াত : ১৪

^{৮০} ২ : সূরা আল বাকার, আয়াত : ১৪৬

সাল্লাম) জেনে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল না, যখন তারা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতকে মানছিল না এবং তারা এই বাস্তবতাকে গোপন করে রেখেছিল এবং অস্বীকার করে যাচ্ছিল।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এভাবে একের পর এক কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল উপস্থাপন করে চলছিলেন, আর ওদিকে জাহ্মের চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব ও হতাশার ছাপ ফুটে উঠছিল। “আপনি আমাকে একটি জিনিস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি ভুলে বসেছিলাম। আমি আবার আপনার কাছে আসবো।” একথা বলে জাহ্ম আবু হানীফার (রহ) সামনে থেকে উঠে চলে যায়। সে আর কোন দিন ফিরে আসেনি।^১

একবার নাস্তিকদের একটা ছোট্ট দল যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, আবু হানীফার (রহ) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, বিভিন্ন ধরনের মালামাল বোঝাই একটি জাহাজ গভীর সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ ও প্রবল বাতাসের মধ্যে রয়েছে, তবে তা ধীর স্থিরভাবে নির্দিষ্ট পথে চলছে, কোন রকম অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও বিচ্যুতি ছাড়াই শান্তভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সেই জাহাজটির ক্যাবিনে কোন নাবিক নেই, নেই কোন গতিপথ নির্ধারণকারী-এই জাহাজটি সম্পর্কে তোমরা কী বল? এ রকম একটি জাহাজের চিন্তা কি সঠিক?

তারা বললো : না, সঠিক নয়। বিষয়টি এমন যা কোন সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করে না এবং যা কল্পনাও করা যায় না।

ইমাম সাহেব বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন : ইয়া সুবহানাল্লাহ! তারপর বললেন: নাবিক ছাড়া গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজ সঠিকভাবে চলতে পারে, এমন কথা তোমরা বিশ্বাস করছো না; অথচ তোমরা বিশ্বাস করো সাগর-মহাসাগরে পূর্ণ, জীব-জন্তুতে ভরা এ পৃথিবী এবং চলমান গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকা রাজিতে পরিপূর্ণ মহাশূন্য কোন স্রষ্টা ও চালক ছাড়াই সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তোমাদের এবং তোমরা যে মিথ্যার উপর আছো তার ধ্বংস হোক।^২

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপার ইমাম আবু হানীফার (রহ) মতামত

রাজনীতির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ) অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তাঁর সে অভিমত ব্যাপ্ত ছিল। কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে তাঁর সে অভিমত ছিল অন্যান্য ইমামদের থেকে ভিন্ন। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত সংক্ষেপে উপস্থাপন করবো।

১. সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্র বিষয়ক যে কোন দর্শন নিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন, তাতে একটি মৌলিক প্রশ্ন

^১: সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন, পৃ. ৪৯৮-৫০১

^২: প্রাণ্ড, পৃ. ৫০২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ১০, পৃ. ১০৭

হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব কার? এ ক্ষেত্রে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত মতের মত ইমাম আবু হানীফার (রহ) মতটি ছিল অভিন্ন। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কেবল আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের অধিকারী। আল্লাহ ও রাসূলের বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ সার্বিক বিধান যার মুকাবিলায় আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলে না। যেহেতু তিনি একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাই এ বিষয়টিকে রাষ্ট্র দর্শনের পরিবর্তে আইনের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

আমি সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহর অনুসরণ করবো। যদি তাতে কোন নির্দেশ না পাই তাহলে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর অনুসরণ করবো। যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ রাসূলিল্লাহতে নির্দেশ না পাই, তাহলে সাহাবীদের কথার অনুসরণ করবো। তাঁদের মধ্যে মতভেদের ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছামত কারো কথা গ্রহণ করবো, কারো কথা বর্জন করবো। তবে তাঁদের সকলের কথা ছেড়ে অন্য কারো কথা গ্রহণের দিকে যাব না। যদি তাঁদের কারও কোন কথা পাওয়া না যায় এবং বিষয়টি ইবরাহীম আন-নাখাঈ, আশ-শাবী, ইবন সীরীন, হাসান আল-বাসরী, ‘আতা’, সাঈদ ইবন আল-মুসায্যিব পর্যন্ত পৌঁছে, সে ক্ষেত্রে তাঁরা সকলে ছিলেন মুজতাহিদ। আমি তাঁদের মত ইজতিহাদ করবো, যেমন তাঁরা করেছিলেন।^{৮০}

তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে চূড়ান্ত সনদ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অকীদা ছিল, আইনানুগ সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। তাঁর মতে কিয়াস ও ব্যক্তিগত মতামত দ্বারা আইন প্রণয়নের সীমা সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন বিধান বর্তমান নেই। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের মতামতকে অন্যান্যদের মতামতের উপর তিনি যে অগ্রাধিকার দিতেন, তার কারণ হলো, সাহাবীর জ্ঞানের উৎস হয়তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি যে মতটি ব্যক্ত করছেন, বা যে কাজটি করছেন, তা হয়তো খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অর্জিত। তাই যে সব ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তিনি কঠোরভাবে কোন একজন সাহাবীর মত অনুসরণ করতেন। সকল সাহাবীর মতের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতেন না। কারণ, এতে জেনে-শুনে সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণের আশংকা ছিল। অবশ্য কোন সাহাবীর মত বা কাজটি সুন্নাহর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, তা তিনি কিয়াস দ্বারা নির্ণয় করার চেষ্টা করতেন।

^{৮০}. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৮; তাহযীব আত-তাহযীব, খ. ১, পৃ. ৪৫১; তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৭

২. খিলাফত বা রাষ্ট্র-ক্ষমতা গ্রহণ বা লাভের সঠিক পন্থা

খিলাফত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ) যে মত পোষণ করতেন তা হলো, প্রথমে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করার পর প্রভাব খাটিয়ে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণের কোন বৈধতা নেই। মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্মতি এবং পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতই সত্যিকার খিলাফত। এমন এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি এ মত ব্যক্ত করেন, যখন এমন কথা মুখে উচ্চারণকারীর ঘাড়ে মাথা থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসুর এর সেক্রেটারী রাবী' ইবন ইউনুসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। খলীফা আল-মানসুর একদিন ইমাম মালিক, ইবনু আবী যি'ব ও আবু হানীফা (রহ) কে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা হাজির হলে খলীফা বলেন : অল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের মধ্যে আমাকে এ শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন, এ ব্যাপারে আপনাদের কি মত? আমি এর যোগ্য?

ইমাম মালিক (রহ) বলেন : আপনি এর যোগ্য না হলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করতেন না।

ইবনু আবী যি'ব (রহ) বলেন : 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দুনিয়ার রাজত্ব দান করেন। কিন্তু পরকালের রাজত্ব তিনি তাকে দান করেন, যে তা কামনা করে এবং এজন্য আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন। আপনি আল্লাহর আনুগত্য করলে আল্লাহর তাওফীক আপনার নিকটতর হবে। আর অবাধ্যতা করলে তাঁর তাওফীক আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আসল কথা হলো, আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে খিলাফত নিষ্পন্ন হয়। আর যে ব্যক্তি নিজে খিলাফত অধিকার করে তার মধ্যে কোন তাকওয়া-আল্লাহভীতি নেই। আপনি এবং আপনার সহায়করা আল্লাহর তাওফীক থেকে দূরে এবং সত্যচ্যুত। এখন আপনি যদি আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করেন, পরিচ্ছন্ন কর্ম দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করেন, তাহলে এ জিনিসটি আপনার ভাগ্যে জুটবে। অন্যথায় আপনি নিজেই নিজের শিকার হবেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, ইবনু আবী যি'ব যখন একথা বলছিলেন, তখন আমি এবং মালিক (রহ) নিজ নিজ কাপড় গুটিয়ে নিছিলাম এই আশংকায় যে, এখনই হয়তো তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তাঁর রক্তের ছিটা আমাদের কাপড়ে পড়বে। অতঃপর মানসুর ইমাম আবু হানীফার (রহ) দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি মত? জবাবে তিনি বলেন :

দীনের খাতিরে সত্য পথের সন্ধানী ব্যক্তি ক্রোধ থেকে দূরে থাকে। আপনি নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন যে, আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ডাকা হয়নি বরং আপনি চাচ্ছেন আমরা আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী কথা বলি। আমাদের কথা জনগণের সামনে আসুক, জনগণ জানুক কি বলি। সত্য এই যে, আপনি এমন পন্থায় খলীফা হয়েছেন যে, আপনার খিলাফতের ব্যাপারে মতামত দানের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু'জনের

ঐক্যমতও সৃষ্টি হয়নি। অথচ মুসলিমদের ঐক্যমত ও পরামর্শক্রমেই খিলাফত সম্পন্ন হয়। আবু বাকর আস্ সিদ্দীক (রা) ইয়ামনবাসীদের বাই'আত না আসা পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'মাস সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

একথাগুলো বলে তিনজনই উঠে পড়েন। তাঁদের পিছনে খলীফা মানসুর রাবী'কে দিরহাম ভর্তি তিনটি থলি দিয়ে তাঁদের নিকট পাঠান। তাঁকে বলে দেন, মালিক তা গ্রহণ করলে তাঁকে তা দিয়ে দেবে। কিন্তু আবু হানীফা ও ইবনু আবী যি'ব তা গ্রহণ করলে তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। ইমাম মালিক তা গ্রহণ করেন, ইবনু আবী যি'ব একথা বলে তা ফিরিয়ে দেন যে, আমি মানসুরের জন্যও তো এ অর্থ হালাল মনে করি না, নিজের জন্য তা কি করে হালাল মনে করি? আর ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, আমার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হলেও আমি এ অর্থ স্পর্শ করবো না। রাবী'র মুখে তাঁদের এ বক্তব্য শুনে মানসুর মন্তব্য করেন, এ নিস্পৃহতা তাদের দু'জনের জীবন রক্ষা করেছে।^{৮৪}

৩. খিলাফত লাভের যোগ্যতার শর্ত

ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর যুগ পর্যন্ত খিলাফতের যোগ্যতার শর্তাবলী ততটা সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি যতটা পরবর্তী কালের গবেষক আল-মাওয়ার্দি, ইবন খালদুন প্রমুখ লেখক-গবেষক বর্ণনা করেছেন। কারণ, এর অধিকাংশ শর্তই তখন প্রায় বিনা আলোচনায়ই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। যথা মুসলিম হওয়া, পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া (দাস না হওয়া), জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, এবং দৈহিক ক্রটিমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য দু'টি বিষয় তখন আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এক : অত্যাচারী এবং পাপাচারী ব্যক্তি (যালিম ও ফাসিক) বৈধ খলীফা হতে পারে কিনা? দুই : খলীফা হওয়ার জন্য কুরায়শী হওয়া প্রয়োজন কিনা? যেমন ইবন খালদুন বলেন :

أما شروط هذا المنصب فهي أربعة : العلم والعدالة والكفاية و سلامة
الحواس والأعضاء، لما يؤثر في الرأي والعمل.

এই পদের জন্য শর্ত হলো চারটি : জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, পারদর্শিতা এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কিছু থেকে সুস্থ্য-সঠিক থাকা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলে।

অবশ্য দু'টি বিষয় তখন আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তা হলো:

১. খিলাফতের জন্য কুরায়শ বংশীয় হওয়া প্রয়োজন কিনা?
২. পাপাচারী এবং যালিম ব্যক্তি বৈধ খলীফা হতে পারে কিনা? যেমন ইবন খালদুন বলেন :

^{৮৪}. আল-কারদারী, মানাকিব আল-ইমাম আল আ'জাম, খ. ২, পৃ. ১৫-১৬

واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي

পঞ্চম শর্তটির ব্যাপারে মত পার্থক্য হয়েছে, আর তা হলো কুরায়শ বংশীয় হওয়া।^{৬৫}

পাপাচারী ও যালিম ব্যক্তির খিলাফত

ফাসিক তথা পাপাচারীর নেতৃত্ব বা খিলাফত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার (রহ) মতামতের দু'টি দিক রয়েছে, যা ভালোভাবে বুঝা প্রয়োজন। তিনি যে সময়ে এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন, বিশেষ করে ইরাকে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তা ছিল দু' চরমপন্থী মতবাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব সংঘাতের যুগ। এক দিকে বলা হচ্ছিল যালিম ফাসিকের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ অবৈধ। এ নেতৃত্বের অধীনে মুসলিমদের কোন সামাজিক কাজও নির্ভুল হতে পারে না। অপর দিকে আরেকটি মত ছিল যে, যালিম ফাসিক যে কোন ভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করুক না কেন, তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যায়। এ দু'চরম মতবাদের মাঝামাঝি ইমাম আবু হানীফা (রহ) একটি ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন উপস্থাপন করেন। তাঁর সে দর্শনের সার কথা নিম্নরূপ:

‘আল-ফিকহ আল- আকবর’ গ্রন্থে তিনি বলেন: ‘পাপী ও সত্যনিষ্ঠ যে কোন মু'মিনের পিছনে সালাত আদায় যায়। একথাটিই ইমাম আভ-যাহাবী (রহ) বলেছেন এভাবে:^{৬৬}

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم.
কিবলায় বিশ্বাসী (আহলুল কিবলা) সকল সত্যনিষ্ঠ ও পাপাচারী ব্যক্তির
পিছনে সালাত আদায় আমরা বৈধ মনে করি। তেমনিভাবে বৈধ মনে
করি তাদের কেউ মারা গেলে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা।

এটা আলোচ্য বিষয়ের একটি দিক। অপর দিক হচ্ছে, তাঁর মতে, খিলাফতের জন্য ‘আদালত’ (সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠতা) অপরিহার্য শর্ত। কোন যালিম-ফাসিক ব্যক্তি বৈধ খলীফা, কাজী, শাসক বা মুফতী হতে পারে না। এমন ব্যক্তি কার্যত: অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিমগণ তার অধীনে তাদের সামাজিক জীবনে যেসব কাজ শরীয়াতের সঠিক বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করবে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে, তার নিয়োগকৃত বিচারক ন্যায়ত যেসব বিচার-ফয়সালা করবে, তা জারী হবে, এটা স্বতন্ত্র কথা। তিনি আরো বলেন, যে ইমাম ফাই অর্থাৎ জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ব্যবহার করে, অথবা নির্দেশে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তার ইমামত সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ব্যবহার করে, অথবা নির্দেশে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তার ইমামত কর্তৃত্ব বাতিল। তার নির্দেশ বৈধ নয়।^{৬৭}

এসব বক্তব্য গভীরভাবে অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইমাম আবু হানীফা (রহ)

^{৬৫} ইবনু খালদুন, আল-মুকদ্দিমা, পৃ. ১৯১

^{৬৬} শারহ আকীদাহ আভ-ভাহারিয়া, পৃ. ৪২১; মুত্তা ‘আলী কারী, শারহ ফিকহিল আকবর, পৃ. ৯১

^{৬৭} আস-যাহাবী, মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ১৭; আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, মানাকিব, খ. ২, পৃ. ১০০

একদল খারিজী ও মু'তাযিলাদের বিপরীতে ভিন্ন একটি অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের মতে 'আদালত' গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া না গেলে খলীফার কোন প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ সমবেতভাবে ন্যায়বিচার ও আল্লাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করবে। মূলত তাদের এই মতামত দ্বারা ন্যায়পরায়ণ এবং যোগ্য ইমামের অনুপস্থিতিতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হবে এবং মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে পড়া অবধারিত হবে। তখন কাজী থাকবে না, জুমু'আ-জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হবে না। মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন কাজই ঠিকভাবে চলবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ ভ্রান্তির অপনোদন করেছেন এভাবে যে, ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যে ব্যক্তিই মুসলিমদের ইমাম হবে, তার অধীনে গোটা মুসলিম সমাজ জীবনের পুরো ব্যবস্থাপনা বৈধভাবে চলতে থাকবে। সে ইমামের কর্তৃত্ব যথাস্থানে বৈধ না হলেও তা অব্যাহত থাকবে।

মু'তাযিলা ও খারিজীদের চরমপন্থার মুকাবিলায় মুরজিয়া এবং আহলুস সুন্নাহর কোন কোন ইমামও যে স্বতন্ত্র এক চরম পন্থা অবলম্বন করেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ) মুসলিমদেরকে তা এবং তার পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। তারাও কার্যত এবং আইনত: এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। ফাসিকের কার্যত: কর্তৃত্বকে তারা এমনভাবে বৈধ প্রতিপন্ন করে যেন তাই আইনত- এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মুসলিমরা অত্যাচারী-অনাচারী এবং দুরাচারী শাসনকর্তাদের শাসনে নিশ্চুপ-নিশ্চিন্ত বসে পড়তো। তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা তো দূরের কথা, তারা চিন্তাও ত্যাগ করতো। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করে এ সত্য ঘোষণা করেন যে, এমন লোকদের ইমামত বা কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বাতিল।

খিলাফতের জন্য কুরায়শ বংশীয় হওয়ার শর্ত

এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ) অভিমত এই ছিল যে, খলীফাকে কুরায়শ বংশীয় হতে হবে। এটা কেবল তাঁরই নয় বরং আহলুস সুন্নাহর ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত।^{১৫} যেমন ইবন খালদুন বলেছেন:^{১৬}

وأما النسب القرشي فلا جاع الصحابة يوم السقيفة على ذلك.

আর কুরায়শ বংশীয় হওয়ার শর্তটি, তা হয়েছে সাকীফা-ই-বাণী সা'ইদার দিন সাহাবায়ে কিরামের ইজমা'র ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত দিনে প্রথম খলীফা আবু বাকরের (রা) বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়। এর কারণ কেবল এই ছিল না যে, ইসলামী খিলাফত কেবল একটি গোত্রের শাসনতান্ত্রিক অধিকার।

^{১৫}. কিতাবুল মিলাল ওয়ান লিহাল, খ. ১, পৃ. ১০৬; আল-ফারকু বায়না আল ফিরাক, পৃ. ৩৪০

^{১৬}. ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ১৯২

বরং এর আসল কারণ ছিল তৎকালীন পরিস্থিতি। তখন মুসলিম উম্মাহকে সংঘবদ্ধ রাখার জন্য খলীফার কুরায়শী হওয়া জরুরী ছিল। ইবন খালদুন একথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এভাবে :^{৯০}

... إذا كان الأمر في قریش، لأنهم قادرون على سوق الناس بعضا الغلب إلى مايراد منهم، فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة، لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها، فاشتراط نسبهم القرشى في هذا المنصب، وهم أهل العصية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة و اتفاق الكلمة.

খিলাফত যদি কুরায়শদের মধ্যে থাকে, তাহলে কোন বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা হতে পারবে না। কারণ, তারা গোত্রীয় ঐক্য ও শক্তির বলে মানুষকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করতে সক্ষম। কারো বিরুদ্ধাচারণের আশংকা যেমন ছিল না, তেমনি ছিলনা অনৈক্য সৃষ্টিরও। কারণ তখন তারা তা দমন করতে ও মানুষকে বিরত রাখতে সক্ষম ছিল। সুতরাং খলীফার এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কুরায়শ বংশীয় হওয়ার শর্ত করা হয়। কারণ তখন তারা শক্তিশালী গোত্রীয় ঐক্যের অধিকারী ছিল। আর সে জন্য তারা মুসলিম মিল্লাতকে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করতে সর্বাধিক যোগ্য ছিল।

তখন ইসলামী রাষ্ট্রের মূল রক্ষা কবচ ছিল আরব। আর আরবদের সর্বাধিক ঐক্য সম্ভব ছিল কুরায়শদের খিলাফতের উপর। অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করলে বিরোধ ও অনৈক্যের সম্ভাবনা এতটা প্রকট ছিল যে, খিলাফত ব্যবস্থাকে এ আশঙ্কার মুখে ঠেলে দেওয়া সমীচীন ছিল না। এ কারণে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, الأئمة من قریش অর্থাৎ ইমাম হবে কুরায়শদের মধ্য থেকে। অন্যথায় এ পদ অ-কুরায়শদের জন্য চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা বলতেন না যে, اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي, অর্থাৎ তোমাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনে যদি একজন হাবশী দাসও বসে তাহলেও তোমরা তার কথা শোন ও তার অনুগত্য কর।’ আর খলীফা ‘উমারও (রা) জীবনের অন্তিম সময়ে বলতেন না যে,

لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته.

আজ যদি হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম বেঁচে থাকতো তাহলে আমি তাকেই খলীফা নিয়োগ করে যেতাম।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও কুরায়শদের মধ্যে খিলাফত রাখার কথা বলতে গিয়ে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, যতদিন তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাদের জন্য এ পদ। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সকল গুণের অবর্তমানে একজন অ-কুরায়শীও খিলাফতের যোগ্য হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও সকল আহলুস সুন্নাহ এ মতই পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে কিছু খারিজী ও মু‘তায়িলা ছিল অ-কুরায়শীর জন্য অবাধ খিলাফতের প্রবক্তা। তারা বরং এক কদম অগ্রসর হয়ে অ-কুরায়শীকে খিলাফতের অধিক হকদার বলে দাবী করতো। তাদের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব ছিল গণতন্ত্রের, তার পরিণতি বিভেদ-অনৈক্যই হোক না কেন। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ গণতন্ত্রের সাথে রাষ্ট্রের স্থিতি-সংহতির কথাও চিন্তা করেছেন। আর এখানেই দু’টি মত ও চিন্তার পার্থক্য।^{৯১}

বায়তুল মাল

সমকালীন খলীফাদের যে সকল ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ) সবচেয়ে বেশি আপত্তি করতেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও জনগণের ধন-সম্পদে তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ ছিল তার অন্যতম। তাঁর মতে নির্দেশ দানে অন্যায় এবং বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) খিয়ানাত কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব রহিত করার মত গর্হিত কাজ। বিদেশ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে খলীফার নিকট যেসব উপহার-উপটোকন আসে তা খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করাকেও তিনি বৈধ মনে করেন নি। তার মতে এসব হচ্ছে জনগণের হক, খলীফা এবং তার পরিবার-পরিজনদের নয়। মুসলিমদের খলীফা না হলে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামগ্রিক শক্তি ও প্রচেষ্টার বদৌলতে খলীফার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হলে ঘরে বসে ব্যক্তি খলীফা এসব উপহার-উপটোকন লাভ করতেন না।^{৯২} বায়তুল মালের সম্পদ থেকে খলীফার যথেষ্ট ব্যবহার এবং দান-দক্ষিণায় তাঁর আপত্তি ছিল। এ কারণে তিনি তৎকালীন খলীফাদের দান-উপহার গ্রহণ করতেন না।

খলীফা মানসূরের সংগে যখন তাঁর ভীষণ দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য চলছে তখন একদিন মানসূর তাঁকে প্রশ্ন করেন : আপনি আমার হাদিয়া গ্রহণ করেন না কেন? তিনি জবাব দেন : আমীরুল মু‘মিনীন নিজের সম্পদ থেকে কবে আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন যে আমি তা গ্রহণ করিনি। আপনি নিজের সম্পদ থেকে দান করলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করতাম। আপনি তো আমাকে দিয়েছেন মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে। তাদের সম্পদে তো আমার কোন অধিকার নেই। আমি তো তাদের পক্ষে যুদ্ধ করি না যে, একজন মুজাহিদের অংশ পাবো।

^{৯১}. খিলাফত ও মূলকিয়াত, পৃ. ২১৩

^{৯২}. আস-সারাখসী, শারহ আস-সিয়ার আল-কাবীর, খ- ১, পৃ. ৯৮

আমি তো আর তাদের সম্ভান নই যে, সম্ভানের অংশ গ্রহণ করবো, ফকীর নই যে, ফকীরের প্রাপ্য অংশ নিব।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা মানসূর একবার হাদিয়া হিসেবে ৩০ হাজার দিরহাম ইমাম আবু হানীফার (রহ) নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁকে অনুরোধ করা হলো, আপনি দিরহাম গুলি গ্রহণ করে সাদাকা করে দিন। জবাবে তিনি বলেন : মানসূরের নিকট কোন হালাল সম্পদও কি আছে? জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি অসীয়াত করে যান যে, বাগদাদ শহর পতনের সময় মানসূর জনগণের যে সকল ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে যেন তার মধ্যে দাফন করা না হয়। তাঁর অসীয়াতের কথা শুনে মানসূর চিৎকার করে বলে ওঠেন, আবু হানীফা! জীবনে মরণে তোমার পাকড়াও থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?^{৩০}

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

তাঁর মতে মুসলিম সমাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে এ জন্য ‘আমর বিল মা’রুফ ওয়া নাহয়ি ‘আনিল মুনকার’ (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বারণ) পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিছক মত প্রকাশ একান্ত অন্যায্যও হতে পারে, হতে পারে তা নীতি-নৈতিকতা ও মানবতা বিরোধী যা কোন আইনই বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা এবং সৎ কাজের আদেশ দেওয়া সত্যিকার অর্থেই মত প্রকাশ। ইমাম আবু হানীফা (রহ) জনগণের এ অধিকার ও কর্তব্যের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করেন। কারণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মানুষের এ অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। ‘আমর বিল মা’রুফ ওয়া নাহয়ি, ‘আনিল মুনকার’ ফরয হওয়া সম্পর্কেও তখন মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন মুরজিয়া সম্প্রদায় তাদের মতবাদ দ্বারা মানুষকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করছিল এবং হাশবিয়া নামে অপর একটি সম্প্রদায় প্রচার করছিল যে, সরকার ও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায্যের নিষেধ আরেকটি ফিতনা। তাছাড়া উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসকদের বিকৃতি ও পাপাচার এবং যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার জনগণের শক্তি ও সাহসকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে আবু হানীফা (রহ) তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা জনগণের লুপ্ত প্রায় এ প্রাণ শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সেটি হলো, খুরাসানের প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ফাকীহ ইবরাহীম আস-সায়িগ (রহ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম সাহেব বলেন : আমর বিল মা’রুফ ওয়া নাহয়ি ‘আনিল মুনকার’ ফরয। তিনি তাঁকে ইবন

^{৩০}. আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মাক্কী, খ. ১, পৃ. ২১৫-২১৬, খ. ২, পৃ. ১৮০

‘আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ হাদীছটি শোনান: হামযা ইবন ‘আবদিল মুত্তালিব শহীদদের মধ্যে সকলের চেয়ে উত্তম। অতঃপর সে ব্যক্তি উত্তম যে, যালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা উচ্চারণ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে এবং এজন্য সে প্রাণ হারায়। ইবরাহীমের (রহ) উপর তাঁর শিক্ষার এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি খুরাসানে ফিরে গিয়ে আব্বাসীয় শাসকদের প্রতিনিধি আবু মুসলিম আল-খুরাসানীর (মৃ. ১৩৬ হি.) যুলুম-অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপত্তি জানান। বারবার বাধা দান করেন। শেষ পর্যন্ত আবু মুসলিম তাকে হত্যা করেন।^{৯৪}

নাফসি যাকিয়া তথা মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদিল্লাহ ও তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবন ‘আবদিল্লাহর (হি. ১৪৫/খ্রী. ৭৬৩) বিদ্রোহকালে ইমাম আবু হানীফার (রহ) কর্মপদ্ধতি ছিল, তিনি প্রকাশ্যে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানাতেন, আর খলীফা আল-মানসূরের বিরোধিতা করতেন। আল-মানসূর তখন কূফায় অবস্থান করতেন। ইবরাহীমের বাহিনী বসরার দিকে যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন শহরে সারা রাত কারফিউ থাকতো। ইমামের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম যুফার (রহ) বলেন, এমন নাজুক সময়েও ইমাম আবু হানীফা (রহ) প্রকাশ্যে অত্যন্ত শক্তভাবে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতেন। এ অবস্থায় বিচলিত হয়ে একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাদের সবার গলায় ফাঁসির রশি আটকে না যাওয়া পর্যন্ত মনে হচ্ছে আপনি থামবেন না।^{৯৫}

হিজরী ১৪৮/খ্রী. ৭৬৫ সনে মুসেল-এর অধিবাসীরা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর আগের এক বিদ্রোহের পর মানসূর তাদের নিকট থেকে এমন স্বীকৃতি গ্রহণ করেন যে, ভবিষ্যতে তারা আবার যদি বিদ্রোহ করে তাহলে তাদের জান-মাল তাঁর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারা আবার যদি বিদ্রোহের ঝগড়া উত্তোলন করলো। খলীফা আল-মানসূর ইমাম আবু হানীফা (রহ)সহ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ফাকীহকে ডাকলেন। তিনি তাদের নিকট জানতে চাইলেন, চুক্তি অনুযায়ী তাদের জান-মাল খলীফার জন্য হালাল হবে কিনা? অন্য ফাকীহরা চুক্তির উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করেন যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলে তা হবে আপনার মর্যাদার উপযুক্ত, অন্যথায় যা খুশী আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহ) কোন কথা না বলে চুপ থাকলেন। খলীফা তাঁর মতামত জানতে চান। তিনি বলেন: মুসেল-এর অধিবাসীরা আপনার জন্য এমন জিনিস বৈধ করেছিল যা তাদের নিজের নয় (অর্থাৎ তাদের রক্ত)। আর আপনি তাদের দ্বারা এমন এক শর্ত মানিয়ে নিয়েছেন যার অধিকার আপনার ছিল না। কোন নারী যদি বিয়ে ছাড়াই নিজেকে কারো জন্য হালাল করে দেয় তাহলে কি তা হালাল হবে? কেউ যদি কাউকে বলে আমাকে হত্যা করো, তাহলে কি

^{৯৪}. আবু বাকর আল-জাসাস, আহকাম আল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ৮১

^{৯৫}. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৩০; আল মুওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ১৭১

তাকে হত্যা করা সে ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে? মানসুর নেতিবাচক জবাব দেন। তখন ইমাম সাহেব বলেন, তাহলে আপনি মুসলিমবাসীদের প্রতি আপনার সম্প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিন। তাদেরকে হত্যা করা আপনার জন্য কোনভাবেই বৈধ নয়। ইমাম সাহেবের এমন কঠোর বক্তব্য শুনে মানসুর ক্ষুব্ধ হন এবং ফাকীহদের মাজলিস ভেঙ্গে দেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফাকে (রহ) একান্তে ডেকে বলেন: আপনার বক্তব্যই সঠিক। তবে এমন কোন মতামত ব্যক্ত করবেন না যা আপনার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করে।^{৯৬}

আদালতের বিরুদ্ধেও তিনি স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতেন। কোন আদালত ভুল ফয়সালা দান করলে তিনি আইন বা বিধির যে কোন ভুল স্পষ্ট ভাবে ভুলে ধরতেন। তাঁর মতে আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, আদালতকে ভুল ফয়সালা করতে দেওয়া হবে।^{৯৭}

মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি এত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, বৈধ নেতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধেও কেউ যদি কোন কথা বলে, সমকালীন নেতাকে গালি দেয়, এমনকি তাকে হত্যার হুমকিও দেয়, তাহলেও তাকে শাস্তিদান এবং কারারুদ্ধ করাও তাঁর মতে সঙ্গত নয়। যতক্ষণ না সে সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে তিনি খলীফা 'আলীর (রা) একটি ঘটনা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। ঘটনাটি হলো, তাঁর খিলাফতকালে পাঁচ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাঁরা কুফায় প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিল। তাদের একজন বলছিল, আমি তাঁকে হত্যা করবো। 'আলী (রা) তাদের মুক্তির নির্দেশ দেন। 'আলীকে (রা) বলা হলো, একটি লোক তো আপনাকে হত্যার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। তিনি বলেন, শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করায় কি আমি তাকে হত্যা করবো? বলা হলো, এরা তো আপনাকে গালিও দিচ্ছিল। তিনি জবাব দেন, ইচ্ছে করলে তোমরাও তাদেরকে গালি দিতে পার। এমনভাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ) সরকার বিরোধীদের ব্যাপারে 'আলীর (রা) সে ঘোষণাকেও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন যা তিনি খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে মাসজিদে আসতে বারণ করবো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করবো না; যতক্ষণ না তোমরা আমার বিরুদ্ধে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন কর।^{৯৮}

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। আর তা হলো, বিচার বিভাগকে কেবল শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ এবং প্রভাবমুক্ত হলেই হবে না; বরং বিচারককে এতটুকু ক্ষমতার

^{৯৬}. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৫, পৃ. ২৫; আস-সারাখসী, কিতাবুল মাযসূত, খ. ১০, পৃ. ১২৯

^{৯৭}. তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৫১; ইবনু 'আবদিল বার, আল-ইনতিকা', পৃ. ১৫২-১৫৩

^{৯৮}. আল মাযসূত, খ. ১০, পৃ. ১২৫

অধিকারী হতে হবে যে, স্বয়ং খলীফাও যদি জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি যেন তাঁর উপরও নির্দেশ জারি করতে পারেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি যখন বুঝতে পারেন যে, সরকার আর তাঁকে বেঁচে থাকতে দেবে না, তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের সমবেত করে এক ভাষণ দান করেন। সেই ভাষণে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া একথাও বলেন:

“খলীফা যদি এমন কোন অপরাধ করে যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, তখন মর্যাদায় তাঁর নিকটতম কাজীউল কুজাত- প্রধান বিচারপতিকে তাঁর উপর নির্দেশ জারি করতে হবে।”^{৯৯}

বানু উমাইয়্যা এবং বানু আব্বাসের শাসনামলে সরকারী, বিশেষত: কাজীর পদ গ্রহণ না করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, তিনি সে সময়ে কাজীর এমন মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেননি। সেখানে খলীফার উপর আইনের বিধান প্রয়োগের সুযোগ ছিল না। কেবল তাই নয়, বরং তার আশঙ্কা ছিল, তাঁকে মানুষের উপর যুলুম-অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাঁর দ্বারা অন্যায সিদ্ধান্ত ঘোষণা করানো হবে। কেবল খলীফাই নয় বরং খলীফার প্রাসাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যরাও তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে।

আবু হানীফার (রহ) রাজনৈতিক মতামত

১৩২ হিজরীতে ইসলামী খিলাফতের শাসন ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। এ বছর উমাইয়্যাদের হাত থেকে আব্বাসীয়রা রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। এই পালাবদল আবু হানীফা (রহ) প্রত্যক্ষ করেন। কারণ, সেই ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল কূফা। সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার হাতে বাই'আত। কিন্তু তখনকার সেই রাজনৈতিক ডামাডোলে আবু হানীফার (রহ) কোন রকম ভূমিকা দেখা যায় না। তবে এ সময়ের ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে একটি দুঃখজনক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো সর্বশেষ উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ইরাকের ওয়ালী ছিলেন ইয়াযীদ ইবন 'উমার ইবন হুযায়রা। তিনি আবু হানীফাকে (রহ) বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। আবু হানীফা (রহ) সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এতে ইয়াযীদ ইবন 'উমার ক্ষেপে যান এবং তাঁকে ১১০ (একশো দশ)টি বেত্রাঘাত করেন। প্রতিদিন দশটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। তা সত্ত্বেও ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অবশেষে ইয়াযীদ তাঁকে মুক্তি দেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সেই আঘাত ছিল বেশ তীব্র। কারণ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) এই বেত্রাঘাতের কথা শুনে ভীষণ কান্নাকাটি করেন এবং ইমামের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।^{১০০}

^{৯৯} আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মাক্কী, খ. ২, পৃ. ১০০

^{১০০} তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৩; তাযকিরাতুল হফ্ফাজ, খ. ১, পৃ. ১৬৮; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান, খ. ২, পৃ. ১৬৩

ইয়াযীদ ইবন 'উমার ইবন হুবায়রার ঘটনাটি কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন:

এটা হিজরী ১৩০ সনের কথা। তখন ইরাকে উমাইয়া খিলাফত মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখী। এর মাত্র দু'বছরের মধ্যে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে। এ সময় তৎকালীন খ্যাতিমান ফাকীহদের সমর্থন নিয়ে ও তাঁদের প্রভাব দ্বারা উমাইয়ারা সংকট উত্তরণের চেষ্টা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ইয়াযীদ ইবন 'উমার ইবন হুবায়রা সে সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন: ইবনু আবী লায়লা, দাউদ ইবন আবিল হিন্দ, ইবনু শুবরামা প্রমুখকে ডেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফাকে (রহ) ডেকে বলেন, আমার সীল-মোহর আপনার হাতে অর্পণ করছি। আপনি সীল না দিলে কোন নির্দেশ জারী হবে না, আপনার অনুমোদন ব্যতীত খাযানা থেকে কোন অর্থ বাইরে যাবে না। তিনি এ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে আটক করা হয়। চাবুক মারার ভয় দেখানো হয়। অন্যান্য ফাকীহরা ইমাম সাহেবকে পরামর্শ দেন, আপনি নিজের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমরাও পদ গ্রহণে রাজী নই; কিন্তু বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছি। আপনিও গ্রহণ করুন। জবাবে তিনি বলেন, ইবন হুবায়রা কোন ব্যক্তির হত্যার নির্দেশ দেবে, আর আমি তা অনুমোদন করবো, এটা তো দূরের কথা, সে যদি আমাকে ওয়াসিতের মাসজিদের দরজা গণনার নির্দেশও দেয়, আমি তা পালন করতে রাজী নই। আল্লাহর কসম! এ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করবো না। ইবন হুবায়রা তার সামনে অন্যান্য পদও পেশ করেন, কিন্তু তিনি সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি তাঁকে কুফার কাজী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কসম করে বলেন, আবু হানীফা এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে চাবুক মারবো। ইমাম আবু হানীফাও (রহ) কসম করে বলেন, দুনিয়ায় তার চাবুকের ঘা সহ্য করা আমার জন্য আশ্বিরাতের শান্তি ভোগ করার চেয়ে অনেক সহজ। আল্লাহর কসম! সে আমাকে হত্যা করলেও আমি তা গ্রহণ করবো না। অতঃপর ইমাম সাহেবকে বন্দী করে বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইবন হুবায়রাকে জানানো হয় যে, লোকটি মারাই যাবে। ইবন হুবায়রা বলেন, আমার পাকড়াও থেকে মুক্তি চেয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার মত কেউ কি নেই? ইবন হুবায়রার এ উক্তি ইমাম আবু হানীফার (রহ) কানে পৌঁছালে তিনি বলেন, হীতাকাঙ্খীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক। একথা শুনেই ইবন হুবায়রা তাকে মুক্তি দেন। মুক্তির পর কুফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান এবং উমাইয়াদের পতনের পূর্বে আর কুফায় ফেরেননি।^{১০১}

অবশ্য অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, বিচারপতির পদ নয় বরং বায়তুল মালের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং ইমাম তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর ইয়াযীদ তাঁকে বেত্রাঘাত করেন।^{১০২}

^{১০১} আল-ইনতিকা', পৃ. ২১; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান, খ. ২, পৃ. ৪১

^{১০২} তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৪

দেশের খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধানের পদের পরেই হলো বিচারপতির পদ। সেই পদ গ্রহণের জন্য যাকে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, নিশ্চয়ই তিনি একজন অতি সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি যে কোন কারণে সেই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু একজন সৈরাচারী ও ক্ষমতাদর্পী শাসক সেজন্য তাঁকে কেন চাবুক মারবেন তা কোনভাবেই আমাদের বোধগম্য নয়। বিশেষত: চাবুক মারাটা যেখানে কাউকে ঘৃণা ও অপমান করার চরম পছন্দ। তাছাড়া এমন নয় যে, তিনি ছাড়া তখন উক্ত পদের উপযুক্ত কোন লোক সেখানে ছিল না। বরং সেই সময় কৃফায় ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফাকীহর কোন অভাব ছিল না। ইয়াযীদ ইবন হুবায়রা ইচ্ছা করলে তাঁদের কোন একজনকে সেই পদে নিয়োগ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে যে কাজটি করেন তাতে আমাদের ধারণা হয় যে, হয়তো কোন কারণে ইয়াযীদ ইবন হুবায়রা ইমামের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই চাবুক মারার মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক আবু হানীফার (রহ) সাথে ইয়াযীদ ইবন হুবায়রার এমন নির্ভুর আচরণের পশ্চাতের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে, ইবন হুবায়রা আবু হানীফাকে (রহ) প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে চাননি বরং তিনি চেয়েছেন, বানু উমাইয়াদের শাসনের প্রতি তাঁর আনুগত্য কতটুকু তা পরীক্ষা করতে। কারণ, সে যুগের সত্যনিষ্ঠ আলিমগণ সৈরাচারী শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কোন পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। তাছাড়া সে সময় উমাইয়্যা শাসনের বিরুদ্ধে কৃফা কেন্দ্রিক দু'টি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। একটি হয় য়াদ ইবন আলী ইবন আল-হুসাইনের (রা) নেতৃত্বে হিজরী ১২২ সনে খলীফা হিশাম ইবন আবদিল মালিকের খিলাফতকালে। ইউসুফ ইবন উমার আছ-ছাকফী তখন ইরাকের ওয়ালী। বিদ্রোহীদের নেতা য়াদকে হত্যার মাধ্যমে অত্যন্ত নির্ভুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। দ্বিতীয় বিদ্রোহটি সংঘটিত হয় হিজরী ১২৭ সনে আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জা'ফারের নেতৃত্বে। সীরাতে বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করেছেন, য়াদ ইবন আলীর বিদ্রোহের সমর্থনে আবু হানীফা কিছু বক্তব্য রাখেন, তাই আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়ার বিদ্রোহের সময় তাঁর সমর্থন কোন দিকে তা পরীক্ষার জন্য তাঁকে বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি যখন সেই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানেন, তখন শাসক গোষ্ঠী বুঝে গেল বানু উমাইয়াদের শাসনের প্রতি তাঁর আনুগত্য নেই। মূলত: সেই কারণে তাঁকে চাবুক মারা হয়, বিচারপতির পদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে নয়।

মুগীছ ইবন বুদাইল বলেন: আব্বাসীয় খলীফা আল মানসুর ইমাম আবু হানীফাকে (রহ) বিচারপতির পদ গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি খলীফার এ আহ্বানে সাড়া দিলেন না।

খলীফা তাঁকে বললেন: আপনি কি আমাদের কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করেন? ইমাম বললেন: আমি এ পদের যোগ্য নই। খলীফা বললেন: আপনি অসত্য বলেছেন। ইমাম বললেন: আমীরুল মু'মিনীন নিজেই তো বলে দিলেন, আমি এ পদের যোগ্য নই। যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে, আমি এ পদের যোগ্য নই। আর যদি আমি সত্যবাদী হই, তাহলে তো আমি বলেই দিয়েছি, আমি এ পদের যোগ্য নই। খলীফা তাকে কারাগারে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় একাধিকবার পদটি গ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। প্রত্যেকবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ অবস্থায় হি. ১৫০ সনে তিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।^{১০০}

খলীফা আল মানসুরের সঙ্গে ইমাম আবু হানীফার (রহ) বিবাদের ঘটনাটি অনেক জীবনীকার এভাবে উল্লেখ করেছেন:

মানসুরের বিরুদ্ধে নফসে যাকিয়া এবং তাঁর ভাই ইবরাহীমের বিদ্রোহে ইমাম আবু হানীফা (রহ) প্রকাশ্যে তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মানসুরের মনে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা মানসুরের জন্য কোন সহজ কাজ ছিল না। তাই তাঁকে পথের কাটা হিসেবে সরিয়ে না দিয়ে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যেই মানসুর তাঁর সামনে বারবার কাজীর পদ পেশ করেছেন, এমনকি তাঁকে গোটা আব্বাসী খিলাফতের 'কাজী-উল-কুজাত' তথা প্রধান বিচারপতির পদটি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘ দিন হাঁ-না কিছু না বলে এড়িয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মানসুর আরো বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলে ইমাম সাহেব তাঁকে উক্ত পদ গ্রহণ না করার কারণ জানিয়ে দেন। একদিন আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গটি উঠে এলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন: আপনার উপর এবং আপনার সন্তান ও সামরিক কর্মকর্তাদের উপর আইন জারি করার মত সাহস যার নেই, সে এ পদের যোগ্য হতে পারে না। এমন সাহস আমার নেই। আপনি যখন আমাকে ডাকেন তখন ফিরে এসেই তো আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়। আরেকদিন তাঁদের উভয়ের মধ্যে রূঢ় কণ্ঠে বাক্য বিনিময় হয়। তখন তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করে বলেন: আল্লাহর কসম! সন্তুষ্ট হয়ে আমি এ পদ গ্রহণ করলেও আপনার আত্মভাজন কখনো হতে পারবো না। সুতরাং অসন্তুষ্ট হয়ে এ পদ গ্রহণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোন ব্যাপারে যদি আমার ফায়সালা আপনার বিরুদ্ধে যায়, আর আপনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন যে, তোমার ফায়সালা পরিবর্তন না করলে আমি তোমাকে ফুরাত নদীতে ডুবিয়ে মারবো, তখন আমি নদীতে ডুবে মরা কবুল করবো, কিন্তু ফায়সালা পরিবর্তন করবো না। এছাড়াও আপনার অনেক সভাসদ রয়েছে। তাদের এমন একজন বিচারক দরকার, যিনি আপনার দিকে তাকিয়ে তাদের কথাও বিবেচনা

^{১০০} প্রাণ্ডক; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান, খ. ২, পৃ. ১৬৩; আয়ু-খিরিকলী, আল-'আলাম, খ. ৮, পৃ. ৩৬

করবেন। এসব কথা শুনে, মানসূর যখন নিশ্চিত হলেন তাঁকে বশে আনা কোনভাবেই সম্ভব নয়, তখন তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। অতঃপর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে পানাহারের কষ্ট দেওয়া হয়, একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।^{১০৪}

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

মুসলিমদের নেতা যালিম-ফাসিক হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সঙ্গত কিনা- এটা ছিল সে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর মধ্যেও এ বিষয়ে মত পার্থক্য ছিল। আহলুল হাদীছ অর্থাৎ হাদীছের বাহ্যিক অনুসারীদের বড় একটি দলের মতে, কেবল জিহ্বা দ্বারা এমন নেতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং সত্য তুলে ধরতে হবে। তবে বিদ্রোহ করা যাবে না। নেতা অন্যায়ভাবে খুন-খারাবী করলে, জনগণের অধিকার হরণ করলে, এমন কি প্রকাশ্যে ফিসক তথা পাপাচার করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলতেন, যালিমের নেতৃত্ব কেবল বাতিলই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও সঙ্গত। শুধু সঙ্গত নয়, বরং বিদ্রোহ করতে হবে। তবে এই বিদ্রোহের জন্য তিনি কিছু শর্তের কথাও বলতেন। আর তা হলো: সফল ও স্বার্থক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকতে হবে, যালিম-ফাসিকের পরিবর্তে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে হবে এবং বিদ্রোহের ফল কেবল প্রাণহানি ও শক্তির ক্ষয় হবে না।

আবু বাকর আল-জাসাসাস (রহ) ইমাম আবু হানীফার উপরোক্ত মতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তাঁর মায়হাব প্রসিদ্ধ। তিনি বলতেন, 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহই 'আনিল মুনকার' প্রথমত: মুখের দ্বারা ফরয। কিন্তু সোজা পথে কাজ না হলে প্রয়োজনে বাহুবল প্রয়োগ করতে হবে।^{১০৫}

আল-জাসাসাস (রহ) 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাকের (রহ) সূত্রে ইমাম আবু হানীফার (রহ) একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন খলীফা আল-মানসূরের সময় আবু মুসলিম খুরাসানী পারস্যে যুলুম-নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সে সময় খুরাসানের ফাকীহ ইবরাহীম আস-সায়িগ ইমামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহই 'আনিল মুনকার' বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে ইমাম সাহেব 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাকের (রহ) নিকট সেই আলোচনার বিষয় উল্লেখ করেন এভাবে: 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহই 'আনিল মুনকার' ফরয এ বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে উপনীত হলে হঠাৎ

^{১০৪}. আয-যাহবী, মানাকিব আল-ইমাম আল আ'জাম, পৃ. ২০; আল-মওয়াফফাক আল মাক্কী, খ. ২, পৃ. ১৭০-১৭৪, ১৭৮, ১৮২; তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩২০

^{১০৫}. আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৮১

ইবরাহীম বলেন, হাত বাড়িয়ে দিন, আপনার বাই‘আত করি। তাঁর একথা শুনে আমার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। ইবনুল মুবারাক (রহ) বলেন, আমি এমন অবস্থা হওয়ার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ইবরাহীম আল্লাহর একটি অধিকারের দিকে আহ্বান জানান, আর আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। অবশেষে আমি তাঁকে বললাম, একা কোন ব্যক্তি এজন্য দাঁড়ালে প্রাণ হারাবে। এ প্রাণ দান মানুষের কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সে যদি একজন সং সাহায্যকারী ব্যক্তি লাভ করে, নেতৃত্বের জন্যও এমন একজনকে পাওয়া যায় যে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য, তাহলে আর কোন বাঁধা নেই। এরপর ইবরাহীম যখনই আমার কাছে এসেছেন, এ কাজের জন্য আমাকে এমন চাপ দিয়েছেন, যেমন কোন মহাজন ঋণ আদায়ের জন্য করে থাকে। আমি তাঁকে বলতাম, এটা কোন একক ব্যক্তির কাজ নয়। নবীদেরও এ ক্ষমতা ছিল না, যতক্ষণ না আসমান থেকে এ জন্য নির্দেশ আসে- এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু এ এমন এক কাজ, কোন ব্যক্তি এজন্য দাঁড়ালে নিজের প্রাণ হারাবে। সে ব্যক্তি প্রাণ হারালে এ বিপদ মাথা পেতে নিতে অন্যদের সাহসও লোপ পাবে।^{১০৬}

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের কর্মধারা

আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে উল্লেখিত ব্যাপারে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট জানা যায়। কিন্তু তাঁর সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে তার কর্মধারা একটু খতিয়ে দেখলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

যায়দ ইবন ‘আলীর বিদ্রোহ

যায়দ (রহ) ছিলেন ইমাম আল-হুসাইনের (রা) পৌত্র এবং ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকিরের (রহ) ভাই। তিনি তাঁর সময়ের একজন বড় ‘আলিম, ফাকীহ, আল্লাহ ভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইমাম আবু হানীফাও (রহ) তাঁর নিকট জ্ঞান লাভ করেন। হিজরী ১২০/ খ্রী. ৭৩৮ সনে খলীফা হিশাম ইবন আবদিল মালিক ইরাকের ওয়ালীর পদ থেকে খালিদ ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-কাসরীকে অপসারণ করেন। অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানের জন্য যায়দকেও মদীনা থেকে কূফায় তলব করা হয়। দীর্ঘদিন পর এই প্রথমবারের মত ‘আলীর (রা) বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কূফায় আগমন করেন। কূফা ছিল শী‘আদের কেন্দ্রস্থল। তাই তাঁর আগমানে ‘আলাভী আন্দোলনে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জড়ো হয়। এমনিতে ইরাকের অধিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে বানু উমাইয়াদের যুলুম-নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে উঠেছিল। মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য

দীর্ঘদিন থেকে তারা পথ খুঁজছিল। 'আলীর (রা) বংশীয় সত্যনিষ্ঠ 'আলিম ফাকীহকে পেয়ে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। কূফার অধিবাসীরা তাঁকে নিশ্চয়তা দেয় যে, এক লক্ষ লোক আপনার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। পনেরো হাজার লোক বাই'আত করে যথারীতি নিজেদের নামও তালিকাভুক্ত করে। গোপনে বিদ্রোহের এ প্রস্তুতি চলাকালে ইরাকের ওয়ালী তা অবহিত হন। বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেছে দেখে, হিজরী ১২২ সনের সফর মাসে (খ্রী. ৭৪০) সময়ের পূর্বেই তিনি বিদ্রোহ করে বসেন। সংঘর্ষ দেখা দিলে ইরাকের শী'আরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। যুদ্ধের সময় মাত্র ২১৮ ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধকালে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।^{১০৭}

এ বিদ্রোহে ইমাম আবু হানীফার (রহ) সম্পূর্ণ সহানুভূতি তিনি লাভ করেন। তিনি যায়দকে (রহ) অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং মানুষকে তাঁর সহযোগিতার জন্য উৎসাহিত করেন।^{১০৮} তিনি যায়দের বিদ্রোহকে বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহির্গমনের সাথে তুলনা করেন।^{১০৯} তার অর্থ এই যে, তখন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যের উপর থাকা যেমন সন্দেহমুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি যায়দ ইবন 'আলীর সত্যের উপর থাকাও সন্দেহ মুক্ত। কিন্তু সহযোগিতা করার জন্য তাঁর কাছে যায়দের পয়গাম পৌঁছলে তিনি বার্তাবাহককে জানিয়ে দেন যে, জনগণ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সত্য সত্যই তাকে সহযোগিতা করবে, একথা নিশ্চিত হলে আমি অবশ্যই তাঁর সাথে শরীক হয়ে জিহাদ করতাম। কারণ, তিনি সত্য সঠিক ইমাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অতীতে এরা যেমন তাঁর দাদা আল-হুসাইনের (রা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাঁর সাথেও তেমন করবে। অবশ্য আর্থিকভাবে আমি তাকে সাহায্য করবো।^{১১০}

যালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি যে নীতিগত মত ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর এমত ছিল তারই অনুরূপ। কূফার শী'আদের ইতিহাস এবং তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। 'আলীর (রা) সময় থেকে এরা ক্রমাগতভাবে যে চরিত্র এবং কাজের পরিচয় দিয়ে আসছিল, তার পূর্ণ ইতিহাস সবার সামনে ছিল। কূফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যথাসময়ে সতর্ক করে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) পৌত্র দাউদ ইবন 'আলীও যায়দকে বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে বলেন।^{১১১} ইমাম আবু হানীফা (রহ) এও জানতেন যে, এ আন্দোলন কেবল কূফায় চলছে। উমাইয়্যা খিলাফতের অন্যান্য অঞ্চলে যায়দের এ বিদ্রোহের কোন প্রভাব নেই। অন্য কোন স্থানে এ সংগঠনের কোন শাখাও নেই যেখান থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আর কূফায়ও কেবল ছ'মাসের মধ্যে একটি অপরিপক্ক আন্দোলন দানা

^{১০৭} আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, ৪৮২, ৫০৫

^{১০৮} আহকাম আল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ৮১

^{১০৯} আল-মওয়াফফাক আল-মাক্কী, খ. ১, পৃ. ২৬০

^{১১০} প্রাগুক্ত

^{১১১} আত-তাবারী, তারীখ, খ. ৫, পৃ. ৪৮৭, ৪৯১

বৈধে উঠেছে। তাই সকল দিক বিবেচনায় যায়দের বিদ্রোহ দ্বারা কোন সফল বিপ্লব সাধিত হবে- এমন আশা তিনি করতে পারেননি।

এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করার সম্ভবত এটাও একটা কারণ ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর এতটা প্রভাবও হয়নি যে, তাঁর অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলনের দুর্বলতা কিছুটা দূর হতে পারতো। হিজরী ১২০ সন পর্যন্ত ইরাকের আহলুর রায় মাদ্রাসার নেতৃত্ব ছিল হাম্মাদের (রহ) হাতে। তখন পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ছিলেন তাঁর একজন ছাত্র মাত্র। যায়দের বিদ্রোহকালে তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের মাত্র দেড়-দুই বছর বা তার চেয়ে কিছু কম-বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখনও তিনি প্রাচ্যের ফিকহবিদ- এর মর্যাদায় অভিব্যক্তি হননি এবং লাভ করেননি এর প্রভাব ও মর্যাদা।

নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিদ্রোহ ছিল মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর যিনি 'নাফসে যাকিয়্যা' নামে খ্যাত এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহর। তাঁরা ছিলেন ইমাম আল-হাসান ইবন 'আলীর (রা) বংশধর। এটা হিজরী ১৪৫ সনের ঘটনা। জ্ঞানের জগতে আবু হানীফা (রহ) তখন খ্যাতির শীর্ষে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

তাঁদের গোপন আন্দোলন ও সাংগঠনিক তৎপরতা বানু উমাইয়্যাদের শাসনকাল থেকেই চলে আসছিল। তখন আল-মানসূরও উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অন্যান্যদের সাথে নাফসে যাকিয়্যার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।^{১১২} আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর এরা আত্মগোপন করেন। আর গোপনে গোপনে তাদের দা'ওয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকে। খুরাসান, আল-জাযীরা, রায়, তাবারিস্তান, ইয়ামন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাদের প্রচারক ছড়িয়ে ছিল। নাফসে যাকিয়্যা হিজায়ে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। আর তার ভাই ইবরাহীমের কেন্দ্র ছিল ইরাকের বসরায়। ইবনুল আছীরের মতে কুফায়ও তাদের একশত অসিধারী যোদ্ধা প্রস্তুত ছিল।^{১১৩} তাঁদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে আল-মানসূর পূর্ব হতেই অবহিত ছিলেন।

হিজরী ১৪৫ সনের রজব মাসে নাফসে যাকিয়্যা মদীনা থেকে কার্যত বিদ্রোহ শুরু করলে খলীফা আল-মানসূর ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে কুফায় চলে যান। এ বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে আব্বাসীয় শাসন টিকে থাকবে কিনা, সে ব্যাপারে আল-মানসূর সন্দিহান হয়ে পড়েন। চারিদিক থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার খবর আসছিল। একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর দিন অতিবাহিত হতে থাকে। দীর্ঘ দু'মাস তিনি পোশাক পরিবর্তন করেননি, বিছানায় শোয়ার সুযোগ পাননি। সারারাত সালাতের মুসল্লায়

^{১১২} প্রাক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫৫- ১৫৬

^{১১৩} আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ৫, পৃ. ১৮

কাটিয়ে দিতেন।^{১১৪} কুফা থেকে পালানোর জন্য তিনি দ্রুতগামী সওয়ারী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সৌভাগ্য তাঁর সহায়ক না হলে এ বিদ্রোহ তাঁর এবং আব্বাসীয় খিলাফতের ভিত ওলট-পালট করে দিত।

এ বিদ্রোহকালে ইমাম আবু হানীফার (রহ) কর্মধারা প্রথমোক্ত বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এ বিদ্রোহের সময় তিনি প্রকাশ্যে সহযোগিতা করেন। এমনকি তাঁর ছাত্র-শিষ্য ও শুভাকাজীরা বলতে থাকেন যে, সরকারি বাহিনী আমাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে। তিনি জনগণকে ইবরাহীমের সহযোগিতার কথা বলতেন, তাঁর বাই'আত করার জন্য উপদেশ দিতেন।^{১১৫} নানাভাবে তিনি জনগণকে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। আবু ইসহাক আল-ফায়রী নামক এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন যে, তোমার ভাই ইবরাহীমের সহযোগিতা করেছেন। কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমার জিহাদ করার চেয়ে তোমার ভাইয়ের কাজ উত্তম। আবু বাকর আল-জাসাস, আল-মুওয়াফফাক আল-মাক্কী ও আল-কারদারীর মত উঁচু স্তরের ফাকীহরা ইমামের সে সময়ের বহু উক্তি উল্লেখ করেছেন। সে সব উক্তির স্পষ্ট অর্থ হলো, মুসলিম সমাজকে আভ্যন্তরীন নেতৃত্বের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা বাইরের কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক গুণ বেশি মর্যাদার কাজ।^{১১৬}

এ সময়ে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেন তা হলো, আল-মানসূরের একান্ত বিশ্বাসভাজন জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি হাসান ইবন কাহতুবাকে নাফসে যাকিয়্যা ও ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। হাসানের পিতা কাহতুবা হলেন সেই ব্যক্তি যার তরবারি ও আবু মুসলিম আল-খুরাসানীর দূরদর্শিতা আব্বাসীয় খিলাফতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তিনি আল-মানসূরের অতি বিশ্বাসভাজন সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি কুফায় অবস্থানকালে ইমাম আবু হানীফার (রহ) জ্ঞান ও চিন্তা-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর একান্ত অনুগত ভক্তে পরিণত হন। একবার তিনি ইমাম সাহেবকে বলেন, মানসূরের আদেশ পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত আমি যত পাপ করেছি তা সবই আপনার জানা আছে। এর কোন কাফ্যারা বা প্রতিবিধান কি আছে? ইমাম সাহেব বলেন, আল্লাহ যদি জানেন, তোমার অতীত কাজের জন্য তুমি অনুতপ্ত, ভবিষ্যতে কোন নিরপরাধ মুসলিমকে হত্যার জন্য তোমাকে বলা হলে তাকে হত্যার পরিবর্তে নিজে নিহত হতে প্রস্তুত এবং অতীত কার্যাবলীর পুণরাবৃত্তি করবে না- আল্লাহর সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করলে তা হবে তোমার তাওবা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য

^{১১৪} আভ-তাবারী, তারিখ, খ. ৬, পৃ. ১৫৪-১৬৩

^{১১৫} আল-কারদারী, খ. ২, পৃ. ৭২

^{১১৬} আহকাম আল-কুরআন, খ. ১, পৃ. ৮১

শুনে হাসান সেই অনুযায়ী কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এর অল্পকাল পরেই নাফসে যাকিয়া ও ইবরাহীমের বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য মানসূর সেনাপতি হাসানকে নির্দেশ দেন। হাসান ইমাম সাহেবকে তা অবহিত করেন। ইমাম সাহেব বলেন, এখন তোমার তাওবার পরীক্ষার সময় এসেছে। প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে তোমার তাওবা ঠিক থাকবে। অন্যথায় অতীতে যা কিছু করেছেো তার জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, আর সেই সাথে এখন যা করবে তার শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

হাসান পুনরায় ইমাম সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর প্রাণ গেলেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। তাই মানসূরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, আমি এ যুদ্ধে যাব না। এ পর্যন্ত আপনার আনুগত্য করতে গিয়ে যা কিছু করেছি তা যদি আল্লাহর আনুগত্য হয় তা হলে আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর যদি তা আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে থাকে তাহলে পাপ আর বৃদ্ধি করতে চাই না। মানসূর ক্ষুব্ধ হন এবং হাসানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। হাসানের ভাই মানসূরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন, বছর খানেক থেকে আমরা তার আচরণে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করছি। সম্ভবত: তার মাথায় কিছুটা গোলমাল হয়েছে। তার পরিবর্তে আমি এ যুদ্ধে যাব। মানসূর তাঁর বিশ্বাসভাজনদের জিজ্ঞেস করেন, ফাকীহদের মধ্যে হাসানের যাতায়াত কার নিকট? তারা জানালো, আবু হানীফার (রহ) নিকটই তার যাতায়াত বেশি।

সফল ও সঠিক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকলে অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল বৈধ নয়, বরং ওয়াজিব। ইমাম সাহেবের এ চিন্তা-দর্শনের পুরোপুরি অনুকূলে ছিল তার এ কর্মধারা। এ ব্যাপারে ইমাম মালিকের (রহ) কর্মধারাও ইমাম আবু হানীফার (রহ) অনুরূপ ছিল। নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের ঘাড়ে তো মানসূরের বাই'আত রয়েছে, এখন আমরা খিলাফতের আরেক দাবীদারের সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আব্বাসীয়দের বাই'আত জোর-জবরদস্তীমূলক বাই'আত। এ ধরনের বাই'আত, কসম বা তালাক যাই হোক না কেন, সবই বাতিল। পরে ইমাম মালিককে (রহ) এজন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল।^{১১৭} আব্বাসীয় শাসকদের নিয়োগকৃত মদীনার ওয়ালী জা'ফার ইবন সুলায়মান তাঁকে চাবুক মারেন এবং তাঁর দু'হাত দু'কাঁধের সাথে বেঁধে রাখেন।^{১১৮}

ইমাম আবু হানীফার (রহ) রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতবাদ ছিল সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানবিকতার একটি সমন্বিত রূপ। তিনি মনে করতেন, পরিস্থিতি অনুধাবন করে সংকাজের আদেশ ও অসং কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। আল-

^{১১৭} ইবন কাছীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া, খ. ১০, পৃ. ৮৪

^{১১৮} প্রাণ্ড; ইবনু খাল্লিকান, খ. ৩, পৃ. ১৯১

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) কর্মপদ্ধতিকে সামনে রেখেই এ বিষয়ের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। যেমন- আল-কুরআন বলছে:^{১১৯}

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى

উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও।

অতএব বুঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায়ই শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায় হতে বিরত রাখা ফরয নয়। যেমন: অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে:^{১২০}

فَذَكِّرْ، إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ.

অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।

তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দানের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, সৎকাজের আদেশকারী ব্যক্তি যদি নিহত হয় তাহলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহস ও প্রেরণার প্রয়োজন, অন্যের মধ্যে তখন তাও অবশিষ্ট থাকে না। এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব আরো বলেন, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা এমন একটি ফরয যা সকলকে সমবেতভাবে আদায় করতে হবে এবং এতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে ফরয হতে পারে না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি উক্ত ফরয আদায় করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাঁর সম্পর্কে আবু হানীফার (রহ) দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে যদি মনে করে যে, বিরোধীদের নিপীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে এবং এ বিষয়ে সে কারো নিকট কোন অভিযোগ করবে না, তাহলে সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে মুজাহিদ বলা যাবে।

বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ) একক নন

বিদ্রোহের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ) একা একটি ভিন্ন মত পোষণ করতেন, এমন কথা বলা ঠিক হবে না। আসলে হিজরী প্রথম শতকে সর্বজনমান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মত তাই ছিল, ইমাম সাহেব তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা যা প্রকাশ করেছেন। উমাইয়াদের দুরাচারের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা) যখন বিদ্রোহ করেন তখন বহু সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে দেখেছেন, এমন ফাকীহদের প্রায় সকলেই বর্তমান

ছিলেন। কিন্তু ইমাম হুসাইনের কাজটিকে কেউই অবৈধ বলেননি। যাঁরা তাঁকে বারণ করেন, তাঁরা বলেন, ইরাকীদের বিশ্বাস নেই। আপনি সফল হতে পারবেন না। এ পদক্ষেপ দ্বারা কেবল নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবেন। অন্য কথায়, এ ব্যাপারে তাঁদের সকলের মত তাই ছিল, পরে ইমাম আবু হানীফা (রহ) যা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মূলত কোন অবৈধ কাজ নয়। অবশ্য এ পদক্ষেপ গ্রহণের আগে দেখতে হবে যে, অসৎ নেতৃত্ব পরিবর্তন করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না। কৃষাবাসীদের বার বার লিখিত পত্রের ভিত্তিতে ইমাম হুসাইন (রা) আত্মপ্রত্যয়ী হন যে, এত বিপুল সহযোগী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একটা সফল বিপ্লব করতে সক্ষম হবেন। তাই তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবী তাঁকে এ যাত্রা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তাঁদের ধারণা ছিল কৃষাবাসীরা তাঁর পিতা ‘আলীর (রা) ও ভাই হাসানের (রা) সাথে যেসব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাতে তাদের উপর আর নির্ভর করা যায় না। তাই সে সকল সাহাবীর সাথে হুসাইনের (রা) মতবিরোধ বৈধ এবং অবৈধের ব্যাপারে ছিল না, বরং মতভেদ ছিল কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নির্যাতনমূলক শাসনামলে ‘আবদুর রহমান ইবন আল-আশ’আছ বানু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফাকীহগণ, যেমন সাঈদ ইবন জুবায়র, আশ-শাবী, ইবন আবী লায়লা প্রমুখ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তবে যে সব ‘আলিম তাঁকে সমর্থন করেননি, তাঁরা কিন্তু একথা বলেননি এ বিদ্রোহ অবৈধ। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, এটা করা কৌশলের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে হাসান আল-বাসরীকে (রহ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ হাজ্জাজকে তোমাদের উপর শুধু শুধু চাপিয়ে দেননি। বরং হাজ্জাজ একটি শাস্তি বিশেষ। সুতরাং তরবারি দ্বারা আল্লাহর এ শাস্তি মুকাবিলা করো না। বরং ধৈর্যের সাথে নিরবে তা সহ্য করে যাও। আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।”^{১২১}

শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ছাত্রদের অভাব-অনটনের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে, তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। অর্থের অভাবে কেউ বিয়ে করতে অক্ষম হলে তাকে বিয়ে দিতেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন। তাঁর একজন ছাত্র বলেছেন:

كان يغني من عمله و ينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال لقد وصلت

^{১২১} ইবন সাঈদ, আত-তাবাকাত, খ. ৭, পৃ. ১৬৪; আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া, খ. ৯, পৃ. ১৩৫

إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام.

তিনি তাঁর ছাত্রকে কাজের মুখাপেক্ষী করে দিতেন এবং তার জন্য ও তার পরিবার পরিজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। যখন শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করতো, তখন তাকে বলতেন, তুমি হালাল-হারামের জ্ঞান লাভ করে সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে গিয়েছো।^{১২২}

তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। যদি কারো মধ্যে জ্ঞান অর্জনের সাথে আত্মতৃষ্টি ও অহংকারের কিছু লক্ষ্য করতেন, তাহলে সুকৌশলে তা দূর করতেন এবং তার মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করতেন যে, জ্ঞানার্জনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র কাজী আবু ইউসুফকে (রহ) কেন্দ্র করে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবু ইউসুফ (রহ) জীবনের এক পর্যায়ে স্বীয় শিক্ষক আবু হানীফার (রহ) ‘হালকায়ে দারস’ (শিক্ষার আসর) থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র হালকা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) তা অবগত হয়ে তাঁরই এক সাথীকে বললেন, তুমি আবু ইউসুফের (রহ) কাছে গিয়ে নিম্নের এ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর মতামত জেনে আসবে:

“এক ব্যক্তি এক ধোপাকে দু’দিরহামের পারিশ্রমিকে একখানা কাপড় ধুইতে দিল। নির্ধারিত সময়ে লোকটি কাপড় আনতে গেল। কিন্তু ধোপা কাপড়টির কথা অস্বীকার করলো। কাপড়ের মালিক ফিরে গেল। তারপর লোকটি আবার এসে কাপড় দাবী করলো। ধোপা কাপড় ধোলাই করে মালিককে ফেরত দিল। এমতাবস্থায়, ধোপা কি তার পারিশ্রমিক পেতে পারে? উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) যাকে আবু ইউসুফের (রহ) নিকট পাঠান তাঁকে বলে দেন যে, যদি আবু ইউসুফ (রহ) বলে, ধোপা পারিশ্রমিক পেতে পারে, তাহলে তুমি বলবে, আপনি ভুল করলেন। আর যদি বলে, সে পারিশ্রমিক পাবে না, তাহলে তুমি বলবে, উত্তরটি সঠিক হলো না।

লোকটি আবু ইউসুফের (রহ) নিকট গিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলো। আবু ইউসুফ (রহ) বললেন, হাঁ, ধোপা পারিশ্রমিক পাবে। লোকটি বললো, আপনি ভুল করলেন। আবু ইউসুফ (রহ) কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, না, সে পারিশ্রমিক পাবে না। লোকটি বললো, উত্তরটি সঠিক হলো না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ইমাম আবু হানীফার (রহ) বৈঠকে উপস্থিত হলেন এবং ধোপার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) বললেন: যদি ধোপা কাপড়খানা আত্মসাৎ করার পর ধুয়ে থাকে, তাহলে সে পারিশ্রমিক পাবে না। কারণ, সে নিজে ব্যবহারের জন্য ধুয়েছিল। আর যদি আত্মসাৎ করার আগেই ধুয়ে থাকে, তাহলে সে পারিশ্রমিক পাবে। কারণ, সে কাপড়খানা আসল মালিকের জন্য ধুয়েছিল।”^{১২৩}

^{১২২} ইমাম আযম আবু হানীফা, পৃ. ১২৩

^{১২৩} প্রাগুক্ত

তিনি শিক্ষার্থীদেরকে উপদেশ দিতেন। বিশেষত: শিক্ষা শেষে যারা স্বদেশে ফিরে যেতেন অথবা যাদের মধ্যে আরো বড় হওয়ার প্রেরণা লক্ষ্য করতেন। আল-মাক্কী ও ইবন বাযাযীর ‘মানাকিব’ গ্রন্থেই তাঁর এ জাতীয় বহু মূল্যবান উপদেশ সংকলিত হয়েছে।

মোটকথা, ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাঁর ছাত্রদেরকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন:^{১২৪}

انتم مسار قلبي و جلاء حزني

তোমরা আমার হৃৎপিণ্ডের ধমনী এবং দুঃখ-দুশ্চিন্তা বিদূরণকারী।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

ইমাম সাহেবের নিজের রচিত ‘আল-‘আলিম ওয়া আল-মুতা‘আল্লিম, আল ফিকহুল আকবার ও আল ফিকহুল আবসাত’ গ্রন্থসমূহে মূলত: ইসলামী ‘আকীদা ও ধর্মীয় চিন্তা ও মতাদর্শের ব্যাখ্যা রয়েছে। এ তিনটি গ্রন্থে তিনি চরমপন্থী খারিজী, শী‘আ, দাহরিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও মতবাদসমূহ যুক্তি-প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহর ‘আকীদা ও মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ‘ইলমে কলাম (যুক্তিশাস্ত্র) এর সংজ্ঞা প্রবর্তনের পূর্বে ‘আকাইদ, দীনের মূলনীতি এবং আইন সব কিছুর জন্যই ‘ফিকহ’ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো। তবে এভাবে পার্থক্য করা হতো যে, ‘আকাইদ ও দীনের মূলনীতিসমূহকে আল-ফিকহুল আকবার’ বলা হতো। ইমাম আবু হানীফা (রহ) তার গ্রন্থের জন্য এ নামই ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে হানাফী ‘আলিমগণ তাঁর ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো: ইমাম আত্-তাহাবীর (মৃ. ৩২১/৯৩৩) আল ‘আকীদা; আবুল লাইছ সামারকান্দীর (মৃ. ৩৮/৯৯৩) আল ‘আকীদা’ ইমাম আল-মাতুরীদীর (মৃ. ৩৩৩/ ৯৪৪) তা‘বীলাতু আহলিস সুন্নাহ ও কিতাবুত তাওহীদ; ইমাম আন-নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭/ ১১৪২) আল-‘আকাইদ এবং শরীফ জুরজানীর ‘শারহুল মাওয়াযিকিফ’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

‘আল্লামা তাফতযানীর (মৃ. ৭৯২/১৩৯০) ভাষ্যসহ ইমাম আন-নাসাফীর ‘আল-‘আকাইদ’ গ্রন্থটি জামি ‘আল আযহার ও প্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ইমাম আবুল লাইছের গ্রন্থটি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় খুবই সমাদৃত। যদিও ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলিমই ইমাম আশ-শাফিঈর মাযহাবের অনুসারী। অবশ্য ইমাম আর-রাযী (মৃ. ৬০৬/ ১২০৯) ‘মানাকিবুশ শাফিঈয়া’ গ্রন্থে এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফার (রহ) রচিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নেই। তবে ইবনে নাদীম তাঁর

^{১২৪} . মুহাম্মাদ আবু যুহরাহ, আল ইমাম আবু হানীফা, হায়াতুহ ওয়া আসরুহ, পৃ. ৭৫-৭৯

আল-ফিহরিস্ত-এ আবু হানীফার (রহ) রচিত 'আকীদা সম্পর্কিত চারটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। সেই গ্রন্থগুলি হলো:

১. আল-ফিকহু আল-আকবার, ২. 'উছমান আল বাতী-কে লিখিত চিঠি, ৩. আল-'আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম, ৪. আর-রাদু 'আলাল কাদারিয়া।

ইমাম আবু হানীফা (রহ)- রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা 'উছমান আল-বাতী'- নামে পরিচিত 'উছমান আল-বাতীকে লিখিত তাঁর চিঠিতে অত্যন্ত মার্জিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন। এই চিঠিটি আল-'আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম এবং আল-ফিকহু আল-আবসাত'- এর সঙ্গে কায়রো থেকে ১৩৬৮/১৯৪৯ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফার (রহ) ইসলামী 'আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি হলো 'আল-ফিকহু আল-আকবার'। এ গ্রন্থটি মিসর ও ভারত থেকে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ইসলামের দশটি মৌলিক 'আকীদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে খারিজী, কাদারিয়া, জাবারিয়া, চরমপন্থী মুরজিয়া, শী'আ এবং জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর যুক্তির আলোচনা করা হয়েছে। আল-ফিকহু আল-আকবার গ্রন্থের অনেক ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মুল্লা 'আলী আল-কারী (মৃ. ১০১৪/১৬০৫) রচিত ভাষ্যটি সমাধিক প্রসিদ্ধ।

'আল ফিকহুল আবসাত' নামক পুস্তিকায় ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাঁর একজন ছাত্র আবু মুতী 'আল-বালখীর (মৃ. ৯৮৩/ ৭৯৯) ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। হাজ্জী খলীফা 'কাশফুজ জুনুন'; কামালুদ্দীন আল-বায়দী 'ইশারাত আল-মারাম' এবং মুরতাদা আল-হুসাইনী 'শারহু ইহইয়া আল-উলূম' গ্রন্থসমূহে ইমাম আবু হানীফার (রহ) রচিত 'আকাইদ সম্পর্কিত উল্লেখিত পুস্তকগুলির সাথে 'আল ওয়াসিয়া' নামের আরেকটি পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। ইমাম সাহেব বিভিন্ন সময় তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে যে উপদেশ দেন, তাই 'আল-ওয়াসিয়া' নামে পরিচিত। এই ওয়াসিয়াতসমূহের মধ্যে সমাধিক প্রসিদ্ধ হলো, জীবন সায়াহে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য যে অমূল্য উপদেশ দান করেছেন, সেটি। বহু জীবনীগ্রন্থে এই ওয়াসিয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং এর কয়েকটি ভাষ্যও রয়েছে। ইমাম, কাজা ও কাদার (অদৃষ্টবাদ) ও আল-কুরআনের চিরন্তনতাসহ বারোটি বিতর্কিত প্রশ্নে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর অভিমত এতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।^{১২৫}

ইমাম আবু হানীফা (রহ) প্রথম ব্যক্তি যিনি 'আল ফিকহু আল-আকবার' রচনা করে তৎকালীন ধর্মীয় ফিরকা তথা দল-উপদল সমূহের মুকাবিলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর 'আকীদা-বিশ্বাস সপ্রমাণ করেন। এ গ্রন্থে তিনি যেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন তার

প্রথমটি হচ্ছে খুলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকা সংক্রান্ত। ধর্মীয় ফিরকাগুলো তাঁদের কারোর কারোর খিলাফাতের যথার্থতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাঁদের কে কার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান এবং কেউ মুসলিম ছিলেন কিনা- এ ধরনের অবাস্তব প্রশ্নও তারা উত্থাপন করে। এ সকল প্রশ্ন থেকে অনেক মৌলিক ও জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি হতো। যেমন: এ সকল খলীফাকে যেভাবে মুসলিমদের ইমাম বানানো হয়, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধান নিযুক্তির আইনগত পছন্দ স্বীকার করা হবে কিনা। এছাড়াও তাঁদের কারো খিলাফাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হলে তা থেকে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাঁর সময়ের ইজমা ভিত্তিক ফায়সালা ইসলামী আইনের অংশ বলে স্বীকৃত হবে কিনা এবং সেই খলীফার নিজস্ব ফায়সালা আইনসিদ্ধ নজীরের মর্যাদা পাবে কিনা? এছাড়াও তাঁর খিলাফাতের বৈধতা-অবৈধতা এবং তাঁর ঈমান থাকা না থাকা, এমন কি তাঁদের মধ্যে কারুর ওপর কারুর ফাযীলত (প্রাধান্য) এর প্রশ্নে আপনা-আপনিই এ প্রশ্নও এসে দাঁড়ায় যে, পরবর্তীকালের মুসলিমরা সেই প্রাথমিক ইসলামী সমাজের প্রতি আস্থা রাখবে কিনা। তাদের সমষ্টিগত ফায়সালা স্বীকার করবে কিনা, যেসব ফায়সালা নবীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরাসরি হিদায়াত ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে হয়েছিল এবং যার মাধ্যমে আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ ও ইসলামী বিধানের সমস্ত জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সাহাবীদের জামা‘আতের পজিশন সংক্রান্ত। যাদের বিপুল অংশকে একটি দল যালিম, পথভ্রষ্ট, এমন কি কাফির পর্যন্ত বলতো। কারণ, তাঁরা প্রথম তিনজন খলীফাকে ইমাম বানিয়ে ছিলেন। খারিজী ও মু‘তাজিলারা তাদের বিরূপ একটি সংখ্যাকে কাফির-ফাসিক আখ্যায়িত করতো। এ প্রশ্নটিও পরবর্তী কালে নিছক একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের পর্যায়ে ছিল না। বরং তা থেকে এ প্রশ্ন বেরিয়ে আসে যে, তাঁদের মাধ্যমে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে সব বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা ইসলামী আইনের উৎস হবে কিনা?

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমান ও কুফর-এর মৌলিক পার্থক্য এবং পাপের প্রভাব-পরিণতি সম্পর্কে। খারিজী, মু‘তাজিলা ও মুরজিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে কঠোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মুসলিম সমাজ গঠনের সাথে এ প্রশ্নের গভীর সম্পর্ক ছিল। কারণ, এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হবে, মুসলিমদের সামাজিক অধিকার এবং তাদের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবশ্যই তার প্রভাব পড়বে। উপরন্তু একটা ইসলামী রাষ্ট্রে এ থেকে এ প্রশ্নও সৃষ্টি হতো যে পাপাচারী শাসকদের শাসনে জুমু‘আ এবং জামা‘আতের মত ধর্মীয় কাজ, আদালত তথা বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ ও জিহাদের মত রাজনৈতিক কাজ যথার্থভাবে কেমন করে করা যাবে অথবা আদৌ করা যাবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (রহ) এসব সমস্যা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর যে মত-পথ তুলে ধরেছেন, তার কিছু অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

খুলাফায়ে রাশেদীন প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে সর্বোত্তম মানুষ আবু বাকর সিদ্দীক (রা), তারপর ‘উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা), তারপর ‘উছমান ইবন ‘আফ্ফান (রা), অতঃপর ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তাঁরা সকলেই হকের ওপর ছিলেন, আর সত্যের সাথেই তাঁরা জীবন যাপন করেন।^{১২৬}

“আল-‘আকীদাতু আত তাহাবিয়া’ গ্রন্থে এর আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে:^{১২৭}

و ثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق
رضي الله عنه، تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي
الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم
الخلفاء الراشدون، والآئمة المهديون.

আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-কে সমস্ত উম্মাতের ওপর সর্বাধিক মর্যাদাবান মনে করে সর্বপ্রথম তাঁর জন্য খিলাফাত নিশ্চিত করি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ‘উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা), ‘উছমান (রা), অতঃপর ‘আলী ইবন আবী তালিবের (রা) জন্য। এঁরা হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশেদীন- সত্যপ্রিয়ী খলীফা এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ইমাম।

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ব্যক্তিগতভাবে ‘উছমানের (রা) তুলনায় ‘আলীকে (রা) বেশি ভালোবাসতেন।^{১২৮} তাঁর ব্যক্তিগত মত এও ছিল যে, এ দু’মহান ব্যক্তির মধ্যে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না।^{১২৯}

কিন্তু ‘উছমানের (রা) নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা স্বীকার করে নিয়ে এই সামষ্টিক ‘আকীদা স্থির করেন যে, মর্যাদার ক্রমিক ধারাও তাই, যা খিলাফতের ক্রমিক ধারা।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্পর্কে তাঁর মত হলো

ভালো ব্যতীত অন্য কোন রকমে আমরা সাহাবীদের স্মরণ করি না।^{১৩০} ‘আল-‘আকীদাতু তাহাবিয়া’ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে:^{১৩১}

^{১২৬} মুহাম্মা ‘আলী কারী, শারহ ফিকহিল আকবার, পৃ. ৭৪-৮৭

^{১২৭} শারহুল ‘আকীদাহু আত-তাহাবিয়া, পৃ. ৫৩৩-৫৪৫

^{১২৮} আল-কারদারী, মানাকিব আল-ইমাম আল-আ‘জাম, খ. ২, পৃ. ৭২

^{১২৯} ইবনু আবদিল বার, আল-ইনতিকা, পৃ. ১৬৩; আস-সারাখসী, শারহুস সিয়াসিন কাবীর, খ. ১, পৃ. ১৫৭-১৫৮

^{১৩০} আল-ইনতিকা, পৃ. ১৬৩

^{১৩১} শারহুল ‘আকীদাহু আত তাহাবিয়া, পৃ. ৫২৮

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبفض من يفضهم، وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين و إيمان و إحسان، وبفضهم كفر و نفاق و طغيان.

আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল সাহাবীকেই ভালোবাসি। তাঁদের কারো ভালোবাসায় সীমা লংঘন করি না, তাঁদের কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদও করি না। যারা তাঁদের প্রতি বিশেষ পোষণ করে এবং ভালো ছাড়া তাদের কথা আলোচনা করে, আমরা তাঁদেরকে ঘৃণা করি। ভালো ছাড়া অন্য কোনভাবে আমরা তাঁদের আলোচনা করি না। তাঁদেরকে ভালোবাসা হলো দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাদেরকে ঘৃণা করা হলো কুফরী, মুনাফিকী ও অবাধ্যতা।

সাহাবায়ে কিরামের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ) তাঁর মত ব্যক্ত করতে কোন রকম দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, যাঁদের সাথে ‘আলীর (রা) যুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের ভুলনায় তিনি অধিক সত্যপ্রিয়ী ছিলেন।^{১০২} কিন্তু প্রতিপক্ষকে নিন্দা করা থেকে তিনি সর্বতোভাবে বিরত থাকেন। আবু হানীফা (রহ) একাই এ মত পোষণ করতেন না, বরং এটাই ছিল সকল আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মত।

ঈমানের সংজ্ঞা

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان

মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।^{১০৩}

আল-ওয়াসিয়াত গ্রন্থে তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন: আমল (কর্ম) ঈমান থেকে এবং ঈমান আমল থেকে পৃথক জিনিস। এর প্রমাণ এই যে, কোন কোন সময় মু‘মিন থেকে আমল অপসৃত হয়, কিন্তু ঈমান অপসৃত হয় না। যেমন বলা যেতে পারে যে, ধনহীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, তার ওপর ঈমান ওয়াজিব নয়।^{১০৪} এমনি করে তিনি খারিজীদের এ মত- ‘আমল ঈমানের মূল তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত এবং পাপ অবশ্যই ঈমানহীনতার সমর্থক- অসত্য ও অসার প্রতিপন্ন করেন। এ মতের বিরোধিতা করেন। তবে আহলি সুন্নাতের অন্যান্য ঈমামগণ আমলকে ঈমানের অন্যতম অংশ বললেও তাঁরা কিন্তু কেউ আমল ত্যাগ করলে তাকে কাফির বলেননি। যেমন- আল-‘আকীদাতু আত-তাহাবিয়াতে বলা হয়েছে:

^{১০২} আল-কারদারী, খ. ২, পৃ. ৭১-৭২, ৮০-৯২

^{১০৩} শারহ আল-‘আকীদাতু আত তাহাবিয়া, পৃ. ৩৭৩

^{১০৪} আল-জাওহারাভুল মুনীকা ফী শারহি ওয়াসিয়াতিল ইমাম আবী হানীফা (রহ), পৃ. ৩, ৬

والاختلاف الذى بين أبى حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف
صورى. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أوجزاً من الإيمان
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة فلا يخرج من الإيمان.

আবু হানীফা (রহ) ও আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ইমামদের মতপার্থক্যটা
বাহ্যিক। কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকে অন্তরের ঈমানের জন্য অপরিহার্য
অথবা অংশ বললেও তারা এ ব্যাপারে (ইমাম আবু হানীফার রহ. সঙ্গে)
একমত পোষণ করেছেন যে, কাবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী ঈমানের বেটনী
থেকে বেরিয়ে যাবে না।^{১৩৫}

পাপ ও কুফরির পার্থক্য

“কোন পাপের ভিত্তিতে- তা যত বড়ই হোক না কেন- আমরা কোন মুসলিমকে কাফির
সাব্যস্ত করিনা, যতক্ষণ সে পাপকাজকে বৈধ বলে মনে না করে। আমরা তার থেকে ঈমান
অপসারিত হয়েছে বলতে পারি না, বরং তাকে আমরা মু’মিন বলেই মনে করি। একজন
মু’মিন ব্যক্তি ফাসিক (পাপাচারী) হতে পারে, কিন্তু কাফির নয়- আমাদের মতে এমন হতে
পারে।”^{১৩৬} আল ওয়াসিয়াত গ্রন্থে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে: “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের সকল গুনাহ্গার মু’মিন, কাফির নয়।”^{১৩৭}

ইমাম আত-তাহাবী (রহ) কথাটি বলেছেন এভাবে:

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.

বান্দা ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে না, তবে যে জিনিস তাকে ঈমানে
প্রবেশ করিয়েছে তা যদি অস্বীকার করে।

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحلّه

আহলি কিবলার কাউকে কোন পাপের কারণে, যতক্ষণ সেই পাপ
কাজকে হালাল মনে না করে, আমরা কাফির বলে সাব্যস্ত করি না।

‘আহলি কিবলা’ বলতে তিনি মু’মিন মুসলিমদের বুঝিয়েছেন। একথা দ্বারা তিনি খারিজীদের
অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা বলে, যে কোন পাপকাজের কারণে একজন মু’মিন
কাফির হয়ে যায়।^{১৩৮}

একবার খারিজীদের সাথে এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার (রহ) বিতর্ক হয়। খারিজীদের

^{১৩৫} শারহুল ‘আকীদাহ্ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৭৪

^{১৩৬} মুদ্বা ‘আলী কারী, শারহ ফিকহিল আকবার, পৃ. ৮৬-৮৯

^{১৩৭} আল-জাওহারুল মুনীফা, পৃ. ৬

^{১৩৮} শারহুল ‘আকীদাহ্ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৫৫, ৩৭২

একটি দল ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলে যে, মাসজিদের সামনে দু'টি জানাযা হাজির। একটি জানাযা এমন এক মদপায়ীর, মদ পান করতে করতে যার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয়টি এক মহিলার, সে ব্যাভিচারের ফলে গর্ভবর্তী হয় এবং লজ্জায় আত্মহত্যা করে মারা যায়। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করেন, এরা কোন মিল্লাতের লোক ছিল? তারা ইহুদী ছিল, না খ্রীস্টান? তারা কি মাজুসী (অগ্নি উপাসক) ছিল? তারা বললো: না, তারা এসব কিছু ছিল না। তারা সেই মিল্লাতের লোক ছিল, যে মিল্লাত কালেমার সাক্ষ্য দেয়। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করেন: তা ঈমানের অর্ধেক না এক চতুর্থাংশ? তারা বললো: ঈমানের কোন ভগ্নাংশ হয় না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: সেই কালেমা শাহাদাতকে শেষ পর্যন্ত তোমরা কত অংশ বলে স্বীকার কর? তারা বললো: পুরো ঈমান। এরপর ইমাম সাহেব তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা নিজেরাই যখন তাদের মু'মিন বলছো, তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তাদের জবাব: আমরা জানতে চাই, তারা জান্নাতী না জাহান্নামী? ইমাম সাহেব বলেন, আমি তাদের সম্পর্কে তা-ই বলবো, আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আ) তাদের চেয়েও নিকট পাপী সম্পর্কে যা বলেছিলেন:^{১৯৯}

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“(হে আল্লাহ!) যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার, আর যে আমার নাফরমানী করে, তবে তুমি গাফুর রাহীম- ক্ষমাশীল, দয়ালু।”

আল্লাহ রাসুল 'আলামীনের আরেক নবী 'ঈসা (আ) এদের চেয়েও বড় পাপীদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন:^{১৮০}

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ

“আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।”

আল্লাহ রাসুল 'আলামীনের আরেকজন মহান নবী নূহ (আ) যা বলেছিলেন:^{১৮১}

إِنْ حَسِبْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوَ تَشْكُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

“তাদের হিসাব নেওয়া তো আমার রব-এর কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। আমি তো মু'মিনদের বিতাড়নকারী নই।” ইমাম সাহেবের এ জবাব শুনে সেই খারিজীরা নিজেদের চিন্তার ভ্রান্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

^{১৯৯} ১৪ : সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৬

^{১৮০} ৫ : সূরা আল মাদিদ্দা, আয়াত : ১১৮

^{১৮১} ২৬ : সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ১১৩-১১৪

গুনাহগার মু'মিনের পরিণতি

“মু'মিনের জন্য গুনাহ ক্ষতিকর নয়- এমন কথা আমরা বলি না। মু'মিন জাহান্নামে যাবে না, তা-ও আমরা বলি না; সে ফাসিক হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে- এমন কথাও আমরা বলি না।

“আর মুরজিয়াদের মত আমরা এমন কথাও বলি না যে, আমাদের সংকাজ সমূহ অবশ্যই গৃহীত হবে এবং আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো অবশ্যই ক্ষমা করা হবে।”^{১৪২}

আল-আকীদাতু আত-তাহাবিয়া-তে এর উপর এতটুকু সংযোজন করছে:

“আহলি কিবলার মধ্যে কারো জ্ঞানাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা দিই না, জাহান্নামী হওয়ারও না। আমরা তাদের উপর কুফর, শিরক এবং মুনাফিকীর হুকুমও আরোপ করি না- যতক্ষণ তাদের দ্বারা এমন কোন বিষয়ের কার্যত প্রকাশ না পাওয়া যায়। তাদের নিয়্যাতের ব্যাপার আমরা আব্বাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।”^{১৪৩}

আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের কিছু মন্তব্য

আমাদের পূর্ববর্তী অনেক বরেণ্য মনীষী আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে বহু মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য করেছেন যাতে তাঁর জীবন ও কর্ম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানে অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো:

قيل لمالك بن أنس، هل رأيت أبا حنيفة؟ قال، نعم، رأيت رجلا لو
كلمك في هذه السارية، أن يجعلها ذهابا، لقام بحجته.

আনাস ইবন মালিককে (রহ) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি আবু হানীফাকে (রহ) দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এই স্তম্ভটি সম্পর্কে তোমার সাথে কথা বলেন যে, এটি স্বর্ণের তৈরি, তাহলে তিনি তাঁর যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অবশ্যই তা প্রতিষ্ঠা করবেন।^{১৪৪}

ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) বলেন:^{১৪৫}

من أراد أن يعرف الفقه، فليزِم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم
عيال عليه في الفقه،

কেউ যদি ফিকহ জানতে চায়, সে যেন অবশ্যই আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গ অবলম্বন করে। কারণ, ফিকহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ তাঁর উপর নির্ভরশীল।

^{১৪২} মুদ্রা 'আলী কারী, শারহ ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯২

^{১৪৩} ইবনু আবিল 'ইয, শারহু তাহাবিয়াহ, পৃ. ২১২-২১৩

^{১৪৪} আয-যাহবী, সিয়াকু আ'লাম আন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১০৮

^{১৪৫} সিয়াকু আ'লাম আন-নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৪০০

আবু হানীফার (রহ) ছাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) বলতেন:^{১৪৬}

لولا أن الله عز وجل أغاثني بأبي حنيفة، وسفيان كنت كسائر الناس.

যদি না মহান আল্লাহ আবু হানীফা ও সুফইয়ানের (রহ) দ্বারা আমাকে সাহায্য করতেন তাহলে আমি অন্যসব মানুষের মতই হয়ে যেতাম।

ইয়াযীদ ইবন হারুনকে জিজ্ঞেস করা হলো:

أيا أفضه أبو حنيفة أو سفيان؟

আবু হানীফা ও সুফইয়ান- এ দু'জনের মধ্যে বড় ফাকীহ (ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী) কে?

তিনি বললেন,

سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة أفضه.

সুফইয়ান হাদীছের বড় হাফিজ এবং আবু হানীফা বড় ফাকীহ।

'আবদুল্লাহ ইবন দাউদ বলতেন:

إذا أردت الآثار أو قال الحديث فسفيان، وإذا أردت تلك الدقائق فأبو حنيفة.

যদি তুমি 'আছর', অথবা তিনি বলেন, 'হাদীছ' চাও, তাহলে সুফইয়ান, আর যদি ঐ সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় চাও, তাহলে আবু হানীফা।^{১৪৭}

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) আরো বলেন:^{১৪৮}

أن كان الأثر قد عرف، واحتيج إلى الرأي، فرأى مالك وسفيان وأبي حنيفة، و أبو حنيفة أفضلهم.

হাদীছ যদি প্রসিদ্ধ হয় এবং যুক্তি ও কিয়াসের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে মালিক, সুফইয়ান ও আবু হানীফার রায় বা যুক্তি যথেষ্ট। আর আবু হানীফা তাঁদের মধ্যে উত্তম।

সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা (রহ) বলতেন:^{১৪৯}

شيتان ماظنت أنهما يجاوزان قنطرة الكوفة، وقد بلغا الأفاق: قراءة حمزة ورأى أبي حنيفة.

দু'টি জিনিস, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, তা কূফার পুল অতিক্রম করবে। অথচ তা দূর-দিগন্তে পৌঁছে গেছে। সেই দু'টি জিনিস হলো: হামযার কিরাআত (কুরআন পাঠ) ও আবু হানীফার রায় বা যুক্তি।

^{১৪৬} তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১০৮

^{১৪৭} প্রাণ্ড

^{১৪৮} আ'জামু উজামা' আল-ইসলাম, পৃ. ১৫৩

^{১৪৯} প্রাণ্ড

নাদার ইবন শুয়ায়ল বলেন,^{১৫০}

كان الناس نياما عن الفقه، حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتحه وبينه وعلمه.
মানুষ ফিক্‌হ এর ব্যাপারে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। অবশেষে আবু হানীফা
তা আবিষ্কার, বর্ণনা এবং শিক্ষাদান করেন।

ইমাম আবু-যাহ্বীর (রহ) আরো একটি মন্তব্য নিম্নরূপ:

هو الإمام، فقيه الملة، عالم العراق، ... عنى بطلب الآثار، وارتحل في
ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس
عليه عيال في ذلك.

তিনি হলেন ইমাম, মিল্লাতের ফাকীহ ও ইরাকের 'আলিম। হাদীছ
অন্বেষণে কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং সেজন্য দেশ ভ্রমণ করেছেন। আর
ফিক্‌হ, যুক্তি ও মতের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা তা তিনিই হলেন তার সর্বশেষ
প্রত্যাবর্তন স্থান। এ ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর উপর নির্ভরশীল।^{১৫১}

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল কাস্তান (রহ) বলেন:

إنه والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن الله وعن رسوله.

আল্লাহর কসম! তিনি (আবু হানীফা) এই উম্মাহর মধ্যে আল্লাহর পক্ষ
থেকে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, সে সম্পর্কে
সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।

হাফিজ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ সালিহী (রহ) বলেন:

كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث و أعيانهم، ولولا كثرة اعتناؤه
بالحديث ما قُيأ له إستنباط مسائل الفقه.

আবু হানীফা হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিজ ও মনীষীদের একজন ছিলেন। তিনি
যদি হাদীছের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব ও মনোযোগ না দিতেন তাহলে
ফিক্‌হের এত মাসয়ালা উদ্ভাবন করা তার পক্ষে কখনো সম্ভব হতো
না।^{১৫২}

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (রহ) কে যখনই ইমাম আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে
জিজ্ঞেস করা হতো, তখনই তিনি বলতেন:

ثقة ما مؤمن ما سمعت أحدا ضعفه.

^{১৫০}. প্রাণ্ড, পৃ. ১৫৪

^{১৫১}. সিয়াকু আ'শাম আন-নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯০

^{১৫২}. আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, পৃ. ২৮৪

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, ভুল-ত্রুটিমুক্ত, (হাদীছের ব্যাপারে) কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন বলে আমি শুনি।

তিনি আরো বলতেন:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةً مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّدَقِ وَلَمْ يَتَّهَمُوا بِالْكَذِبِ وَكَانَ مَأْمُونًا عَلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ.

আবু হানীফা (রহ) ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দীনদার ও সত্যবাদী। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি। তিনি আল্লাহ তা‘আলার দীনের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন।^{১৫০}

বলখের ইমাম ইবন আইউব (রহ) বলতেন:

صَارَ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَارَ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ صَارَ إِلَى النَّابِعِينَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ.

ইলম বা জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পৌঁছেছে। তারপর তাঁর সাহাবীগণ তা লাভ করেছেন। তারপর তার অধিকারী হয়েছেন তাবিঈগণ, আর তাঁদের নিকট থেকে তা পৌঁছেছে আবু হানীফার (রহ) নিকট।^{১৫১}

‘আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রহ) বলেছেন:

كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةً لَا يَحْدُثُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا بِمَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَحْدُثُ بِمَا لَا يَحْفَظُ.

আবু হানীফা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্ত হাদীছই বর্ণনা করতেন। যা তার মুখস্ত নেই তা তিনি বর্ণনা করতেন না।

তিনি হাদীছ শাস্ত্রে অদক্ষ, হাদীছের ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন এবং হাদীছ উপেক্ষা করে কিয়াস ও বুন্ধি প্রয়োগের সাহায্যে মাসয়ালার রায় দিতেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়, মনীযীদের উল্লেখিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে তা সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে, আবু হানীফার (রহ) প্রিয় ছাত্র প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ‘আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) তাঁর প্রিয় শিক্ষকের প্রশংসায় রচিত একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা এ আলোচনার সমাপ্তি টানছি। তিনি বলেন:^{১৫২}

رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ كُلَّ يَوْمٍ + يَزِيدُ نَبَالَهٖ وَيَزِيدُ خَيْرًا
وَيَنْطِقُ بِالصَّوَابِ وَيُصْطَفِيهِ + إِذَا مَا قَالَ أَهْلَ الْجَوْرِ جَوْرًا

^{১৫০}. উমদাতুল কারী ফী শাহরহিল বুখারী, খ. ২, পৃ. ১২

^{১৫১}. ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ), পৃ. ৪১

^{১৫২}. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৫

يَقَاسُ مِنْ يَقَا يَسِهْ بَلْبُ + فَمَنْ ذَا تَجْعَلُونَ لَهُ نَظِيرًا
كَفَانَا فَقَدْ حَمَادُ وَكَانَتْ + مَصِيتَنَا بِهِ أَمْرًا كَبِيرًا
فَرْدُ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ عَنَا + وَأَبْدَى بَعْدَهُ عِلْمًا كَثِيرًا
رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ حِينَ يُؤْتَى + وَيَطْلُبُ عِلْمَهُ بِحِرَا غَزِيرًا
إِذَا مَا الْمَشْكَالَاتُ تَدَا فَعْتَهَا + رَجَالَ الْعِلْمِ كَانَ بِهَا بَصِيرًا

আমি প্রতিদিনই আবু হানীফাকে (রহ) দেখেছি, তাঁর মহাত্ম্য ও আভিজাত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মজল ও কল্যাণ। তিনি সত্য-সঠিক কথা বলেন এবং তাই পছন্দ করেন। যখন অত্যাচার, উৎপীড়নকারীরা অসত্য বলে। তিনি কাউকে পরিমাপ করলে বুদ্ধিমত্তার সাথে তা করেন। তোমরা কাকে তাঁর সমকক্ষ বানাবে? হাম্মাদকে হারানো আমাদের জন্য বড় মুসীবাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তিনি আমাদের সেই ক্ষতি পূরণ করেন। তিনি আমাদের পক্ষ থেকে শত্রুদের নিন্দামন্দের জবাব দেন এবং তারপরে বহু জ্ঞান প্রকাশ করেন। আমি আবু হানীফাকে (রহ) দেখেছি যে, যখন তাঁর কাছে এসে জ্ঞান অন্বেষণ করা হয়, তখন তাঁর জ্ঞান যেন পরিপূর্ণ সাগর তুল্য। জ্ঞানী ব্যক্তির যখন নানা রকম সমস্যা সংকটে তাড়িত হয়, তখন তাঁর কাছেই সমাধান পাওয়া যায়।

তিনি যে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাঁর অন্তরটাও ছিল সেই রকম উদার। অন্যের চিন্তা ও মতামতকে কখনও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না, আর নিজের মত ও সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশি মাতামাতি ও গর্ব করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: আবু হানীফা! আপনি যে ফাতওয়া দেন, তা যে সত্য ও সঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি জবাব দিলেন:

وَاللَّهِ لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

আল্লাহর কসম! আমি জানি না। হতে পারে, তা যে বাতিল ও অসার তাতে কোন সন্দেহ নেই।^{১৫৬}

মৃত্যু

ইমাম আবু হানীফার (রহ) জন্ম সনের ব্যাপারে জীবনীকারদের যেমন মত পার্থক্য আছে তেমনি কিছু মতপার্থক্য আছে মৃত্যুসন নিয়ে। রাওহ ইবন 'উবাদা থেকে তাঁর মৃত্যু সন ১৫০ হিজরী বর্ণিত হয়েছে। আবু নু'আইম, আল-হায়ছাম ইবন 'আদী, কা'নাব ইবন মুহাররার ও সা'ঈদ ইবন কাছীরও একই কথা বলেছেন। সা'ঈদ ইবন কাছীর রজব মাসের কথা বলেছেন, তেমনি আল-হায়ছাম ইবন 'আদী তাঁর মৃত্যুর স্থান বাগদাদ বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া

ইবন মাঈন হিজরী ১৫১ সনের কথা বলেছেন। আর মাঈনী ইবন ইবরাহীম আল-বালখী বলেন, আমি আবু হানীফার (রহ) সাথে কুফা, বাগদাদ ও মক্কার সাক্ষাৎ করেছি। তিনি হিজরী ১৫৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।^{১৫৭} ইমাম আয যাহবী (রহ) হিজরী ১৫০ সনের রজব মাসের কথা বলেছেন।^{১৫৮} আল- হাসান ইবন ইউসুফের সূত্রে আয-যাহবী (রহ) আরো উল্লেখ করেছেন যে, অত্যাধিক জনসমাগমের কারণে ছয়বার সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়। সর্বশেষ জামা'আতের ইমাম ছিলেন ইমাম সাহেবের পুত্র হাম্মাদ! আর আল-হাসান ইবন 'উমারা ও অন্য এক ব্যক্তি তাকে গোসল করান।^{১৫৯}

মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসীয়াত করে যান, তাকে যেন একখণ্ড পবিত্র ভূমিতে দাফন করা হয়। যে সকল ভূমি জোর-জবরদস্তী দখল করা হয়েছে বলে সন্দেহ হবে এমন ভূমিতে দাফন করতে নিষেধ করে যান। তাঁর অসীয়াতের কথা খলীফা মানসুরের কানে গেলে তিনি বলে ওঠেন: আবু হানীফার তিরস্কার ও দিষ্কার থেকে কে আমাদের রেহাই দেবে?^{১৬০}

দাফন

বাগদাদের 'আল আ'জামিয়া নামে প্রসিদ্ধ স্থানটিতে তাঁকে দাফন করা হয়।^{১৬১}

১৫৭. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৭
 ১৫৮. তাযকিরাতুল হক্কাজ, খ. ১, পৃ. ১৬৯
 ১৫৯. তাহযীব আল-কামাল, খ. ১৯, পৃ. ১১৭-১১৮
 ১৬০. সুওরাকুন মিন হারাত আভ-তারিঙ্গ, পৃ. ৫০৩
 ১৬১. আ'জামু 'উজামা' আল-ইসলাম, পৃ. ১৫৫

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২. আল-ইমাম আয-যাহাবী:
 - ক) সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা' (বৈরুত: আল-মুওয়াস সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ- ৭, ১৯৯০)
 - খ) তায়কিরাতুল হুফফাজ (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া আত তুরাছ আল-ইসলামী)
 - গ) তারীখ আর-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম (কায়রো: মাকতাবা আলকুদসী, ১৩৬৭ হি.)
৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আয-যাহাব (বৈরুত: আল মাকতাবা আত তিজারী)
৪. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল কুবরা (বৈরুত: দারু সাদির)
৫. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ আর-কাবীর (শাম: মাকতাবাতুশ শাম, ১৩২৯ হি.)
৬. ইয়াকুত আল-হামাবী, ম'জাম আল-বুলদান (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
৭. ইবন হাযাম, জামহারাযু আনসাব আল-'আরাব (মাক্কা: দারু আর-মা'আরিফ, ১৯৬২)
৮. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান (মিসর: মাকতাবা আন-নাহাদা আর মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)
৯. আল-বালাযুরী:
 - ক) আনসাব আল-আশাফ (মিসর: দারুল মা'আরিফ)
 - গ) ফুতুহ আল-বুলদান (মিসর: মাতবা'আ আল-মাওসু'আত, ১৯০১)
১০. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, সংস্করণ- ৪, ১৯৭৯)
১১. ইবন হিশাম, আস-সীরাহু আন নাবাবিয়্যাহু (বৈরুত)
১২. আল-জাহিজ, আলবায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরুত: দারুল ফিকর)
১৩. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আত-তুর্কুক আল-হুকাযিয়া ফী আস-সিয়াসা (কায়রো: দারুল হাদীছ, সংস্করণ- ১, ২০০৩)
১৪. আল-ইমাম আন-নাওয়াবী, তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)

১৫. ইবন 'আবদি ৱাক্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদ আন ফাৰীদ (কায়েৰো: মাতবা'আতু লুজনাতিত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ- ৩, ১৯৬৯)
১৬. আল-মাস'উদী, মুৰুজ আয-যাহাব (বৈৰুত: দাৰুল মা'আরিফ)
১৭. ইবনুল আছীৰ, আল-কামিল ফিত তারীখ (বৈৰুত: দাৰুল সাদিৰ, ১৯৮৬)
১৮. ইবন কাছীৰ, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈৰুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, দাৰুল কুতুব আল-'ইলমিয়া, ১৯৮৩)
১৯. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্বী, তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল, (বৈৰুত: দাৰুল ফিকর, ১৯৯৪)
২০. মুহাম্মাদ-আল-খাদারী বিক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়া (মিসর: আল-মাকতাবা আত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১৯৬৯)
২১. ড. আবদুর রহমান ৱা'ফাত আল-বাশা, সুওয়াকুন মিন হায়াত আত-তাৰিঈন, (কায়েৰো: দাৰুল আদাব আল-ইসলামী)
২২. আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাৰি'ঈন, (বৈৰুত: দাৰুল ইবন কাছীৰ, সংস্করণ- ৩, ২০০০)
২৩. মু'ঈন উদ্দীন নাদবী, তাৰি'ঈন, (ভারত: মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৫)
২৪. ড. উমার ফারুক, তারীখ আল-আদাব আল-'আৱাবী (বৈৰুত: দাৰুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)
২৫. আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর (আল মাকতাবা আশ-শামিলা)
২৬. ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখ 'আল আৱাব কাবলাল ইসলাম (বৈৰুত: দাৰুল 'ইলম লিল মালায়ীন)
২৭. ইবনুল কাযিম আল-জাওযিয়া, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন (কায়েৰো: দাৰুল হাদীছ, ২০০৪)
২৮. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (হামদ্রাবাদ: দাৱিয়াতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)
২৯. ইবন কাছীৰ, আস-সীৱাতু আন-নাৱাবিয়াহু (বৈৰুত: দাৰুল কুতুব আল 'ইলমিয়া)
৩০. ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম (বৈৰুত: দাৰুল আন্দালুস, সংস্করণ- ৭, ১৯৬৪)
৩১. শাহরাস্তানী, কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল, (১৩১৭ হি.)
৩২. ইবনু হাজার আল-আসকিলানী:
ক) তাহযীব আত-তাহযীব (হামদ্রাবাদ: দাৱিয়াতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)
খ) মীযান আল- ই'তিদাল (হামদ্রাবাদ, ১৩৩১ হি.)

৩৩. খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদা, ১৯৩১)
৩৪. জুরজী যায়দান, তারীখু আত-তামাদুন আল-ইসলামী (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭)
৩৫. আবু নু'আইম আল-ইসকাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, সংস্করণ- ২, ১৯৬৭)
৩৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খ. ১, ৩)
৩৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খ. ১, ২, ৫)
৩৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, (২য় খন্ড) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬)
৩৯. মুহাম্মাদ ইবন মাহমুদ আল-খাওয়ারয়মী, জামি'উ মাসানীদ আল-ইমাম আল আ'জাম, হায়দ্রাবাদ: মাজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩৩২)
৪০. আবদুল আওয়াল, মাওলানা জৈনপুরী, আন-নাওয়াজির আল-মুনীফা ফী মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা, (১২৩৯ হি.)
৪১. ইবন হাজার আল-হায়ছামী, আল-খায়রাত আল-হিসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু'মান।
৪২. ইবনু আবিদীন আল-হানাকী, রাদ্দুল মুখতার, ১২৫২।
৪৩. আল মুওয়াফফাক, আল মাক্কী, মানাকিব আল-ইমাম আল-আ'জাম আবী হানীফা, (হায়দ্রাবাদ, ১৩২১)
৪৪. মুহাম্মাদ আল-খুদারী, তারীখ আত-তাশরী'উ আল ইসলামী (বৈরুত: দারুল ফিকর)
৪৫. ইবনুল বাযযায আল-কারদারী, মালাকিব আল-ইমাম আল-আ'জাম (হায়দ্রাবাদ, ১৩২১ হি.)
৪৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, খিলাফত ও মূলকিয়াত (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯)
৪৭. আশ-শিরানী, কিতাবুল মীযান, (মিসর: আল-মাতবা'আতুল আযহারিয়া, ১৯২৫)
৪৮. আয-যাহবী, মানাকিব আল-ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবায়হি, (মিসর: ১৩৬৬ হি.)
৪৯. আহমাদ মা'মূর আল 'উসায়রী, আ'জামু 'উজামা' আল মুসলিমীন (দাম্মাম: মাকতাবাতু আল-ফাহ্দ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯)
৫০. আল-ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান, (হায়দ্রাবাদ: দারিয়াতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩৩৭ হি.)

৫১. আত-ভাবারী ভারীখুল উমাসওয়াল মূলক, (কায়রো: ১৯৩৯)
৫২. রাগিব আল-ইসফাহানী, মুহাদ্দারাতু আল-উবাদা' (মিসর: মাতবা'আতু আল-হিলাল-১৯০২)
৫৩. এ.এম.এম. সিরাজুল হক, ইমাম আযম আবু হানীফা (র) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৭)
৫৪. ইবন কাছীর, মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর (বৈরুত: দারুল কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১)
৫৫. ইবনু সায্যিদিন নাস, 'উযুন আল-আছার (ভাব'আতু দারিত তুরাছ ওয়া দার ইবন কাছীর)
৫৬. ইবনু আবিল 'ইয়য, শারহ 'আকীদাহ আত তাহারিয়াহ (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৩৭৩ হি.)
৫৭. মূহা হসাইন, আল জাওহারাভুল মুনীফা ফী শারহি ওয়াসিয়াতি আল-ইমাম আবী হানীফা, (হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩২১ হি.)
৫৮. ইবনু 'আবদিল বার, আল-ইনতিকা', (কায়রো: আল-মাতবা'আতুল কুদসিয়াহ, ১৩৭০ হি.)
৫৯. আস-সারাখসী, শারহ আস-সিয়ার আল-কাবীর (মিসর: ১৯৫৭)
৬০. আবদুল কাহির আল-জুরজানী, আল-ফারকু বায়নালা ফিরাক (মিসর: মাতবাআতু মিসর)
৬১. মূহা 'আলী কারী, শারহ ফিকহিল আকবার, (দিল্লী: ১৩৪৮ হি.)
৬২. শারহুল 'আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ (মাক্কা: আল-মাকতাব আল ইসলামী, ১৩৪৩ হি.)
৬৩. আবু বাকর আল-জাসাস, আহকাম আল-কুরআন (মিসর: মাতবা'আতু আল বাহিয়া, ১৩৪৭ হি.)
৬৪. আস-সারাখসী, কিতাব আল-মাবসূত (মিসর: আল-মাতবাআতু আস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.)
৬৫. 'উমার রিদা কাহহালা, আ'লাম আন-নিসা।
৬৬. ইবন হাজার আল 'আসকিলানী, আল ইসাবা ফী তাসরীখ আস সাহাবা।
৬৭. মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, আল-ইমাম আবু হানীফা হায়াতুহ ওয়া 'আসরুহ।
৬৮. ইবন খালদুন, আল মুকাদ্দিমা।



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা